তেল-গ্যাস : নব্য উপনিবেশবাদ

কাবুল হতে বাগদাদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

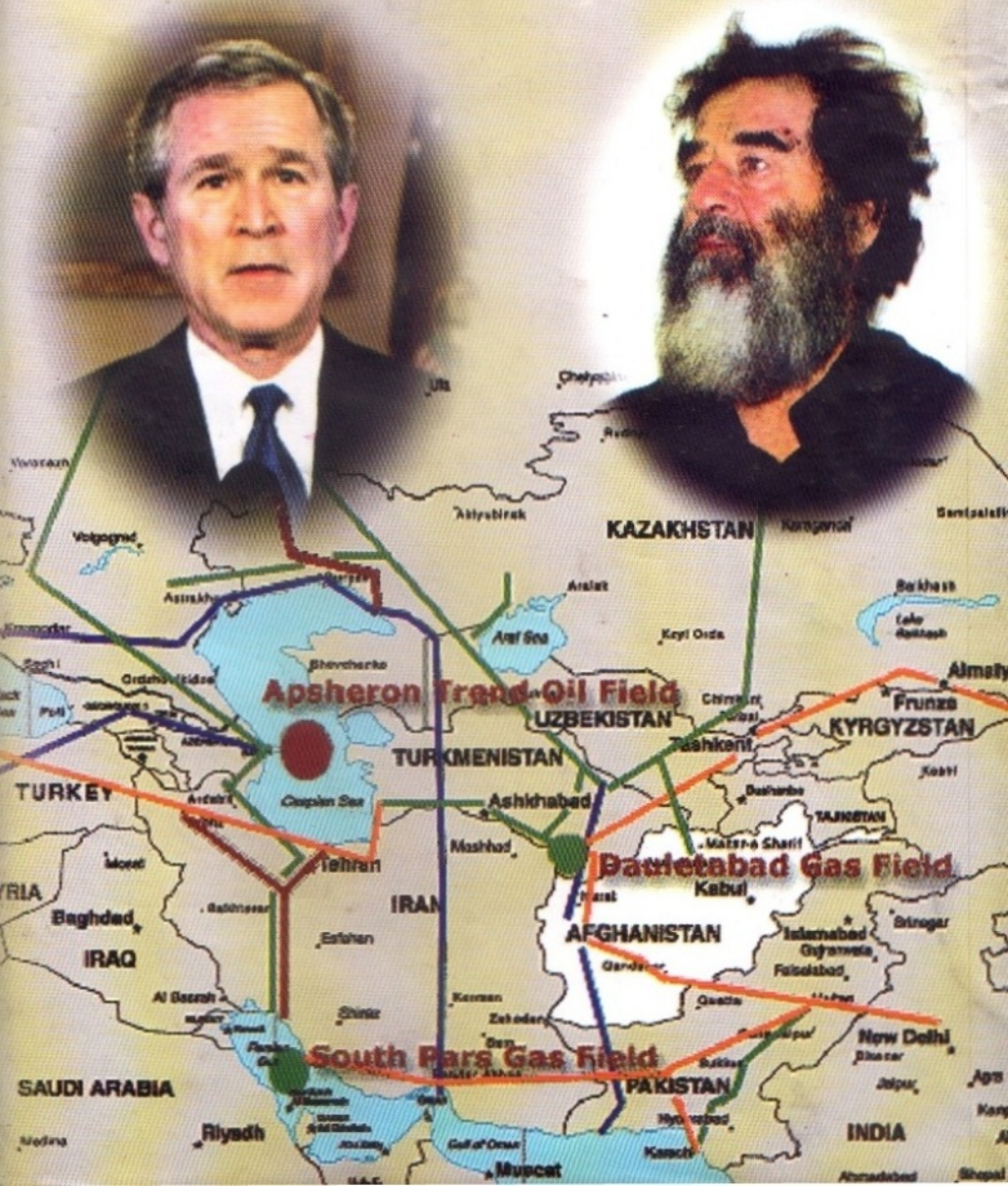

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে জোট বাহিনী রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের জন্য ইরাকে হামলা চালায়। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের শান্তিকামী মানুষও ছিল উদগ্রীব। এ বিষয়ে চ্যানেল আই ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার প্রচার করে। চ্যানেল আই-এর সাথে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন লেখক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র বিশ্ব দুটি বলয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে–একটি পুঁজিবাদী অপরটি সমাজতান্ত্রিক। পরবর্তীতে এদেরকে সমদূরত্বে রেখে গঠিত হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। পৃথিবীর দেশে দেশে সংঘাত এবং বিবাদ মিটানো ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘও এতদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গনের পর পুঁজিবাদী বিশ্বের ধারক বাহক মহাপরাক্রমশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে একক কর্তৃত্ব চলে যায়। যুক্তরাষ্ট্র এখন সারা বিশ্বকে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার দম্ভ ও সামরিক দাপটের কাছে জাতিসংঘও নাস্তনাবুদ। এই বিশ্ব সংস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সে নানা ছলছুতায় আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে নেয়। এতে শক্তি যোগায় যুক্তরাজ্যসহ গুটিকয়েক তাল্পিবাহক দেশ। সারা দুনিয়ায় দেশে দেশে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের শান্তিকামী মানুষ নিরীহ জনতার উপর হামলার প্রতিবাদ জানালেও বুশ-ব্লেয়ার এতে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। এদেশ দুটি দখলের পিছনে যত কারণই থাকুক না কেন মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার বিশাল তেল ভান্ডার দখলে রাখা যে অন্যতম প্রধান কারণ সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

বর্তমানে আফ্রো-এশিয়ার মুসলিম তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একক পরাশক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে জোট বাহিনীর কবে নাগাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দখলদারিত্বের অবসান হতে পারে, এ থেকে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে, জ্বালানি বাণিজ্যের সাথে কোন দেশের কোন কোন কোম্পানি জড়িত, তেলের দেশের রাজনীতি এ সব বিষয়ে কতটা প্রভাব বিস্তার করে আসছে; ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিভাবে কতটা বিশ্ব জ্বালানি রাজনীতিতে জাড়িয়ে পড়ছে, বর্তমান বিশ্ব কি আবার সংঘাতের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে এ পুস্তকে।

তেল গ্যাস ঃ নব্য উপনিবেশবাদ
কাবুল হতে বাগদাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার

তেল-গ্যাস ঃ নব্য উপনিবেশবাদ
কাবুল হতে বাগদাদ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

পালক পাবলিশার্স
www.pathagar.com

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ
বি এ অনার্স, এম এ
স্বত্বাধিকারী–পালক পাবলিশার্স
৮/২, নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
জি পি ও বক্স নং ৪১৫, ঢাকা–১০০০

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৪১০
ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

প্রচ্ছদ
পঙ্কজ পাঠক

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ
সিটি আর্ট প্রেস
১৭৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ একশত নব্বই টাকা

TAL-GAS :NABBYO UPONIBESHBAD - KABUL HOTE BAGDAD (a informative book of on going power game centering oil and gas in middle east and central asia) By Brig. General M. Shakhawat Hossain (Rtd.). Published by Forkan Ahmad, Proprietor-Palok Publishers. 8/2, North South Road, Purana Palton, GPO Box No. 415, Dhaka - 1000, Bangladesh. First Edition- February 2004, Cover Design by Pankaj Pathak. Price Taka 190.00, US$ 10.00

ISBN 984 445 150 07

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মা, বাবা এবং পরিবারের

সকলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার কথা

আমার লেখক জীবনের এটি চতুর্থ বই। আমার লিখিত আগের প্রকাশনা 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথাঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা' লেখার পরপরই উপলব্ধি করেছিলাম যে, বিশ্ব কূটনীতি বর্তমানে চলছে এক পরাশক্তিকে ঘিরে আর শিল্পায়িত বিশ্ব তার কূটনীতি সামরিক প্রভাব বিস্তার থেকে সরিয়ে অর্থনৈতিক প্রভাবের আঙ্গিকে নিয়ে এসেছে। বর্তমান বিশ্বের উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে শিল্পের বিকাশ আর আধুনিকায়ন। এর জন্য প্রয়োজন জ্বালানির। জ্বালানির সহজলভ্য উপাদান তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস।

প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রয়োজন শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা আর বিদ্যুতের সম্প্রসারণকল্পে। জ্বালানি তেলের বিকল্পের খোঁজ শুরু হলেও আধুনিক যোগাযোগ এবং সামরিক ব্যবহারের জন্য জ্বালানি তেলের সাথে সাথে অন্তত ভূ-চারিত যোগাযোগে তরল গ্যাসের ব্যবহারও বাড়ছে।

বিগত শতাব্দী, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই উপরোক্ত দুটি প্রাকৃতিক সম্পদের সামরিক ও বেসামরিক ব্যবহারকারীদের মধ্যে উৎপাদনকারী দেশগুলোকে ঘিরে রচিত হয়েছে কূটনীতি। আজকের বিশ্বে তা প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে। প্রাকৃতিক জ্বালানি সম্পদের সিংহভাগের অধিকারী অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য। তাই এ অঞ্চলের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং রক্ষায় ব্যস্ত উন্নত বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র। এর কারণেই জন্ম দিচ্ছে নানা মাত্রার অস্থিরতা। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত এ অঞ্চল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বলে আমাদের সাথে কিছুটা হলেও সম্পৃক্ত।

১৯৯১ সনের পর থেকে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রাক্তন সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার দেশগুলোও এসব প্রাকৃতিক সম্পদে সম্ভারিত। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যের মত এসব দেশও বিশ্ব কূটনীতির দাবার ছকে সংযোজিত হয়েছে।

মূলত আমার এ প্রয়াস উপরের বক্তব্যের আলোকেই নেয়া একটি উদ্যোগ।

www.pathagar.com

এতে আমরা বাংলাদেশীরাও খানিকটা হলেও জড়িত। আমাদের দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক জ্বালানি সম্পদ গ্যাস নিয়েও বর্তমানে সীমিত আকারে হলেও চলছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। এসব তথ্য এবং বিশ্লেষণই এ গ্রন্থে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র। বিশেষ কারণেই আমি আমার এ আলোচনা শুরু করেছি মধ্যএশিয়া থেকেই আর সে কারণেই বর্তমান প্রেক্ষিতে আফগান প্রসঙ্গও চলে এসেছে এক ভিন্ন অঙ্গিকে। এর সাথে যোগ করেছি ইরাক, ইরান ও দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গ।

যেসব তথ্য আমি উপস্থাপনা করেছি সেসব সম্পূর্ণই গবেষণা ভিত্তিক-সংক্ষিপ্ত আকারে। জটিল তথ্য দেয়া থেকে বিরত থেকে সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য করবার যথেষ্ট প্রয়াস করেছি। আশা করি উৎসুক পাঠকগণ আমার পূর্বের মত এ প্রয়াসকেও সমর্থন দেবেন। আমার এ যৎসামান্য উপহার পাঠকদের ভাল লাগবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বইটি সুন্দরভাবে প্রকাশ, উপস্থাপনা এবং পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য এর প্রকাশক পালক পাবলিশার্স এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অধিক আগ্রহ নিয়ে এ বইটি দ্রুত প্রকাশনার জন্য পালক পাবলিশার্স এর কর্ণধার জনাব ফোরকান আহমদকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারই উৎসাহে এ বইটি লেখা। আমি আমার সকল সন্মানিত পাঠকদের, আমার পরিবার এবং সকল শুভাকাঙ্খীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০০৪
ফোন - ৯৮৮২১৯৯

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সমৃদ্ধতার খোঁজে	১১
মধ্যএশিয়ার জ্বালানির রাজনীতি ঃ তুর্কমেনিস্তান	২০
মধ্যএশিয়ার আঞ্চলিক প্রভাব	৩১
মধ্যএশিয়ার গ্রেটগেমে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনোকলের প্রবেশ	৩৬
বিরদাস আর ইউনোকলের টানাপড়েনে মধ্যএশিয়া	৪৫
তালেবানদের উত্থান–পাইপলাইন ঃ রাশিয়া–যুক্তরাষ্ট্রের আফগান নীতি	৫৯
কাস্পিয়ান সাগর ঃ মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প জ্বালানি ভাণ্ডার	৭৪
ককেসাস আর কাস্পিয়ান অঞ্চলের সংঘাত ঃ 'চেচনিয়া'	৮০
কাস্পিয়ান অঞ্চলের একটি সমীক্ষা	৯১
দক্ষিণ এশিয় জটিলতায় জ্বালানি	৯৮
নব্য উপনিবেশবাদ-ইরাক সংকট	১৩২
ইরাক–ইরান যুদ্ধ এবং বর্তমান পরিস্থিতি	১৪২
উপসংহার	১৫২
দৈনিক সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-ইরাক	১৫৬
শেষের কথা	২১৫
পরিশিষ্ট	২১৭
Bibliography	২২২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

সমৃদ্ধতার খোঁজে

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ এর সকাল প্রায় এগারোটা। আফগানিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলের পশতুন অধ্যুষিত তালেবানদের আধ্যাত্মিক সদর বলে পরিচিত, বিগত দু'দশকের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত শহর কান্দাহার। সেপ্টেম্বরের দিকে এমনিতেই আবহাওয়া শুষ্ক, তার উপরে প্রায় খরার মত অবস্থার কারণে চারদিকে ধুলোর পরিমন্ডলে পরিবেষ্টিত। মরুভূমিতে অনেকটা লু-হাওয়ার (গরম এবং ধুলোট) মত হাওয়া চলছিল। কান্দাহার শহরের প্রায় মাঝামাঝিতে প্রদেশের গভর্নরের সুরম্য প্রাসাদ, যদিও আগের সে রমরমা অবস্থা নেই, তবুও বেশ দূর থেকে এ ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদ চোখে পড়ে। বর্তমানে এ প্রাসাদের বাসিন্দা তালেবানদের তাত্ত্বিক গুরু মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের অন্যতম ঘনিষ্ট মোল্লা মোহাম্মদ হাসান। মোল্লা হাসান কান্দাহারের গভর্নর। উরুজগান অঞ্চলের আচাকজাই গোত্রের পশতুন। সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের একজন বীর মুজাহিদ এবং ঐ যুদ্ধেই হাসান একটি পা হারান সাথে বাম হাতের তর্জনীটিও। মোল্লা হাসানও তালেবানদের অনেক নেতার মত বিকলাঙ্গ। কোয়েটা, পাকিস্তান থেকে মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত অবস্থাতেই জেহাদে যোগদান করেছিলেন, এখন তার বয়স চল্লিশের কোঠায়।

কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা হাসান অনেকের সাথে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের সময় মৌলবী নবী মোহাম্মদীর হারকাত-ই-ইনকিলাব ইসলামির সদস্য ছিলেন। ঐ সময়ে কান্দাহার অঞ্চলে দুটি সংগঠনই পশতুন উপজাতীয় বন্ধনের কারণে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল তার মধ্যে আর একটি ছিল প্রফেসর ইউনিস খালিসের হিজব-ই-ইসলামি যদিও পেশাওয়ার সেভেন বলে খ্যাত সাতটি দলই কমবেশি তৎপর ছিল।

www.pathagar.com

মোল্লা হাসান, গভর্নর কান্দাহার, তার কাঠের নকল পা দিয়ে বেশ সচ্ছন্দেই চলাফেরা করতে অভ্যস্ত এবং ঐ কাঠের পাটিই তার কাছে বেশ প্রিয়। চেহারায়, চলনে এবং কথাবার্তায় অত্যন্ত অমায়িক। এ তালেবান নেতা কথা বলবার সময় সামনের টেবিল ধাক্কাতে থাকেন আর উত্তেজিত হয়ে উঠলে কাঠের পায়ের উপর হাতের নিকট রক্ষিত কলমের আগা দিয়ে দাগ দিতে থাকেন। তার কাঠের পায়ের উপর অসংখ্য দাগ গুণতে পারলে হয়ত তার উত্তেজনার মুহূর্তগুলোর পরিসংখ্যান পাওয়া যেত। মোল্লা হাসান, বেশ শক্তিশালী তালেবান শীর্ষস্থানীয় নেতা। তিনি শুধুমাত্র পশতুন আর দারী ছাড়া আর কোনো ভাষা তেমন একটা বোঝেন না যদিও কোয়েটা থাকাকালে সামান্য উর্দু শিখেছিলেন। সচরাচর কোনো বিদেশীদের সাথে দেখাও হয়না তদুপরি ঐ সময়ে বিদেশী বলতে কিছু সংখ্যক অতি উৎসাহী গণমাধ্যমের প্রতিনিধি আর দাতাসংস্থার কতিপয় লোক। তাছাড়াও মোল্লা ওমরের প্রধান সদর হওয়াতে মোল্লা হাসানের দর্শন প্রার্থীও কম তবুও আধাভাঙ্গা ইংরেজি বলবার এবং বুঝে তরজমা করবার মত একজন তরুণকে কোনো বিদেশীর বিরল সাক্ষাতকারের সময়ে সাহায্যের জন্য রাখা হয়েছিল। ঐদিন সকালে মোল্লা হাসানের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন ছিল। হাসানের দোভাষী তরুণ তালেবান আকন্দ আচাকজাই খবর দিলেন কোনো একজন সুদর্শন বিদেশী গভর্নরের সাক্ষাত প্রার্থী এবং এ সাক্ষাত হতে হবে অত্যন্ত একান্তে। অনেকদিন পর মোল্লা হাসান নিজেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে পেলেন বিশেষ করে ওমরের সন্নিকটে থেকে। আকন্দ, মোল্লা হাসানকে আগন্তুক বিদেশীর এ সাক্ষাতকারের বিষয়বস্তু জানালে হাসান আরও একবার উত্তেজিত হয়ে সামনে রক্ষিত টেবিলটিকে আরেকবার ধাক্কা দিয়ে তার দর্শন প্রার্থীকে সাদরে মন্ত্রণাকক্ষে বসাতে আদেশ দিলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় মধ্য চল্লিশের বয়সী, প্রায় ছয়ফুট লম্বা একহারা গড়নের, ধূসর রঙের স্যুট পরিহিত, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ হাতে এক সুদর্শন বিদেশী মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করলেন। এই ব্যক্তিটি হলেন, আর্জেটিনার বিখ্যাত তেল ও গ্যাস উত্তোলন, সঞ্চালন এবং রপ্তানিকারক কোম্পানি বিরদাস (BIRDAS) কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, মি. কার্লোস বুলঘোরেনী। বুলঘোরেনীর এটা কান্দাহার, আফগানিস্তান অথবা এতদঅঞ্চলে প্রথম সফর নয়; বরং তিনি এ অঞ্চলের সাথে ১৯৯৪ থেকেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তখন আফগানিস্তানে ঘোরতর গৃহযুদ্ধ চলছিল আর এখনকার মত তখনও কাবুলে বোরহানউদ্দীন

www.pathagar.com

রব্বানীর সরকার কায়েম ছিল। পৃথিবীর এ অঞ্চলে অত্যন্ত অপরিচিত আর্জেনটিনার এ অখ্যাত কোম্পানি বিরদাস বিগত তিন বছরেরও উপরে এতদঅঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাস দক্ষিণমুখে রপ্তানির সম্ভাব্যতার কাজে লেগেছিল। ইতিপূর্বে ১৯৯৫ সনের দিকে বিরদাস প্রথমবারের মত প্রাক্তন সোভিয়েত ও মধ্যএশিয়ার মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে দক্ষিণে আরব সাগরের তট পর্যন্ত নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই কার্লোস বুলঘোরেনী একদিকে যেমন তালেবানদের সাথে কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তেমনি কাবুলে রব্বানী সরকারের এবং অন্যান্য গোত্রের ক্ষেত্রীয় যুদ্ধবাজ নেতাদের সাথে সমঝোতা করে ফেলেছিলেন।

এর পূর্বে ১৯৯২ সনে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বিরদাস তুর্কমেনিস্তানের ইসলার ক্ষেত্রে ৫০ঃ৫০ অংশীদারিত্বে উৎপাদন ভাগাভাগির উপর ভিত্তি করে সে দেশের সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। ঠিক তার পরের বছর মানে ১৯৯৩ সনে পশ্চিম তুর্কমেনিস্তানের কেইমির গ্যাস ক্ষেত্রে বিরদাস ৭৫ আর সরকারের ২৫ ভাগের অংশীদারিত্বে গ্যাস উত্তোলনের আরও একটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করে। কাজেই বুলঘোরেনী এ অঞ্চলে একজন অত্যন্ত পরিচিত চেহারা হলেও তার জন্য তালেবানরা এক আলাদা জগতের বাসিন্দা। আফগানিস্তানের যুদ্ধবাজ নেতাদের চেয়ে তালেবানদের সহজ সরল কথাবার্তা এবং ব্যবহারে কার্লোস বুলঘোরেনী বেশ উৎসাহিত বোধ করেন। অন্যদিকে আর্জেনটিনা তালেবানদের নিকট অত্যন্ত অপরিচিত দেশ এবং এমন একটি দেশ যার সাথে আফগান ইতিহাস মোটেও পরিচিত নয়। বস্তুতপক্ষে আর্জেনটিনা নামক দেশের অস্তিত্বও তালেবানদের নিকট এক নতুন বিস্ময়। কান্দাহারে কয়েক ঘন্টার কাজ সেরেই বুলঘোরেনী কোম্পানির ছোট উড়োজাহাজটি নিয়ে যখন কান্দাহার বিমান বন্দর ছেড়ে কাবুলের সন্নিকটে বাগরামের দিকে রওয়ানা হলো তখন জালালাবাদের অদূরে হিকমত ইয়ারের বাহিনীর সাথে তালেবানদের খন্ড যুদ্ধ চলছিল।

বিরদাস এ এলাকায় প্রথম গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের সূচনা করে। এ প্রকল্পে ছিল তুর্কমেনিস্তান হতে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানের দক্ষিণ তটে গ্যাস পাইপলাইন বসানো। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ৭৫০ মাইল পাইপলাইন তৈরির প্রকল্পে খরচ ধরা হয়েছিল ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছিল তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান পাইপলাইন (TAP)। এটাই ছিল

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রথম 'স্বপ্নের পাইপলাইন' (Dream Pipeline)। বিরদাস এ অঞ্চলে যে নতুন দিকের উন্মোচন করেছিল তা এর পরে বহুদূর গড়িয়ে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কার্লোস বুলঘোরেনী কেতাদুরস্ত ব্যবসায়ী যার জীবন ধারায় ছিল পূর্বতন স্পেনিস বনেদি রং, বুয়েন্স আয়ার্সের ডিস্কোতে যার ছিল অভিরুচী, সেদিন কান্দাহারের ধুলা মেশানো পথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে একবারও বুঝতে পারেন নি যে, আন্তর্জাতিক দাবার ছকে তিনি সামান্য এক পেয়াদায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছেন। সেদিন এ মধ্যবয়সী সুদর্শন মানুষটি বুঝতে পারেন নি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ বৃহত্তম কোম্পানি UNOCAL (Union Oil of California) যারা তার কনসোরসিয়ামের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল সে কোম্পানিই কয়েক বছরের মধ্যে বিরদাসকে এ অঞ্চল থেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য করবে।

কার্লোস বুলঘোরেনী যখন কাবুলে পৌঁছেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পরের দিন তার কাবুলে রব্বানী সরকারের সাথে একান্ত বৈঠকের কথা। বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূও হয়েছিল। পাকা ব্যবসায়ীর মত বিরদাসের চেয়ারম্যান কাবুলে কান্দাহারে তার আলোচনাকে সযত্নে এড়িয়ে রব্বানী সরকারের সাথে তার প্রকল্পে আফগান ভূমি ব্যবহারের ব্যাপারে অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছিলেন। কার্লোস এরই মধ্যে বিরদাসের সপক্ষে মাজার-ই-শরিফের যুদ্ধবাজ নেতা আব্দুর রশিদ দোস্তামকে নীতিগতভাবে পাইপলাইনের ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হন। বিরদাস আফগান নেতাদের এ পাইপলাইনের খরচ এবং বাৎসরিক প্রাপ্য রয়ালিটি থেকে এসব যুদ্ধবাজ নেতাদের (Warlord) ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনার ইঙ্গিতের প্রেক্ষিতেই প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেন।

বিরদাস যখন প্রথম এ অঞ্চলে তৎপর হয় তার কয়েকমাস পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীন হয়ে যায়। এদের মধ্যে মধ্যএশীয় মুসলিম প্রধান এবং কাস্পিয়ান সাগরভুক্ত জ্বালানি সম্পদে সমৃদ্ধ প্রচুর সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে পাঁচটি দেশই সম্মুখ সারিতে চলে আসে। এগুলো হলো, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজিকিস্তান আর আজারবাইজান। উল্লেখ্য, আজারবাইজান ছাড়া আর বাকি তিনটি দেশের সাথে আফগানিস্তানের অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে। অন্যদিকে তুর্কমেনিস্তান আর আজারবাইজানের সাথে ইরানের অভিন্ন স্থল সীমান্ত রয়েছে। তুর্কমেনিস্তান এবং আজারবাইজান উভয়ের জন্য ইরানের ভূ-খন্ড দক্ষিণ দিকের সমুদ্র তটে পৌঁছাবার জন্য সংক্ষিপ্ত পথ।

www.pathagar.com

মধ্যএশিয়ার এসব দেশ ১৯৯১ সনের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর থেকেই নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে তৎপর হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেও সত্তর বছরেরও বেশি সময় মস্কোর মুখাপেক্ষি হয়ে থাকার কারণেই এসব দেশের সাথে দক্ষিণের দেশগুলোর যোগাযোগ এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠে নি। এমনকি এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, গ্যাস এবং কাস্পিয়ান সাগর তটের উত্তোলিত তেলের পাইপলাইনগুলো উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমমুখি ছিল। রেল এবং মহাসড়ক ব্যবস্থাগুলো ছিল মস্কোমুখি। এমনকি আন্তরাজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল না থাকার মতই। যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মধ্যএশিয় দেশগুলোর সাথে দক্ষিণের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো প্রসারই ঘটে নি। একদা এ মধ্যএশিয় অঞ্চল থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল ইতিহাস বিখ্যাত 'সিল্ক রুট' যার গন্তব্য স্থান ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষ হয়ে ভারত মহাসাগরে। মধ্যএশিয়া থেকে যুগে যুগে জঙ্গীনেতারা ভারত আক্রমণ করে এবং এক পর্যায়ে মুসলমান শাসন প্রবর্তন করেন। এদের মধ্যে কেবল মোগলরাই দু'শ' বছরের উপরে ভারত শাসন করে।

ঐতিহাসিক নিরীক্ষণেই মধ্যএশিয়ার সাথে আজকের দক্ষিণ এশিয়ার সম্পর্ক শুধু বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না এর মধ্যে ছিল রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। আর এসব কারণেই ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের পর থেকে শাসকরা তৎকালীন রাজকীয় রাশিয়ার দক্ষিণমুখি আগ্রাসনের শঙ্কায় জর্জরিত ছিল। জ্বার (CZAR) শাসিত রাশিয়ার দক্ষিণমুখি বিশেষ করে ভারতের দিকে সম্প্রসারণের শঙ্কায় আফগানিস্তানকে নিদেনপক্ষে নিরপেক্ষ ক্ষেত্র (Buffer) হিসেবে রাখতে সর্বতভাবে প্রয়াস নিয়েছিল। আফগানিস্তানে বৃটিশ আধিপত্য কায়েম করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হবার পর বাদশাহ আমানউল্লার সাথে সন্ধির মাধ্যমে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং পশ্চিমে বেলুচিস্তানের সীমান্ত চিহ্নিত করে।

১৯৯১ সনের পর থেকেই মধ্যএশিয়ার এসব দেশের অনেকগুলো দুর্বল হওয়াতে রাশিয়ার নিকট আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য সৈন্য মোতায়েনেও রাজি হয় আর এদের মধ্যে প্রধান হলো উজবেকিস্তান।

নব্বই এর দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমা বিশ্বের নজর পড়ে মধ্যএশিয়ার কাস্পিয়ান অঞ্চলের বৃহৎ আকারের মজুদ এবং বিপুল পরিমাণে রপ্তানিযোগ্য প্রাকৃতিক জ্বালানি তেল এবং গ্যাস। মধ্যএশিয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ঐ

www.pathagar.com

দশকে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির অবনতি হবার পর থেকে। পশ্চিমা বিশ্ব তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্রুত শিল্পায়িত দেশগুলো দশবছর ব্যাপী ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরানে কট্টরবাদী ইসলামিক প্রশাসন, আরব-ইসরায়েল বিবাদ এবং সবশেষে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল ইত্যাদি জনিত পরিস্থিতিতে প্রমাদ গুণতে থাকে। তাছাড়াও দ্রুত নিঃশেষিত মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের বিকল্প হিসেবে কাস্পিয়ান অঞ্চল চিহ্নিত হবার পর থেকে ঐ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করতে অনেকদূর এগিয়ে যায়। উন্নত প্রযুক্তি এবং তেল ও গ্যাস উত্তোলন, পরিবহন এবং বিতরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রায় বেশির ভাগ বড় কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক হওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি এক প্রকার স্বাভাবিক হয়ে উঠে। এর উপরে রয়েছে এসব ক্ষেত্রে প্রচুর আন্তর্জাতিক লগ্নি। আর এসব লগ্নির জন্য এ সমস্ত দেশগুলোকে পরিবর্তিত বিশ্বের সামরিক, প্রাযুক্তিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয়। এসব কারণেই নব্বইয়ের দশক থেকেই শুরু হয় বৃহৎ কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা আর শুরু হয় নতুন করে বৃহৎ আঙ্গিকে বৃহৎ খেলা (Great Game)। এর একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্ব আর অন্যদিকে ক্ষেত্রীয় শক্তিগুলো।

১৯৯০ সনের দিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিভিন্ন নিরীক্ষণ সংস্থাগুলো কাস্পিয়ান সংলগ্ন অঞ্চলগুলোর মজুদ জ্বালানি সম্পদের আকার নির্ধারণ করে। প্রাথমিক তথ্যে বলা হয় যে, কাস্পিয়ান অঞ্চলে শুধুমাত্র তেলের মজুদ রয়েছে আনুমানিক ১০০ হতে ১৫০ বিলিয়ন ব্যারেল (বিবি)। তবে বর্তমানে এর প্রকৃত আকার ধরা হয়েছে ৫০ বিবি। এ মজুদের পরিমাণ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ১৫ শতাংশ মাত্র। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এ অঞ্চলটিই হয়ত বা পৃথিবীর জ্বালানি সম্পদ প্রাপ্তির শেষ স্থানগুলোর অন্যতম। এসব কারণেই ১৯৯৪–৯৮ এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ১৩টি বৃহৎ কোম্পানি এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। তবে এর মধ্যে কাজাকিস্তানেই রয়েছে ১০–২০ বিবি নিশ্চিত মজুদ তবে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা এর পরিমাণ বেড়ে ৮৫ বিবিও হতে পারে। তেমনিভাবে আজারবাইজানে ৫-১১ এবং তুর্কমেনিস্তানে প্রায় ২ বিবি তেলের নিশ্চিত মজুদ রয়েছে যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২৭ এবং ৩২ বিবিতে দাঁড়াতে পারে। উজবেকিস্তানে অধুনা প্রাপ্তি ১ বিবি।

এ সমগ্র অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ রয়েছে ২৩৬-৩৩৭ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট (tcf)। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই রয়েছে ৩০০ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট।

www.pathagar.com

বিশ্বের এগারতম বৃহৎ গ্যাস মজুদকারী হিসেবে পরিচিত ১২ গ্যাস। উজবেকিস্তানে ১১০ টিসিএফ, কাজাকিস্তানে ৮৮ টিসিএফ এবং আজারবাইজানে ৩৫ টিসিএফ।[১]

১৯৯৬ সনের এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় যে, কাস্পিয়ান এলাকাতে প্রতিদিন ১ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদিত হতো যার মধ্যে মাত্র ৩০০,০০০ ব্যারেল রপ্তানি করা হতো শুধুমাত্র কাজাকিস্তান থেকে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি শুধুমাত্র রাশিয়াতেই রপ্তানি করা হতো আর প্রায় ১৪০,০০০ ব্যারেল প্রতিদিন রাশিয়ার বাইরে রপ্তানি হতো। ১৯৯৬ সন পর্যন্ত পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরে রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে ঐ এলাকায় গ্যাস উৎপাদন ছিল ৩.৩ টিসিএফ যার মধ্যে মাত্র ০.৮ টিসিএফ সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে রপ্তানি হতো শুধুমাত্র তুর্কমেনিস্তানে থেকে।[২] কাজেই পশ্চিমা প্রযুক্তির আগমনের সাথে এসব সম্পদের সম্ভাব্য বৃহৎ মজুদ প্রাপ্তি নিত্যনতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং উত্তোলনের সম্ভাবনার কারণে মধ্যএশিয়ার এসব দেশের মধ্যে সম্ভাব্য নতুন পাইপলাইন স্থাপন এবং নতুন রপ্তানি বাজারের সম্ভাবনায় প্রচুর উদ্দিপনার সৃষ্টি করে। সে সাথে এ অঞ্চলের ভূ-কৌশলগত (Geo. Strategic) এবং ভূ-রাজনীতির (Geo. Political) এ নিত্য নতুন মাত্রা যোগ হতে থাকে।

মধ্যএশিয়ার তেল এবং গ্যাসের আনুমানিক পরিসংখ্যান ও অন্যান্য যে কোনো ভূ-অভ্যন্তরস্থ সম্পদের পরিসংখ্যানের মত সময় এবং নতুন প্রযুক্তির সমন্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। মধ্যএশিয়া কাস্পিয়ান অঞ্চলের তেলের প্রাপ্তির এবং মজুদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বর্তমানে ২০০১ সনে এ অঞ্চলে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৪০ টির অধিক তেল এবং গ্যাসের চুক্তি হয়েছে যাতে রয়েছে ২২টি দেশের ৫৩টি কোম্পানি। এসব চুক্তি এবং প্রাথমিক খরচ হিসেবে লগ্নি হয়েছে প্রচুর অর্থ। ক্রমশইঃ এসব গরিব দেশে জন্ম দিচ্ছে নতুন শাসক শ্রেণীর আর বিশেষ এক ধরনের বড়লোকের সমাজ। নেতৃবৃন্দের মধ্য ঢুকেছে প্রচুর দুর্নীতি। শাসকরা বিরোধীদের নিত্যনতুন অভিযোগে অভিযুক্ত করে হয় দেশ ছাড়া করেছে অথবা কারারুদ্ধ করেছে।

পরিসংখ্যানে বলা হয় যে, কাস্পিয়ান সাগরতটের চারটি দেশ আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানে প্রায় ৬৮

১। US Energy Department. "The Caspian Sea Region" October 1997.

২। Ahmed Rashid: "The New Sreat Game The Battle forCentral Asia's Oil" For Eastern Economic Review. 10 April 1997.

www.pathagar.com

বিলিয়ন ব্যারেল তেল উত্তোলন যোগ্য রয়েছে। এ পরিমাণ ইউরোপীয় সংরক্ষিত মজুদ থেকে এক তৃতীয়াংশ বেশি।[৩] আরও ধারণা করা হচ্ছে যে, আগামী ২০১০ এর মধ্যে এ অঞ্চল গড়ে প্রতিদিনে ৩.৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উত্তোলনে সক্ষম হবে। বর্তমানে এ উত্তোলন মাত্র ১ মিলিয়ন ব্যারেল (২০০২)। এ ছাড়াও এ অঞ্চল ঐ সময়ের মধ্যে দিন প্রতি আনুমানিক ২৫ বিলিয়ন ঘন ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনেও সক্ষম হবে।

যদিও এসব পরিসংখ্যানও পরিবর্তিত তবুও এসব পরিকল্পিত উত্তোলনের জন্য এ অঞ্চলে দারুণ প্রতিযোগিতা রয়েছে। প্রতিযোগিতা বাড়ছে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে। অনুমান করা যায় যে, ২০১০ সনের মধ্যেই বিশ্বের চাহিদা বর্তমান চাহিদা থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ঐ দশকের মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানের আমদানি ৫০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশে দাঁড়াবে।

বর্তমানে কাস্পিয়ান অঞ্চলে যে সব বড় ধরনের চুক্তি সম্পন্ন করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

কাস্পিয়ান পাইপলাইন কনসোরসিয়াম (Cospian Pipe Line Consortuim; CPC)ঃ প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ কনসোরসিয়াম কাজাকিস্তানের তেল উত্তোলন ক্ষেত্র তেনগিজ (Tengiz) থেকে রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগর তটের কদর নভোরোসিস্ক (Novorossiisk) পর্যন্ত ১০০০ মাইলের পাইপলাইনের প্রস্তুতির পথে রয়েছে। এ কনসোরসিয়ামে যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছে কাজাকিস্তান, রাশিয়া এবং ওমান। কোম্পানিগুলোর মধ্য রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাভরন এবং মোবিল কর্পোরেশন এবং রাশিয়ার লুকওয়েল (Lukoil)। পাইপলাইন ২০০০ সনে শেষ হবার কথা থাকলেও এখনও শেষের পথে মাত্র। বর্তমানে এতে দিন প্রতি ৫৬০,০০০ বিলিয়ন ব্যারেল পরিবহনের ক্ষমতা থাকলেও ২০১২-২০১৪ এর মধ্য এটি ১.৩ মিলিয়ন ব্যারেল পরিবহনে সক্ষম হবে।

তেনগিজ সেভরঅয়েল (Tengizchevroil:TCO) কাজাকিস্তান, স্যাভরন এবং মোবিল এর যৌথ উদ্যোগে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে কাজাকিস্তানের তেনগিজ ক্ষেত্রের উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এখানকার ক্ষেত্র বর্তমানে প্রতিদিনে ১৫০,০০০ ব্যারেল উৎপাদন করছে যা ২০০০ সনের মধ্যে ২২০০০০

৩। ABC News -Jorggen Wonbers Nov.-2001.

www.pathagar.com

উন্নীত করে ২০১০ সনের মধ্যে দিন প্রতি ৬০০০০০-৭০০০০০ ব্যারেলে উন্নীত করবার পরিকল্পনা রয়েছে। এ যৌথ উদ্যোগ হবে, CPC এর প্রধান ভোক্তা ।

চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানিঃ (China National Patrolio Company CNPC)। চীন কাজাকিস্তানের উজেন (UZEN) ক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলনের জন্য ৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ের এক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রায় ২০০০ মাইল দৈর্ঘ্যের কাজাকিস্তান হতে চীনের ভূ-খন্ড পর্যন্ত পাইপলাইন। উজেন ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৫-৬ বছরের (২০০০ সন থেকে ধরে) মধ্যে উত্তোলন করা হবে দিন প্রতি ১৬০০০০ ব্যারেল। সিএনপিসি এ প্রকল্প ২০০২ সনের মধ্যেই সম্পূর্ণ করবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এ পাইপলাইন দিন প্রতি ৪০০,০০০ ব্যারেল পরিবহনের ক্ষমতা রাখে।[৪]

আর্জেটিনার এ অখ্যাত কোম্পানি বিরদাস এসব পরিসংখ্যান প্রাপ্তির পূর্বেই শুধুমাত্র ব্যবসায়িক বুদ্ধির তাগিদে এ অঞ্চলে পদার্পণ করেছিল। বিরদাস এ ক্ষেত্রে প্রথমে যে দেশটির দিকে নজর দিয়েছিল সেটি ছিল তুর্কমেনিস্তান। বহু চেষ্টার পর ১৯৯২ সনের ১৩ জানুয়ারি ৫০ঃ৫০ শতাংশের অংশীদারিত্বে বিরদাস পূর্ব তুর্কমেনিস্তানের ইয়াসলার (Yashlar) ক্ষেত্রে গ্যাস এবং তেল অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বিরদাসের ৭৫ শতাংশ আর কাজাকিস্তানের ২৫ ভাগের অংশীদারিত্বে তুর্কমেনিস্তানের কেইমির (Keimir) অঞ্চলে তেল–গ্যাস অনুসন্ধান আর উত্তোলনের চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ সময়ে উৎফুল্লিত এ আর্জেনটিনিয়ান কোম্পানি ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি যে, সংখ্যা ১৩; প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ; তাদের জন্যও অশুভ বলে প্রমাণিত হবে। আর কার্লোস বুলঘোরেনী ইতিহাসে উল্লেখিত হলেও পরবর্তীতে বহু নামের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন এ বৃহৎ খেলার মাঠ থেকে।

www.pathagar.com

দুই

মধ্যএশিয়ার জ্বালানির রাজনীতি ঃ তুর্কমেনিস্তান

১৯৯২ সনে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ। মাত্র একবছরের উপরে অক্টোবর ১৯৯০ সনে তুর্কমেনিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আর এরই একবছরের মাথায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। এসব প্রক্রিয়ার দু বছরের মাথায় তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আসগাবাদে প্রচুর বিদেশীদের ভিড় জমতে থাকে। এদের মধ্য একজন বিরদাসের বুলঘোরেনী। জানুয়ারি মাসের কনকনে শীতের মধ্যে বিশ্বের অপর প্রান্তের আর এক তৃতীয় বিশ্বের দেশ আর্জেটিনার রাজধানী বুয়েন্সআয়ার থেকে আগত এ বিশেষজ্ঞ আসগাবাদের গ্রোগলি এস্টেটে অবস্থিত গ্রান্ড তুর্কমেন হোটেলে কোনো প্রকারে এসে উপস্থিত হন। বুলঘোরেনীর সাথে পরের দিনই জ্বালানি মন্ত্রাণালয়ের সাথে বিরদাসের প্রথম গ্যাস উৎপাদনের চুক্তি হবার কথা। বুলঘোরেনী এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এক বৃহত্তর জুয়ায় নেমেছেন।

জানুয়ারির আসগাবাদ। প্রচন্ড শীত, তার উপরে উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া। দিনের অর্ধেক বেলা পর্যন্ত রাস্তাতে এমনিতেই খুব একটা মানুষজন দেখা যায়না। প্রায় ৭০ বছর সোসালিস্ট অর্থনীতির মধ্যে থাকার কারণে এসব অঞ্চলের অর্থনীতির ভিত শুধুমাত্র মস্কোমুখি থাকায় বহিঃবিশ্বের সাথে আসগাবাদের হোটেলগুলোর তেমন পরিচয় ঘটে নি। হোটেলগুলো প্রায় চাকচক্যহীন হয়ে পড়ে আছে। বিরদাসের চেয়ারম্যানের সাথে প্রায় দশ সদস্য দলের তুর্কমেন রাষ্ট্রপতির সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত।

আসগাবাদ, আশকাবাদ অথবা আশকবাদ নামটার অর্থ 'প্রেমের নগরী'। কুকুরাম মরুপ্রান্তরের এ শহর খুব একটা ইতিহাস বিখ্যাত বা পর্যটকদের আকর্ষিত করবার মতও নয়। ঐ সময়কার যৌলুষবিহীন এ শহর–উপরে নীল

www.pathagar.com

আকাশের নিচে একটি জনপদ মাত্র। সাধারণ তুর্কমেনদের নিকট আসগাবাদের তেমন কোনো আকর্ষণও নেই। ১৯৪৮ সনে এক প্রচন্ড ভূমিকম্পে এ শহর ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ১১০০০০ লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। তারপর বহু বছর এ শহরটি বিশ্বের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন ছিল। এ ভূমিকম্পের প্রভাব আজও খুঁজলে পাওয়া যায়। এ শহরের এখন একমাত্র আকর্ষণ তুলকুচমা বাজার যা অনেকটা সেসিল বি ডেমিলের পঞ্চাশের দশকের আরব্য উপন্যাস ভিত্তিক ছায়াছবির মধ্যপ্রাচ্যের উশৃঙ্খল বাজারের দৃশ্যের মত। বাজারে আসে শত শত উট আর ছাগলের বহর, সে সাথে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রঙিন কাপড়ের ঘাগড়ায় আচ্ছাদিত শত শত আবাল বৃদ্ধা মহিলারা। এরা বেশির ভাগই বিভিন্ন গোত্রের বেদুইন বা জিপসি। বাজারে নিয়ে আসে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার। সমগ্র বাজার ছেয়ে থাকে বিভিন্ন রংয়ের হাতের তৈরি কার্পেট আর ট্রাক থেকে কারের চোরাই খুচরা যন্ত্রাংশ।

আসগাবাদের অদূরেই পুরানো শহর নিসা আর আনাউসের ধ্বংসাবশেষ যা মনে করিয়ে দেয় ঐতিহ্যবাহী সিল্ক রুটের। শহরের অদূরে আছে পাহাড়ের গুহার নিচে ঈষদউষ্ণ হ্রদ যা হ্রদগুলোর পিতা বলে পরিচিত। বহু লোকের সমাগম হয় এ জায়গায় বিভিন্ন বিশ্বাসের উপর ভর করে।

কোপেত দাগ পাহাড়ের পাদদেশে এ শহর ১৮৮১ সনে তৎকালীন রাশিয়ার সামরিক ছাউনি হিসেবে পারস্য (বর্তমান ইরান) সাম্রাজ্য সীমান্ত প্রহরার জন্য গড়ে উঠেছিল। ১৯১১ সনের দিকে কাস্পিয়ান হ্রদের সাথে রেল আর রাস্তার সংযোগ হওয়াতে ক্রমেই এর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। ১৯১৭ সনে রাশিয়ায় ভলসেভিকদের অভ্যুত্থানের পর স্থানীয় অভ্যুত্থানকারী নেতার নামে এ শহরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পলটোরাস্ক। ১৯২৭ সনে পুনরায় পুরানো নামে ফিরে আসে এবং ১৯৯০ সনে সোভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের রাজধানী হিসেবে পরিচিত হয়। ইরানের সীমান্ত থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরের এ শহরে ১৯৯১ সনের হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ৪,১২,০০০ জন।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান কেভিয়ার উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এ অঞ্চল এখন বিশ্বের বড় বড় অর্থ লগ্নিকারীদের দৃষ্টিতে রয়েছে।

তুর্কমেনিস্তান। মধ্যএশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলও ছিল ঐতিহাসিক আঙ্গিকে বহিঃবিশ্ব থেকে আগত সম্প্রসারণবাদের আওতায়। বহু আক্রমণকারী যুদ্ধবাজ সম্রাটের হাত ঘুরে সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রথমে রাজকীয়

www.pathagar.com

রাশিয়া পরে সোভিয়েতদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এ অঞ্চলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 'উঘোজ' উপজাতীয়দের উপরে বহু বছর মঙ্গোল আর উজবেক খানাতদের শাসন চলেছিল। এ সব শাসন ছিল ঊনিশ দশকের শেষ পর্যন্ত।

মঙ্গোলদের সাথে আগত বিভিন্ন উপগোত্রের সাথে মিশে আছে আজকের তুর্কমেনরা। সপ্তম শতাব্দী থেকে এতদঅঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রভাব পড়তে থাকে। পরে এগারো শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে পারস্য অঞ্চলে 'সেলজুক' শাসকরা সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সেলজুক সাম্রাজ্য ক্রমেই আমুদরিয়া অঞ্চল থেকে শুরু করে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক অঞ্চলে বিস্তার করলে বর্তমান তুর্কমেনিস্তান এসব সংস্কৃতি আর সভ্যতার আওতায় চলে আসে। ১০৫৫ সনে সেলজুকরা বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রতিপত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ১১৫৭ সনে শেষ শক্তিধর সেলজুক সম্রাট সানজার এর মৃত্যুর পর থেকে ক্রমেই সেলজুক সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে থাকে। ১৮৮১ সনে রাশিয়া তুর্কমেনিস্তান দখল করে নেয় এবং সাম্রাজ্যভুক্ত করে। এ অঞ্চল ১৯১৭ সনের ভলসেভিক অভ্যুত্থানে সাথে জড়িয়ে পড়ে।

তুর্কমেনিস্তান সহ বিভিন্ন অঞ্চল একসময় বিশেষ অঞ্চল এবং সময়ে সময়ে স্বাধীন থাকলেও প্রায় একশ' বছরের উপরে রাশিয়ার উপনিবেশ হয়ে থাকে। রাশিয়ার রাজকীয় শক্তি সাইবেরিয়া দখলের পর থেকেই ক্রমেই দক্ষিণ মুখে সম্প্রসারণ করতে থাকে কিন্তু প্রচন্ড বাধা আর বিভিন্ন ধরনের সামরিক জটিলতার কারণে এসব সম্প্রসারণ খুব সহজ হয়ে উঠে নি। সাইবেরিয়ার দক্ষিণে চীনের ভূ-খন্ডে রাশিয়ার সম্প্রসারণের প্রবল ইচ্ছা থাকলেও চীনের সাথে ১৬৮৯ সনের নেচিরিস্ক চুক্তির (Treaty of Nechirisk) কারণে আগাতে পারে নি। চীনের মধ্যে মঙ্গোলিয়াকে বাফার হিসেবে রাখে।

রাশিয়ার মধ্যএশিয়ার সম্প্রসারণ তখন অর্থনৈতিক কারণে ছিল না। এ সম্প্রসারণ ছিল সম্পূর্ণ ভূ-কৌশলগত এবং সামরিক কারণে। দক্ষিণের শক্তিশালী পারস্য আর ভারতের সাথে যোগাযোগ উন্নয়ন এবং এসব শক্তির উত্তরমুখি অভিযান ঠেকাবার জন্য এতদঅঞ্চলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাশিয়ার এসব ভূ-কৌশলগত কারণগুলোই অনেক সময় সামরিক নেতৃবৃন্দকে স্বাধীনভাবে অভিযান চালাতে উৎসাহিত করে। এমনিভাবে তুর্কমেনিস্তানে পিটার দি গ্রেট দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্যই অভিযান চালানোর প্রয়াস করে। এর প্রেক্ষিতে ১৯১৬ সনে কিয়েভের সন্নিকটে

www.pathagar.com

পিটারকে তুর্কমেনরাই হত্যা করে। অব্যাহত চাপের মধ্যে ১৮০২ সনে তুর্কমেনিস্তানের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ রাশিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করলে রাশিয়ার প্রভাব বাড়তে থাকে। উনিশ দশকের দিকে তুর্কমেনরা পারস্য, বুখারা আর কিয়েভের শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকলে রাশিয়া এসব বিদ্রোহীদের সাহায্য দিতে রাজি হয়। অনেক ষড়যন্ত্র আর সামরিক অভিযানের মধ্যে রাশিয়া ১৮৮৪ সনের মধ্যে তুর্কমেনিস্তান সহ সমগ্র মধ্যএশিয়া দখল করতে সক্ষম হয়। এ সম্প্রসারণের কারণে তৎকালীন রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত, পারস্য, চীন আর আফগানিস্তানের সীমান্তের সাথে অভিন্ন হয়ে উঠে। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রাশিয়ার দক্ষিণমুখি অভিযান পরের প্রায় দু'শ' বছর অন্যান্য শক্তির জন্য মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ করে ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসকদের জন্য।

ঐতিহাসিক এবং ভূ-কৌশলগত কারণেই মস্কোমুখি থাকায় এসব অঞ্চলে তেমন অর্থনৈতিক উন্নতিও হয় নি। ভলসেভিকদের অভ্যুদয়ের পর এসব অঞ্চলের ধর্মীয় উপাসনাগারগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক নিরীক্ষে বিখ্যাত মসজিদ এবং ইসলামিক বিদ্যাপিঠগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।

সপ্তম শতাব্দীর উমাইয়া খলিফাদের সময় থেকেই এসব অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটে। এখানেও তুরস্কের সুফীদের প্রভাব পড়ে যে কারণে এসব অঞ্চলে কখনই ইসলাম গোঁড়াপন্থীদের হতে পরে নি।

১৯২৪–২৫ সনে স্টালিন মধ্যএশিয়ায় পাঁচটি প্রজাতন্ত্রে ভাগ করলে এ বিভাজনকে মেনে নেয় নি কয়েকটি প্রজাতন্ত্র। এর একটি উদাহরণ, যে শতাব্দী ধরে তাজিকদের ঐতিহ্যের ধারকবাহক বলে পরিচিত সমরখন্দ আর বোখারা তাজিকিস্তান থেকে বের করে উজবেকদের হাতে তুলে দেয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এ দুই প্রজাতন্ত্রে শত্রুতার রেশ চলে আসছে। এমনিভাবে আরও বহু অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার সময় থেকেই অসন্তোষ চলে আসছে। স্টালিনও ঔপনেবেশিক শক্তির মতই বিভাজনের মধ্য দিয়ে শাসন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এসব অঞ্চলের ইসলামিক চিন্তাবিদরা সোসালিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল আর এগুলোতে সহায়তা দিচ্ছিল পশ্চিমা শক্তি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলোর মাধ্যমে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সৌদি আরব, তুরস্ক আর ইরান (শাহের আমলে)। তাই আরও পরে পাকিস্তান ও আফগানরা সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের সময়ে এ অঞ্চলে সিআইএ এর সহযোগিতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

১৯১৭ সনের পর থেকে বিশেষত বহিঃবিশ্বের সহযোগিতায় ইসলামিক গেরিলারা মস্কোর বিরুদ্ধে হাতিয়ার উঠিয়ে নেয়। মস্কো এসব বিদ্রোহীদের 'বাছমাচিজ' (Basmachis) বলে আখ্যায়িত করেছিল। এ শব্দের আক্ষরিক মানে হলো দস্যু। 'বাছমাচিজ' শব্দ হয়ে উঠল ইসলাম, জাতীয়তাবাদ আর কম্যুনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের পরিচয়। আরও পরে ১৯৭৯ সনে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধীরা দুনিয়াব্যাপী মুজাহিদ বলে পরিচিত হলেও মস্কোর কাছে 'বাছমাচিজ' বলে অধিক পরিচিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ এ বাছমাচিজদের ভলসেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছিল। এদের মধ্যে হাজার হাজার বিদ্রোহীরা উত্তর আফগানিস্তানে শরণার্থী হয়ে চলে আসে। ১৯২৯ সন পর্যন্ত এসব তাজিকদের আগমন হতে থাকলে উত্তর আফগানিস্তানে তাজিক বংশোদ্ভুতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠে। আর আজও তেমনি রয়েছে। উত্তর আফগানিস্তানে এখনও তাজিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৮০ সনের দিকে পুনরায় আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতাতেই এসব বাছমাচিজরা সোভিয়েত সৈনিক পোস্টগুলোকে অক্রমণ করতে থাকে জেহাদের নামে।

মধ্যএশিয়ার এসব রাজনৈতিক সমীকরণের কথায় আমরা পরে আসব। তবে এসব সমীকরণ যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তুর্কমেনিস্তানই সর্বপ্রথমে নিজেদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য। বিশেষ করে পাকিস্তানের সাথে মধ্যএশিয়ার স্থলপথের যোগাযোগ– এ তুর্কমেনিস্তান হয়েই।

১৯৯২ সনে বিরদাস এক অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করে। জানুয়ারি ১৩, ১৯৯২ সনে বিরদাস তুর্কমেনিস্তানের সাথে গ্যাস চুক্তিগুলো সম্পাদন করে। তখনও বিরদাস এসব গ্যাস প্রাপ্তির পর রপ্তানির জন্য অন্য কোনো দেশের সাথে কোনো অগ্রিম চুক্তিও করে নি এমনকি 'কনসোরসিয়াম' অথবা এ প্রচুর লগ্নির অর্থ যোগাড় করবার কথাও গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখে নি। বিরদাসের কর্মকর্তারা নিশ্চিত ছিল যে, তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস রপ্তানির প্রথম টার্গেট হবে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান হয়ে অন্য দেশে রপ্তানি হবে। বিরদাসের ত্বরিতকর্মা কর্মকর্তা বুলঘোরেনী এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধবাজ নেতাদের সামাল দেয়া কঠিন হবেনা যদি সঠিক অর্থের প্রলোভন দেখানো যায়। তুর্কমেনিস্তানের নেতা প্রাক্তন কম্যুনিস্ট পলিটব্যুরোর সদস্য সুপারমুরাত নিয়াজভ প্রথম থেকেই তাঁর দেশকে রাতারাতি বিত্তশালী দেশে

www.pathagar.com

পরিণত করবার স্বপ্নে বিভোর। বিরদাসের প্রস্তাব তাঁর কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মত মনে হওয়া স্বাভাবিক। শুধু বিত্তশালীই নয়, বিশ্বের দরবারে তুর্কমেনিস্তানের রাষ্ট্রপতির একটি সম্পদশালী দেশের নেতা হবার মোহ ছিল।

সুপারমুরাত নিয়াজভ ১৯৪০ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি এক সামান্য মজুরের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব শুধু দৈন্যতার মধ্যেই নয়, নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কাটে। তাঁর বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে নিহত হন আর বাকি পরিবারের প্রায় সদস্যই ১৯৪৮ সনের আসগাবাদ ভূমিকম্পে নিহত হলে আট বছর বয়সেই এতিম হয়ে দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং এতিমখানায় বড় হন। ১৯৬৬ সনে আসগাবাদের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে বৈদ্যুতিক বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ার হন। একটি স্থানীয় পাওয়ার স্টেশনে চাকুরির মধ্য দিয়ে সোসালিস্ট পার্টির সামান্য কর্মী থেকে তুর্কমেনিস্তানের পার্টির বড় নেতার যোগ্যতা অর্জন করেন। ১৯৮৫ সনে তাঁকে তুর্কমেনিস্তানের মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। পরে তাঁকে তুর্কমেনিস্তানের পার্টির সর্বোচ্চ পদ দেয়া হয়। জানুয়ারি ১৩, ১৯৯০ সনে নিয়াজভ তুর্কমেনিস্তানের সুপ্রিম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তাঁরই নেতৃত্বে ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন। আজীবন রাষ্ট্রপতি একনায়ক সুপারমুরাত নিয়াজভ এখনও তুর্কমেনিস্তানে অবিসংবাদিত নেতা। দুই সন্তানের জনক নিয়াজভ ৬২ বছর বয়সেও অত্যন্ত কর্মচঞ্চল। বিরদাস যখন তুর্কমেনিস্তানে তখন সে দেশটির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। কাবুলে নাজিবুল্লাহর সরকার উৎখাতের পথে। পাকিস্তানে নওয়াজ শরিফ সরকার মাত্র ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তুর্কমেনিস্তানের অর্থনীতির তখন তথৈবচ অবস্থা। মস্কোর সাহায্য ছাড়া নিয়াজভের অর্থনীতি অচল।

বিরদাসের সাথে নিয়াজভ চুক্তি করবার পরেও একমাত্র লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অনুকম্পা পাওয়া। একদিকে বিরদাস ইয়াসলার গ্যাস ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানি ইউনোকলকে অনুরোধ করেও সাড়া পাচ্ছিলনা, অন্যদিকে মধ্যএশিয়ার এ অস্থির অবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এগুতে সাহস করছিলনা। এমনি অবস্থায় ১৯৯৩ সনে যখন কাবুলে নাজিবুল্লাহর পতনের পর বোরহানউদ্দিন রব্বানী আর হেকমতইয়ারের বাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তখন নিয়াজভ যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। এ সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য আর জ্বালানি

www.pathagar.com

খাতে লগ্নি। তুর্কম্যান রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এককালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার হেগকে তুর্কমেনিস্তানের হয়ে সুপারিশের জন্য নিয়োগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইরানের মধ্য হয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আদায় করা; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য সফল হয় নি।

তুর্কম্যান রাষ্ট্রপতির বিত্তশালী হবার পরিকল্পনা ত্বরিৎ কার্যকর করবার অভিলাসের পেছনে দুটি কারণ ছিল। তুর্কমেন রাষ্ট্রপতি দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই দক্ষিণে আফগানিস্তানে ইসলাম পন্থীদের নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। কারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সিআইএ এবং আইএসআই এর সূচিত যুদ্ধ সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরেও অনুপ্রবেশ করেছিল এবং পরবর্তীতে নিয়াজভের নেতৃত্বকে মোকাবেলা করবার শক্তি যোগাচ্ছিল। অন্যদিকে আফগানিস্তানে প্রায় পাঁচলক্ষ আফগান তুর্কমেন অধিবাসীদের মধ্য থেকে প্রচুর জেহাদি তৈরি হয়েছিল। নিয়াজভ ক্ষমতার শিখরে আরোহণের সাথে সাথেই সে দেশের বৃহত্তর গরিব জনগোষ্ঠিকে জেহাদিদের দ্বারা প্রভাবিত হবার হাত থেকে দূরে সরাবার ব্যবস্থা হিসেবে গ্যাস, বিদ্যুত আর পানির ব্যবহারকে একেবারে বিনা পয়সায় দেবার ঘোষণা করেন। যদি এ সুবিধে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তুর্কমেন উপগোষ্ঠির তেমন কোনো উপকারেই আসে নি।

সোভিয়েত রাশিয়ার সময়ে তুর্কমেনিস্তান অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে পর্যবসিত হয়েছিল। সমগ্র সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে তুর্কমেনিস্তানে বেকারের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে অধিক আর শিল্পায়ন ছিল না থাকার মতই। ১৯৮৯ সন পযন্ত তুর্কমেনিস্তানের ৪৭ শতাংশ আয় ছিল ৩.৭ টিসি এফ গ্যাস সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে রপ্তানির কারণে তবে এসব প্রজাতন্ত্রের কাছে এখনও তুর্কমেনিস্তানের পাওনা অর্থ পরিশোধিত হয় নি। তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে যার কারণে বর্তমানে এসব প্রজাতন্ত্রের সাথে সম্পর্কের চীর ধরছে। মে, ২০০২ সনেই ইউনোকলের নিকট তুর্কমেনিস্তানের অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ইউক্রেন সরকার তুর্কমেনিস্তানের পয়নিষ্কাশন, আসকাবাদে সুরঙ্গপথ আমুদরিয়ার উপরে রেল সেতু এবং পাইপলাইনের জন্য কম্প্রেসর দেবার প্রস্তাবনা করেছে। এর পরেও ইডফরেন ৪০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস ১০০০ ঘনমিটার ৪২ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ক্রয় করবার চুক্তি রয়েছে। এসব অর্থের অর্ধেক নগদ পরিশোধ যোগ্য বাকি

www.pathagar.com

অর্ধেক বিভিন্ন কাজের বিনিময়ে পরিশোধের পরিকল্পনা করা হয়।[২]

তুর্কমেনিস্তানের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থাকবার কথা নয় পর্যাপ্ত জ্বালানি সম্পদ মজুদের কারণে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের কারণে তুর্কমেনিস্তান তার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতি করতে পারে নি আর এ কারণেই নিয়াজভ মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

তুর্কমেনিস্তানের দুর্ভাগ্য একমাত্র ভৌগোলিক কারণে। তুর্কমেনিস্তানের একদিকে ইরান যার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপের পর্যায়ে অন্যদিকে অশান্ত আফগানিস্তান আর উত্তরে প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো। তুর্কমেনিস্তানে অর্থবহ রপ্তানির জন্য প্রয়োজন দক্ষিণমুখি বাণিজ্য সম্প্রসারণ। ইরানের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য হলেও আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সম্ভব নয়। অন্যদিকে রাশিয়া সাইবেরিয়া হতে গ্যাস রপ্তানি বৃদ্ধি করবার অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত তুর্কমেনিস্তান দক্ষিণ এবং পশ্চিমমুখি গ্যাস রপ্তানিকে যথাসম্ভব প্রতিহত করতে প্রয়াসরত। শুধু ইউক্রেনই নয়, ১৯৯২ সনে আরমেনিয়া সহ রাশিয়াও তুর্কমেনিস্তানের পাওনা অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। তুর্কমেনিস্তান তখন অনোন্যপায় কারণ যেমনটা আগেই বলেছিলাম যে, যতটুকু গ্যাস রপ্তানি করা হতো তার সমগ্র পাইপলাইনের গতিই ছিল উত্তরমুখি আর গতি নিয়ন্ত্রিত হচেছ রাশিয়ার হাত দিয়েই। এ সবের কারণে তুর্কমেনিস্তান ১৯৯৪ সন পর্যন্ত রাশিয়ায় গ্যাস সরবরাহ একেবারেই কমিয়ে আনে। ঐ সময় পর্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৭৩ টিসিএফ মাত্র, আর পাওনা অর্থ দাঁড়ায় প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়ে নিয়াজভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও ইরানের দ্বারস্থ হয় গ্যাস রপ্তানির জন্য। একদিকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নির জন্য আশান্বিত থাকে অন্যদিকে ১৯৯৭ সনে ইরান-তুর্কমেন চুক্তির আওতায় ইরান প্রায় ১১৯ মাইল দীর্ঘ পাইপলাইনের কাজ সম্পন্ন করে। তুর্কমেনিস্তানের পশ্চিমের গ্যাস ক্ষেত্র কোরপেদজের (Korpedzhe) সাথে ইরানের উত্তরের

তুর্কমেনিস্তান পাওনা অর্থের পরিমাণ

১৯৮৯ সনের হিসাবে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৮.৮ শতাংশ, শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ৫৪ থেকে ১১১; শিশুশ্রম ছিল ৬২ শতাংশ। হাসপাতালগুলো ছিল ডাক্তার বিহিন এবং পানি সহ অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল না থাকার মত।

Source : Rashid Ahmed: The Reinasrgence of Central Asia, Islam of Nationalism?

২। ITAR - TASS. Interfax. May 27. 2002.

www.pathagar.com

কোর্দ-কুই (Kord-Kuy) এর সাথে সংযুক্ত করে। এখন পর্যন্ত এ পাইপলাইনটি মধ্য এশিয়ার সাথে দক্ষিণের যোগাযোগ মাত্র।[৩]

ইরান ছাড়াও অতি উৎসাহী নিয়াজভ নিজ উদ্যোগে তুর্কমেনিস্তান-ইরান-তুরস্ক পাইপলাইন যার উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক হয়ে ইউরোপে রপ্তানি করা। এর ব্যয় ধরা হয়েছিল ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের ফলে আন্তর্জাতিক লগ্নি না পাওয়ার কারণে এ চুক্তি ব্যর্থ হয়। আরও পরে ১৯৯৯ সনে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কনসোরসিয়ামের আওতায় আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এবার ইরানের ভূ-খণ্ড বাদ দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের তলদেশ এবং আজারবাইজান হয়ে তুরস্কে পৌঁছাবে।[৪]

নিয়াজভের পরিকল্পনার মধ্য সবচেয়ে বড় ছিল ৫০০০ মাইল দৈর্ঘ্যের পাইপলাইনের সাহায্যে চীনে গ্যাস রপ্তানি করা। পরিকল্পনার জন্য একদিকে জাপানী কোম্পানি মিৎসুবিসি আর অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সন (Exxon) কে এ ২০ বিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা যাচাইয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, চীন আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্য প্রেরণের পর থেকে পাকিস্তানের মাধ্যমে মুজাহিদদের অস্ত্র আর সিনজিয়াং প্রদেশের উইগুর মুসলমানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগান মুজাহিদদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। চীন সরকার ঐ সময়ে সিনজিয়াং অঞ্চলে সিআইএ কর্তৃক পরিচালিত ভূ-রাডার স্থাপনারও সম্মতি দিয়েছিল। আফগানিস্তানে চীনের প্রভাব খুব বেশি না থাকলেও শোল-য়ে জাওয়াদ নামের কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থক ছিল। জহির শাহের উৎখাতের পর দাউদের শাসনামলে এ পার্টি সরকারকে সমর্থন করে। ঐ সময়ে চীনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে পরাস্ত করা। তবে চীন সংলগ্ন রাশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোতে চীন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।[৫]

১৯৯২ সনে বিরদাসের আগমন সপারমুরাত নিয়াজভের জন্য একদিকে যেমন নতুন দিগন্তের হাতছানি দিয়েছিল তেমনি তার পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করবার প্রয়াসকে বাধাপ্রাপ্ত করবার কারণগুলোর মধ্যেও অন্যতম ছিল। বিরদাসের

৩। ১৯৯৮-২০০০ পর্যন্ত ইরানে গ্যাস রপ্তানির ৫৮ ভাগ দ্বারা পরিশোধিত হবে এ পাইপলাইনের যা প্রায় ১৯০ মিলিয়ন ডলার ইরানের অর্থ।

৪। এ কনসোরসিয়াম পি এস জি ইন্টারন্যাশনাল এর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বেকটেল এন্টারপ্রাইজ এবং Genesal Electsic Copilal Structure Finance Group এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত।

৫। এই লেখকের পুস্তক "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা ঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা", পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

পরিকল্পনায় প্রথমবারের মত ইরানকে বাদদিয়ে আফগানিস্তান-পাকিস্তান পাইপলাইনের প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছিল। যার নাম তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান পাইপলাইন (TAP)। ৭৫০ মাইল দীর্ঘ এ পাইপলাইন পাকিস্তানের মুলতান হয়ে গোয়াদর নামক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ হবার কথা রয়েছে। আজও এ পাইপলাইনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক খেলা চলছে যার বিবরণে আমরা আরও পরে আসব। এ পাইপলাইনের মাধ্যমে মুলতান হয়ে পরবর্তীতে ভারতের দিল্লি পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ হতে যে গ্যাস রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে সে পাইপলাইনটিও ভারতে দিল্লির সাথে সংযুক্ত হবার কথা রয়েছে। পরিকল্পনা রয়েছে মায়ানমারের ভারত অভিমুখি গ্যাস পাইপলাইন বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতের পাইপলাইনের সাথে সংযুক্তিকরণ। তবে পাকিস্তানের সাথে ভারতের তিক্ততার কারণে TAP এর পূর্বমুখি সম্প্রসারণ অচল রয়েছে। এ পাইপলাইন নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সমর্থিত কোম্পানি ইউনোকল এবং বিরদাস-এ দুই কোম্পানিতে রেষারেষি শুরু হবে। এ রেষারেষির মধ্যে পড়বে একদিকে তালেবান আর অন্যদিকে আফগানিস্তানের গোত্রীয় যুদ্ধবাজ নেতারা। শুধু তাই নয়, গদি হারাতে হয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে। এ বিষয়টিতে আরও একটু পরে ফিরে আসব।

সামরিকভাবে দুর্বল তুর্কমেনিস্তান স্বাধীনতার পর থেকে আফগান গৃহযুদ্ধ এবং তালেবানদের উত্থান, উৎখাত পরবর্তী সময়েও নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে। ঐ সময়ে একদিকে রাশিয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে, ঠিক তেমনি আফগান উপাখ্যানেও জড়িয়ে পড়ে নি। এ কারণেই তুর্কমেনিস্তান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র উজবেকিস্তান এবং রাশিয়ার তালেবান বিরোধী জোটে যোগ দেয় নি। সে জন্য তুর্কমেনিস্তানের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো যায় নি। প্রকৃতপক্ষে আসগাবাদ কাবুলে সকল সরকারকেই তেল এবং তেল জাতীয় জ্বালানি সমানভাবে সরবরাহ করে আসছিল। তুর্কমেনিস্তান বিভিন্ন সময়ে কাবুল এবং অন্যান্য যুদ্ধবাজ নেতাদের সাথে সমান তালে সম্পর্ক রেখে চলেছিল। বস্তুতপক্ষে মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে তুর্কমেনিস্তানই একমাত্র প্রজাতন্ত্র যেটি তালেবানদের বিরোধিতা করবার জায়গায় সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। তুর্কমেনিস্তানের সাথে উজবেকিস্তানের শুধু ঐতিহাসিক শত্রুতাই নয় বরং একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা তুর্কমেনিস্তানের সম্পর্কে বলেছি কারণ মধ্যএশিয়ার একমাত্র এদেশটিই বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার সাথে যোগাযোগের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে বলে তুর্কমেনিস্তানের ব্যাপারে উৎসাহ একটু ভিন্নতর। এ কথাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মধ্যএশিয়ার অবস্থান আর ঐতিহাসিক নিরিখে দুটি আঞ্চলিক শক্তি ইরান আর বর্তমানে তুরস্ক অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে গুরুত্বের দিক থেকে তুরস্কের স্থান সর্বাগ্রে।

www.pathagar.com

তিন

মধ্যএশিয়ার আঞ্চলিক প্রভাব

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গনের পরে যে কয়েকটি আঞ্চলিক দেশ লাভবান হয়েছে তার মধ্যে তুরস্কের নাম রয়েছে সর্বাগ্রে। মধ্যএশিয়ার চলমান 'গ্রেটগেম' এর প্রেক্ষিত সহজগম্য করতে হলে তুরস্কের অবস্থান সংক্ষেপে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৃহত্তর তুর্কিবাদ (Pan-Turkism) সোভিয়েত ইউনিয়ন বিখন্ডিত হওয়ার পূর্বে একটি রোমান্টিক স্বপ্ন মনে হলেও ১৯৯১ সনের পর থেকে এ ধারণার পরিবর্তন অত্যন্ত লক্ষণীয়। তুর্কিবাদের বৃহত্তর ক্ষেত্র ভূ-মধ্যসাগর হতে চীনের নিসজিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত কারণ এসব অঞ্চলে 'অটোমন' খিলাফাত এর সময় থেকেই তুর্কি প্রভাব পড়তে থাকে। এরই কারণে তুর্কি ভাষার প্রচলন মধ্যএশিয়ার ককেসাশ অঞ্চল হয়ে চীনের সিনজিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যএশিয়ার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো ঐতিহাসিক এবং অনেকটা সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য, মডার্ন চিন্তাধারা এবং তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির জন্য একে মডেল হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। এরই প্রেক্ষিতে তুরস্ক মধ্যএশিয়ায় তার প্রভাব বিস্তারেও পিছিয়ে নেই। স্মরণযোগ্য যে, মাত্র কয়েকমাস পূর্বেই আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষীবাহিনীর কর্তৃত্বও তুরস্ক গ্রহণ করে। আমার উপরের বক্তব্যের আঙ্গিকে এ ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আজকের তুরস্ক ঐতিহাসিক বিবর্তনের এককালের আনাতোলিয়া নামক বৃহত্তর সাম্রাজ্যের সংকুচিত ভূ-খন্ডের নাম। আনাতোলিয়ার ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে সপ্তম এবং অষ্টম শতক থেকে ইসলামের প্রসার ঘটে। তবে ইসলাম ধর্মের প্রসার মধ্যএশিয়া হতে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার পেছনে যে সাম্রাজ্য ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সে সাম্রাজ্যের নাম উসমানিয়া

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য বা অটোমান এম্পায়ার (Ottoman Empire) ১৩০০–১৯২০ সন পর্যন্ত। এ ছয়শত বছরে উসমানিয়া সাম্রাজ্য ইউরোপের বুলগেরিয়া হতে দক্ষিণে ইরাক আর পূর্বে সমগ্র ভূমধ্যসাগর আর পশ্চিমে সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময়েই মুসলিম শক্তি আনাতোলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য আর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বৃহৎ শক্তি হিসেবে সমগ্র মধ্যএশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। শুধু সামাজ্য বিস্তারেই নয়, ইসলামিক সংস্কৃতিকে এক উজ্জ্বল রূপ দিয়ে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে। ইউরোপের বলকান অঞ্চলে আনাতোলিয়ার প্রভাব এখনও প্রতীয়মান।

অটোমান বলে পরিচিত সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় তুর্কি যোদ্ধা গোত্রদের মধ্য থেকে। ওসমান–১ এর বংশধর বলে বিবেচিত তুর্কমেন ওগুজ সামাবর গোত্রের বলে পরিচিতি লাভ করেন। এরা মধ্যএশিয়া থেকে চেঙ্গিসখানের সামরিক শক্তি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পূর্ব এবং মধ্য আনাতোলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আনাতোলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যএশিয়ার উজবেকিস্তান থেকে তৈমুর লং এর নেতৃত্বে সমস্ত আনাতোলিয়া সহ মধ্যএশিয়া জয়ের মধ্যদিয়ে কিছু সময়ের জন্য অটোমানদের কর্তৃত্ব খর্ব হলেও ১৯২০ সন পর্যন্ত এ সাম্রাজ্য টিকে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলে ১৯২০ সনে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত নব্য তুরস্কের জন্ম হয়। তবে ঐতিহাসিক যোগসূত্রের কারণে তৈমুর লং আর অটোমানদের প্রভাব একত্রিত হয়ে মধ্যএশিয়ায় এখনও বিদ্যমান রয়েছে। আজও সমরখন্দের সিরদার মাদ্রাসা এবং গুর–এ–আমির বলে পরিচিত সমাধিতে তৈমুর লং চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। এ তৈমুর লং এর বংশধর জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর দিল্লিতে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন।[১]

ঐতিহাসিক নৈকট্যের কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর তুরস্ক মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোর সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে যত্নবান হয়ে উঠল। তুরস্ক এসমস্ত প্রজাতন্ত্রে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য থেকে শুরু করে আঙ্কারার বিমান যোগাযোগ, তুরস্ক টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার ইত্যাদি নতুন উদ্যমে শুরু করে। এখানেই থেমে থাকে নি তুরস্ক, সর্বক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে বৃহত্তর তুর্কি সমাবেশেরও আয়োজন করল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তুরস্কের কোম্পানিগুলো যার মধ্যে জ্বালানি বিষয়ক কোম্পানিই ছিল প্রধান। ১৯৯২–১৯৯৮ এর মধ্য মধ্যএশীয় অঞ্চলে প্রায়

১। Encyclopaedia Britannica - 1994-2002.

www.pathagar.com

১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লগ্নি করেছিল। এসব করতে গিয়ে রাশিয়া তুরস্ককে পাশে রাখবার জন্য ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গ্যাস তুরস্কের বাজারের জন্য ক্রয় করে।[২]

ক্রমেই তুরস্ক মধ্যএশিয়ার নতুন কূটনৈতিক সমীকরণের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তুরস্কের নিজের চাহিদা আর মধ্যএশিয়ার বিশেষ করে কাস্পিয়ান অঞ্চলের তেল ও গ্যাসের সংক্ষিপ্ত রাস্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবার পর থেকেই তুরস্ক মধ্যএশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে সংযোগকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হতে লাগল। ১৯৯৭ সনে তুরস্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে জর্জিয়া এবং ককেসাস অঞ্চলের মধ্যদিয়ে আজারবাইজানের বাকু অঞ্চলের তেল ক্ষেত্র হতে ভূমধ্যসাগরীয় তুরস্কের বন্দর চেইহান পর্যন্ত ট্রান্সপোর্টের করিডর দিয়ে তেলের পাইপলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। তুরস্কের এ পাইপলাইনের কাজাকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানও যোগ দেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে। এসব পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত। তবে যুক্তরাষ্ট্র এসব পাইপলাইনকে কাস্পিয়ান সাগরের তলদেশ দিয়ে তুরস্কের বন্দর পর্যন্ত নিতে আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের এসব প্রস্তাবের পেছনে কাজাকিস্তানের তেলকে পূর্বদিকে চীনের ভূ-খন্ডে প্রবাহিত হওয়া থেকে কৌশলে বিরত রাখা। অন্যদিকে বাকু-চেহেন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে এর সাথে অন্যান্য প্রজাতন্ত্র যুক্ত হলে রাশিয়ার ভূ-খন্ড ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও কমে আসবে এবং একাধারে যেমন চীন তেমনি রাশিয়াকে মধ্যএশিয়ার এ বৃহৎ জ্বালানি ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা যাবে।

আজারবাইজানের প্রধান কোম্পানি আজারবাইজান ইন্টারন্যাশনাল অপারেটিং কোম্পানি (AIOC) যা বিশ্বের প্রায় এক ডজন কোম্পানির কনসোরসিয়ামের প্রধান, তুরস্কের কুর্দি সমস্যার কারণে ঐ রাস্তা পরিহার করবার জান্য চাপ দিচ্ছিল। তবে আজারবাইজানের এ চাপ কার্যকর হয় নি কারণ ততদিনে আফগানিস্তানে তালেবানদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতের সূচনা হয়েছিল মাত্র। সময়টি ছিল ১৯৯৮। ঐ সময়েই তুরস্ক কুর্দিদের অভ্যুত্থানকে অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করবার প্রয়াসে কুর্দি নেতা আর্চালনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বিচারে দাঁড় করায়। অবশ্য পরে আর্চালনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। স্মরণযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলো সেখানে ইরাকের কুর্দিদের সাদ্দাম হোসেনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত অন্যদিকে তুরস্কের কুর্দিদের

২। Pettifeo. James: The Turkish Labyrinth Ataturk and the New Islam. Penguin Book - 1997.

www.pathagar.com

দমনের মৌন সম্মতি দিয়েছিল। আফগান পরিস্থিতির অস্থিতীশিলতার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাকু চেহান করিডোর কাস্পিয়ান তথা মধ্যএশিয়ার নীতির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৯৮ সনে বিশ্ববাজারে তেলের দামের মন্দাভাবের মধ্যেও এ ব্যয়বহুল পাইপলাইন নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষান্ত দেয় নি শুধুমাত্র মধ্যএশিয়ার উপরে প্রভাব বিস্তারের নতুন নীতির কারণে।

তুরস্ক আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদে নৈতিক সম্মতি ছাড়া তেমন বেশি সক্রিয় ছিলনা তবে উত্তর অঞ্চলের তুর্কি বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠি এবং তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রেখেছিল। আঙ্কারা উত্তর আফগানিস্তানে উজবেক নেতা রশিদ দোস্তামকে শুধু শরণ দেয় নি বরং তালেবান বিরোধে প্রচুর অর্থেরও যোগান দিয়েছিল। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৯৮ সনে তালেবান কর্তৃক মাজার–ই-শরিফ দখলের পর দোস্তাম আঙ্কারাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তালেবানদের বিরোধিতা করতে গিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও পাকিস্তানের সাথেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তালেবান বিরোধের কারণেই তুরস্কের সাথে ইরানের নৈকট্য বাড়ে বিশেষ করে মধ্যএশিয়া তথা কাস্পিয়ান সাগরে ইরানের যথেষ্ট প্রভাবকেও তুরস্ক নিজের পক্ষে রাখতে যথেষ্ট যত্নবান হয়।

ইরান মধ্যএশিয়ার বর্তমান জ্বালানি উত্তোলন এবং বাজারজাত করণের কূটনৈতিক টানাপড়েনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কোনো উন্নতি হয়-ই নি বরং অনেকাংশে অবনতিও হয়েছে। ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক যোগসূত্র এবং মধ্যএশিয় সম্পদ সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সাথে অভিন্ন সীমান্ত সব মিলিয়ে মধ্যএশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে সাথে ইরানের ভূ-খন্ডই সবচেয়ে কম দূরত্বে এবং স্বল্প সময়ে মধ্যএশিয়ার গ্যাস এবং তেলের রপ্তানি সমুদ্র তট পর্যন্ত পরিবহন করতে সক্ষম। ইরানের ভূ-খন্ড দিয়ে যেকোনো দক্ষিণমুখি পাইপলাইন অশান্ত আফগানিস্তানকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়াতেও প্রবেশ করানো সম্ভব। এছাড়াও ইরানের নিজস্ব সম্পদের বৃহৎ রপ্তানি বাজার রয়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভের দেশ ইরানে রয়েছে ৯৩ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের রিজার্ভ।[৩] এর সর্বোচ্চ প্রতিদিন ৩.৬ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করা হয় মাত্র। ইরানে পূর্বতন শাহের আমলে বন্দর আব্বাস, যার পরিবর্তিত নাম বন্দর খোমেনি, পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর তেল গ্যাস টার্মিনাল।

৩। ১৯৯৯ এর সার্ভে।

www.pathagar.com

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৈরিতার কারণেই ইরানের ভূ-খন্ডকে বাদদিয়ে মধ্যএশিয়ার তেল গ্যাসের রপ্তানির প্রয়াসে প্রচুর অর্থ খরচ করা হচ্ছে। ইরানের সাথে তুরস্কের সম্পর্ক ভালো থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরিতার কারণেই তুরস্ক বিপাকে রয়েছে। হালে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (জুনিয়র) এর আখ্যায়িত 'এক্সিস অব ইভিল' (শয়তানের অক্ষ) বলে পরিচিত ইরানের সাথে নিকটতম সময়ে সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা কম। এখানে উল্লেখ্য যে, ইরানের সাথে আফগান নীতি নিয়ে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক খুব সুখকর নয়। অন্যদিকে ইরান ভারতের বৃহৎ জ্বালানি বাজারে সরাসরি প্রবেশের জন্য চেষ্টায় রত। বর্তমানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিও ইরান ভালো চোখে গ্রহণ করছে না।

এতসব কূটনৈতিক জটিলতার মধ্যেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানি ভিত্তিক কোম্পানিগুলো ইরানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সময়ে এসব বৃহৎ জ্বালানি কোম্পানিগুলো ইরানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈরিভাব উপেক্ষা করেই ইরানের মাধ্যমে কাজাকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানের তেল ইরানের কাস্পিয়ান বন্দর 'নকা'র প্রান্তর শোধনাগারে পৌঁছানোর বদলে সমপরিমাণ তেল গালফ বন্দর থেকে সংগ্রহ করেছে। ইরানের মধ্য দিয়ে সরাসরি পাইপলাইন প্রকল্প কূটনৈতিক কারণে ব্যাহত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরানের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

তুরস্ক ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরিতার সুযোগের মধ্য দিয়েই তার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কাস্পিয়ান সাগরের পরিকল্পনাগুলোতে অধিক আগ্রহী। কাজেই বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষিতে তুরস্ক নিজেকে অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে পেয়ে এ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নয়। এ নীতি তুরস্কের জাতীয় স্বার্থের নীতির অন্যতম তাই আঙ্কারার প্রতিটি সরকারই এ নীতির সমর্থনে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, তুরস্ক ন্যাটোর (NATO) একমাত্র মুসলিম সদস্য এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (EU) তে অন্তর্ভুক্তির জোর প্রচেষ্টায় রত। আরও উল্লেখ্য যে, তুরস্কের সাথে ইসরায়েলের সরকারি পর্যায়ে সম্পর্ক বহুদিনের। ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে মধ্যএশিয়ায় তুরস্কের নৈকট্য বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আঙ্কারার অবস্থান ঐ অঞ্চলের যে কোনো দেশের চেয়ে সুদৃঢ়। ভবিষ্যতে মধ্যএশিয়ার যে কোনো পরিস্থিতিতে তুরস্কের প্রভাব কাজ করবে সবচেয়ে বেশি।

www.pathagar.com

চার

মধ্যএশিয়ার গ্রেটগেমে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনোকলের প্রবেশ

১৯৯২ সনের জানুয়ারিতে বিরদাস যে সাফল্য অর্জন করেছিল তা ছিল ঐ কোম্পানির চেয়ারম্যান কার্লোস বুলঘোরেনীর স্বপ্নলালিত আশা। এই ইটালিয়ান বংশোদ্ভুত আর্জেন্টিনিয়ান নিজেকে বিশ্বের জ্বালানি ব্যবসার একজন করিৎকর্মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্ব সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানসম্পন্ন এ ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অনিবার্য–আর পতনই খুলে দেবে বিশ্বে নতুন জ্বালানির উৎসের দ্বার যেমনটা খুলে দিয়েছিল ১৯২০ সনে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানির উৎস উন্নয়নের পর। মধ্যএশিয়াতেই খুঁজে পাওয়া যাবে এক নতুন উৎস যা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে। তবে বিরদাসের এ কর্মকর্তা অর্থনৈতিক বন্ধনের মধ্যদিয়ে মধ্যএশিয়ার জ্বালানি রপ্তানির মাধ্যমে একদিকে যেমন আফগান স্থিতিশীলতার কামনায় ছিলেন তেমনি ভেবেছিলেন এ বন্ধন দক্ষিণ এশিয়াকেও স্থিতিশীল করবে। আর এ বিশ্বাসেই ১৯৯২ সনের পর থেকে ১৯৯৫–৯৬ সনে প্রায় ছয়মাস আফগানিস্তানে চরম অস্থিরতার মধ্যে এক যুদ্ধবাজ নেতার দ্বার থেকে অন্য যুদ্ধবাজ নেতার দ্বার হয়ে – তালেবান, আসগাবাদ, কাবুল, ইসলামাবাদ আর মস্কো ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কার্লোসের পিতা, আর্জেন্টিনায় ইটালির এক অখ্যাত বসতকারী, আলেকজান্দ্রো এঞ্জেল ১৯৪৮ সনে অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে এ কোম্পানির গোড়াপত্তন করেন। এ কোম্পানি ঐ সময়ে আর্জেন্টিনার নতুন আবিষ্কৃত তেল কূপ এবং শোধনাগারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকাদারীর কাজ দিয়ে শুরু করে। ১৯৭৮ সনের মধ্যে কার্লোস আর তার ভাই আলেকজান্দ্রো বুলঘোরেনী মিলে এ কোম্পানি 'লাতিন আমেরিকার' তৃতীয় বৃহত্তম

www.pathagar.com

কোম্পানি হিসেবে গড়ে তোলেন। তবে তুর্কমেনিস্তানের পূর্বে বিরদাসের এশিয়া মহাদেশের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা ছিলনা।[১]

তুর্কমেনিস্তান দিয়েই বিরদাস শুরু করেছিল এশিয়ায় তাদের যাত্রা। ১৯৯৪ সন পর্যন্ত এ কোম্পানি প্রায় তুর্কমেনিস্তানের ইয়াসলার গ্যাস আর কেইমির তেল ক্ষেত্র সংস্কার এবং উত্তোলনের জন্য প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মধ্যম সাইজের কোম্পানি থেকে ক্ষুদ্র হলেও এ কোম্পানিই প্রথম এ অঞ্চলে এত বৃহৎ অংকের অর্থ লগ্নি করে। ঐ তেল ক্ষেত্র থেকে ঐ সময়ে প্রতিদিন ১৬,৮০০ ব্যারেল উৎপাদন শুরু করে। অন্যদিকে ১৯৯৫ সনের মাঝামাঝি ইয়াসলারে প্রায় ২৭ টিসিএফ গ্যাসের মজুদের নিশ্চয়তা করে। উল্লেখ্য, গ্যাস প্রাপ্তির পরে উত্তোলনের জন্য প্রয়োজন তাৎক্ষণিক বাজারজাত করণ যা তেলের জন্য তেমন প্রয়োজন হয়না। এ কারণেই বিরদাস মরিয়া হয়ে গ্যাস বাজারজাত করবার আপ্রাণ চেষ্টায় নেমে পড়ে।

বিরদাসের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে রাশিয়ার বাজার তৈরি থাকলেও বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান বাজার এবং দক্ষিণ এশিয়া হয়ে পূর্ব এশিয়ার বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভবান মনে করবার কারণেই সম্ভাব্য চীনের বাজার বাদ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দিকেই কার্লোসের দৃষ্টি নিবন্ধিত হয়।

১৯৯৪ সনে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ঘটে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ঐ সময়ে পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (PPP) জুলফিকার আলী ভুট্টোর তনয়া বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতায় আসেন। তখন পাকিস্তানের অর্থনীতির অবস্থা দারুণ সংকটের মধ্যে। অন্যদিকে প্রায় ১৫ বছরের উপর আফগান সমস্যার কারণে পাকিস্তানের উপরে সামাজিক, ধর্মীয় আর অর্থনৈতিক চাপ পড়তে থাকে যার কারণে সে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অস্থিরতার অবনতি ঘটে। বেনজির ভুট্টোর দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া ছিল এক অস্বাভাবিক ঘটনা। প্রথমবারে বেনজির সরকারকে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই গদি হারাতে হয়। তখন অবস্থা আরও চরমে ছিল। একদিকে আফগান পরিস্থিতির চাপ আর অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সেনাবাহিনীর সাথে বেনজিরের ব্যক্তিগত অসহনীয় সম্পর্ক সবই প্রথম প্রধানমন্ত্রীত্ব স্থায়ী হতে দেয় নি।

১। Ahmed Rashid "Taliban Islam Oil and New Great Game in Central Asia".

www.pathagar.com

বেনজির ভুট্টো দ্বিতীয়বারে মত প্রধানমন্ত্রী হলেও এবার তাঁকে বহু দলের সমর্থন নিতে হয় যার মধ্যে জামাত-ই উলেমাই ইসলামের মত কট্টর ধর্মীয় দলগুলোও ছিল। এ দলের দু'প্রান্তে পশতুন নেতা মওলানা ফজলুর রহমানের মত কট্টর ধর্মীয় ভিত্তিক নেতাদের সাহায্য নিতে হয়। অন্যদিকে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ উদ্ভুত পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক উদাসীনতার কারণে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর উপরে আফগান নীতি ছেড়ে দিতে হয়। এসব পরিস্থিতিতে বেনজিরের প্রথম করণীয় হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তানের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা এবং সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙ্গনের পর মধ্যএশিয়ার তথাকথিত মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোর সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন বাড়ানো। তদোপরি পাকিস্তানের নিঃশেষিত প্রায় সস্তা জ্বালানির উৎস সুইগ্যাসের বিপরীত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির উৎস খোঁজা। একারণেও পাকিস্তান মধ্যএশিয়ার তুর্কমেনিস্তানকে বেছে নেয়। তুর্কমেনিস্তানের মধ্যদিয়ে ইসলামাবাদ মধ্যএশিয়ায় তার প্রভাব বিস্তারের পথ খোঁজে।

পাকিস্তানের সাথে মধ্যএশিয়ার যোগাযোগ রাজনৈতিক, কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তার চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক কারণে। একই কারণে কাবুলে পাকিস্তানের প্রভাবও প্রয়োজন হয়ে পড়ে সর্বাগ্রে। গৃহযুদ্ধের মধ্যদিয়ে ইসলামাবাদ সমর্থিত হিকমতইয়ারের ব্যর্থতা এবং তার উপর পশ্চিমা বিশ্ব তথা মার্কিনীদের অবিশ্বাস সব মিলিয়েই পাকিস্তানকে আফগানিস্তানে বিকল্প শক্তির খোঁজ করতে হয়।[২]

উপরের কারণেই বেনজিরকে আফগানিস্তানে আইএসআই এর কর্তব্যরত কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। আফগানিস্তানে আইএসআই এর সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় বেনজিরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক্তন জেনারেল মোহাম্মদ নাসিরুল্লাহ খান বাবরকে। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন সনামধন্য পশতুন সদস্য। তিনি আইএসআই এর সহায়তায় মধ্যএশিয়ায় স্থলপথে বাণিজ্যের রাস্তায় নিরাপত্তা প্রদানকল্পে ক্ষেত্রীয় যুদ্ধবাজ নেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এর মধ্য পশ্চিমে হেরাতে ইসমাইল খান আর উত্তর পশ্চিমে আব্দুর রশিদ দোস্তামের সাথে সমঝোতা করলেও কান্দাহার এলাকার পশতুন গোষ্ঠিগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এ অঞ্চলে সুবিধা করেতে পারে নি। কান্দাহার অঞ্চলে হিকমতইয়ারের বিরুদ্ধাচারণকারী যুদ্ধবাজ নেতারা ইসলামাবাদের

২। লেখকের পুস্তক 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা ঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হেকমতইয়ারের পক্ষ নেয়াকে শুরু থেকেই পছন্দ করেন নি। পাকিস্তানের তখন প্রয়োজন চমন-কান্দাহার- হেরাত-মাজার-ই-শরিফ-আসগাবাদ রাস্তার নিরাপত্তা।

সমস্ত আক্রমণ শেষ করে ১৯৯৪ সনের অক্টোবরে প্রথমবারের মত পাকিস্তানি পণ্য নিয়ে বিশাল ট্রাকবহর মধ্যএশিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে আফগান সীমান্ত শহর বোলদাকের নিকট স্থানীয় যুদ্ধবাজ নেতাদের হাতে আটকা পড়ে। ঐ সময়ে নাসিরুল্লাহ বাবর আইএসআই এর কর্মকর্তা কর্নেল সুলতান ইমামের (ছদ্মনাম) শরণাপন্ন হলে কান্দাহার প্রদেশের মোল্লা ওমর এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের সমন্বয়ে গঠিত দল তালেবানদের সাহায্য নেয়ার অনুমতি চাইলে বাবর সম্মতি প্রদান করেন।[৩] এর পরবর্তী ইতিহাস তালেবানদের উত্থানের অবিস্মরণীয় ইতিহাস। ইমামের সাহায্যে মোল্লা ওমরের দল পাকিস্তানের ট্রাকবহরকে ৫ নভেম্বর ১৯৯৪ সনে উদ্ধারের মধ্যদিয়ে তালেবানদের উত্থানের সূচনা হয়। ঐ দিনের মধ্যে তালেবানরা কান্দাহার দখল শেষ করে। এর জন্য প্রায় কয়েক হাজার পশতুন ভাষাভাষী পাকিস্তানি আধাসামরিক বাহিনী সদস্য নিয়োজিত করা হয় বলেও শোনা যায় তবে একথা ইমাম অস্বীকার করেছেন।[৪]

তালেবান বলে পরিচিত এ দলের অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান সীমান্তের অপর পারের পশতুন যুবকদের আকর্ষিত করলে প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত ছাত্র যোগ দিলে তালেবানরা উত্তর পশ্চিমে এদের কর্তৃত্বকে আরও প্রসারিত করে। আর এটাই হচ্ছে তালেবানদের উত্থানের স্বীকৃত ইতিহাস।

তালেবানদের উত্থানে বিরদাসের জন্য আরও এক নতুন শক্তির উদয় যাদের সম্মতি ও সহায়তার জন্য পাকিস্তানের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। অবশ্য পরে মি. কার্লোস বুলঘোরেনী সরাসরি বিরদাসের সাথে এ পাইপলাইন প্রকল্প নিয়ে সমঝোতা করে। তালেবান কর্তৃক কান্দাহার দখল এবং দ্রুত উত্থান সমগ্র মধ্যএশিয় পরিস্থিতি বদল হতে থাকে প্রতিদিন। এরই মধ্যে মি. বুলঘোরেনী উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তার ট্রান্স–আফগান পাইপলাইন অথবা TAP বলে অধিক পরিচিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করবার প্রস্তাব দিলে নিয়াজভ তাতে রাজি হন। এ একই ব্যাপারে ইসলামাবাদে বেনজির ভুট্টোকে রাজি করাবার জন্য বিরদাসের এ কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর ব্যবসায়ী এবং পিপিপি এর একজন শক্তিধর নেতা আসিফ আলী জারদারীর মুখাপেক্ষি

৩। কর্নেল সুলতান ইমামের সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার ২০০২ সনে।
৪। Ibid

www.pathagar.com

হন। পরে অবশ্য জানা যায় যে, আসিফ আলী জারদারীর জোর যুক্তিতর্ক আর তদবিরের কারণেই বিরদাস এ প্রকল্পে পাকিস্তানের যোগ দেয়া নিশ্চিত করেছিলেন। এখানেও জারদারীর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে অর্থ উৎকোচ গ্রহণেরও অভিযোগ উঠে। এ প্রকল্পের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের চেয়ে আসিফ আলী জারদারীই বেশি উৎসাহিত ছিলেন। ইসলামাবাদের অভিজাত এলাকায় জারদারীর ছোট অফিসের দেয়াল জুড়ে বিরদাস প্রদত্ত মধ্যএশিয়ার বিশাল মানচিত্রের উপরে এ পাইপলাইনের কল্পিত রাস্তাও অঙ্কিত ছিল।

এ প্রকল্পের অধীনে তুর্কমেন গ্যাস রপ্তানি ছাড়াও পাকিস্তানের চাহিদা পূরণের জন্যও অধিক প্রয়োজন। পঞ্চাশের দশকে আবিষ্কৃত বেলুচিস্তানের গ্যাস ক্ষেত্র সুই ফিল্ডের গ্যাস মজুদ নিঃশেষিত প্রায়। অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো থেকেও প্রাপ্ত গ্যাস প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে বিদ্যুত উৎপাদন, তেলের চাহিদা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যের অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানের শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞদের মতে ২০০৫–৬ সনের মধ্যে সে দেশের চাহিদা আর আভ্যন্তরীণ গ্যাস মজুদের মধ্যে প্রায় দিনপ্রতি আনুমানিক ৫০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিটের ঘাটতি থাকবে। এ ঘাটতি বর্তমানে প্রকল্পাধীন উত্তোলনের পরেও পাকিস্তানকে আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য পূরণ করতে হবে। বর্তমান ইসলামাবাদের নিত্য প্রয়োজন দিনপ্রতি ২৪৬৩ মিলিয়ন কিউবিক ফিট অথচ সরবরাহ রয়েছে মাত্র দিনপ্রতি ২২১১ মিলিয়ন কিউবিক ফিট এবং বর্তমান ঘাটতি দিনপ্রতি ২৫২ মিলিয়ন কিউবিক ফিট যা অন্যান্য জ্বালানি দ্বারা মিটানো হচ্ছে। অন্যান্য জ্বালানি উচ্চমূল্যে আমদানির কারণে পাকিস্তানের অর্থনীতি বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার উপর প্রচন্ড চাপ পড়ছে।

পাকিস্তান সরকারের সূত্রমতে ২০০৭–৮ সনের মধ্যে চাহিদা দিনপ্রতি ১ হতে ১.৫ বিলিয়ন কিউবিক ফিটে গিয়ে দাঁড়াবে। এসব চাহিদা পূরণের জন্য পাকিস্তান কাতার এবং ইরানের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং এখনও আলোচনার পর্যায়েই রয়েছে। তবে এর মধ্যে তুর্কমেনিস্তানের চুক্তিই পাকিস্তানের জন্য লাভজনক হবে। এর কারণ এ পাইপলাইনের আওতায় পাকিস্তানের সরবরাহকৃত ১০০০ কিউবিক মিটার গ্যাসের দাম ধার্য করা হয়েছে ৪২–৪৫ মার্কিন ডলার আর অন্যদিকে পাইপলাইনের রয়ালিটি বাবদ পাকিস্তান ফি বছর

www.pathagar.com

পাবে ১৫০–২০০ মিলিয়ন ডলার। এর উপরে রয়েছে গোয়াদরের এন এল জি প্লান্টে তরলিকৃত গ্যাস দূরপ্রাচ্যে রপ্তানির সুযোগ। কাজেই পাকিস্তানের নিকট বিরদাসের প্রকল্পটি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

কাজেই নিজস্ব তাগিদেই ১৬ই মার্চ ১৯৯৫ সনে ইসলামাবাদে পাকিস্তান আর তুর্কমেনিস্তানের সাথে এ ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এ চুক্তিতে কোথাও আফগানিস্তানের প্রতিনিধির উপস্থিতি ছিলনা। ঐ সময় তালেবানরা তাদের কর্তৃত্ব কাবুলে প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপে ব্যস্ত। তাছাড়া পাকিস্তান অত্যন্ত নিশ্চিত ছিল যে, সমগ্র আফগানিস্তানে তালেবানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের পক্ষে কাবুলকে প্রভাবিত করতে মোটেও বেগ পেতে হবে না। এ ধারণার উপর নির্ভর করেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আফগানিস্তানের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, বেনজির ভুট্টো আফগান নীতির বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আইএসআই এ'র উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

বিরদাস প্রাথমিক পর্যায়ে মাত্র ৮৭৫ মাইলের পাইপলাইনের পরিকল্পনা করে। এ পাইপলাইন কান্দাহার হয়ে বেলুচিস্তানের সুই নামক শহরে বিদ্যমান গ্রিডের সাহায্যে পাকিস্তানের চাহিদা মেটাবে এবং পরে মুলতান হয়ে গোয়াদরে এবং আরও পরে ভারতের সাথে যুক্ত করা হবে। এ পরিকল্পনা তালেবান সহ অন্যান্য যুদ্ধবাজ আফগান নেতাদের প্রবলভাবে উৎসাহিত করে। এ কারণেই বিরদাস একদিকে পাকিস্তান আফগানিস্তানে আইএসআই কর্মকর্তা কাবুলে বোরহানউদ্দিন রব্বানী, আহমেদ শাহ মাসুদ, মাজার–ই– শরিফে আব্দুর রশিদ দোস্তাম এবং হেরাতে ইসমাইল খানের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠকে এঁদের সম্মতিসহ সকল ধরনের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার আশ্বাস অর্জন করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সনে বুলঘোরেনী বেনজির ভুট্টো এবং নিয়াজভকে জানান যে, তাদের প্রকল্পের সাথে আফগান যুদ্ধবাজ নেতারা একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এর প্রেক্ষিতে বিরদাস কাবুলে রব্বানী সরকারের সাথে ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিতে পাইপলাইন তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আফগানিস্তানে বিতরণের কথা ছিল। আর এর বাবদ কাবুল সরকারের পাবার কথা ছিল প্রতিবছর শুধুমাত্র ট্রানজিট ফি হিসেবে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিরদাস এ অঞ্চলের এতবড় রাজনৈতিক সাফল্যের পর এ পাইপলাইনের পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ কোম্পানিগুলোর সাথে কনসোরসিয়াম বা অংশীদারিত্বের জন্য আলোচনা শুরু করল। এর মধ্যে

www.pathagar.com

কাস্পিয়ান অঞ্চল তথা বিশ্বের ৭৬টি দেশে, বাংলাদেশ সহ গ্যাস এবং তেলের বাজারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি ইউনোকলও ছিল।

ইউনোকল পৃথিবীর ২৬ তম বৃহত্তম এবং যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থতম বৃহত্তম কোম্পানি। অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এ কোম্পানি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তেল, গ্যাসের অনুসন্ধান থেকে সঞ্চালনের মত দায়িত্বে রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে ১৯৭৩ সন থেকে এবং পাকিস্তানে ১৯৭৬ সন থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আর তেলের সন্ধান এবং সঞ্চালনের সাথে জড়িত। ১৯৯৫ সনে প্রথমবারের মত ইউনোকলের সাথে তুর্কমেনদের প্রথম যোগাযোগ হয় যখন তুর্কমেনিস্তানের পেট্রোলিয়াম এবং জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি দল টেক্সাসের হিউস্টনে ইউনোকলের সদর দপ্তরে যায়। ঐ বৈঠকের পরেই আর্জেন্টিনার কোম্পানি বিরদাসের আমন্ত্রণে ইউনোকলের কর্মকর্তারা প্রথমবারের মত পূর্বতন সোসালিস্ট সোভিয়েত এর প্রজাতন্ত্র তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আসগাবাদ এবং পাকিস্তানের ইসলামাবাদ যুগপৎ সফর করেন। এ সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এ অঞ্চলে বিরদাসের পরিকল্পনার সরজমিনে যাচাই এবং সে সাথে দু'দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে এ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা। স্মরণযোগ্য যে, ইউনোকলের কর্মকর্তারা তুর্কমেনিস্তান আর পাকিস্তানের মাঝের দেশ আফগানিস্তান সফর করেন নি। আফগানিস্তানের পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ভাষ্যই তখন ইউনোকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল যেমনটা ছিল খোদ যুক্তরাষ্ট্রের নিকটেও।

ইউনোকলের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছিল তুর্কমেনিস্তানের রাষ্ট্রপতি 'তুর্কমেনবেশি' (তুর্কমেনদের পিতা) নামে পরিচিত রাষ্ট্রপতি নিয়াজভের উদ্যোগেই। এর পিছনের বহু কারণের মধ্য অন্যতম ছিল ইউনোকলের লগ্নির ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও লগ্নি আসার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ বহুদিন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ না থাকায় পিছিয়ে পড়া দেশের নেতা হিসেবে পশ্চিমা দেশের নজরে পড়বার, সে সাথে প্রচুর মার্কিন সাহায্যের আশায়। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের সাথে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনের। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রও তুর্কমেনিস্তানের এ আগমনকে স্বাগত জানায়। এর কারণ ছিল তুর্কমেনিস্তানের সাথে ইরানের হালে গড়ে উঠা অর্থনৈতিক নৈকট্য। যুক্তরাষ্ট্র কোনো ভাবেই চায় নি তুর্কমেনিস্তান ইরানের সাথে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলুক।

এসব কারণে আন্তর্জাতিক রীতিনীতিতে অজ্ঞ প্রাক্তন সোসালিস্ট সুপারমুরাত নিয়াজভ বিরদাসের সাথে ১৯৯৪ এর শেষের দিকে এক প্রকারের

www.pathagar.com

সংঘাতে চলে আসেন। প্রথমতঃ বিরদাসের উন্নতি কাইজার তেলক্ষেত্র থেকে উত্তরমুখি তেল রপ্তানি করতে বাধা দেয় এই বলে যে, সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের চুক্তিটি পুনরায় খতিয়ে দেখতে হবে। নিয়াজভের সরকারের মতে পূর্বে স্বীকৃত ৭৫ঃ২৫ ভাগের চুক্তিটি বিরদাস সরকারের অজ্ঞতার সুযোগে করেছে। চাপের মুখে পড়ে বিরদাস তার ৭৫ ভাগ শেয়ার সরকারের অনুকূলে কমিয়ে ৬৫ শতাংশে নামিয়ে নিয়ে আসে। শুধু এখানেই থেমে থাকে নি। বিরদাস কর্তৃক ইসলামাবাদের বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের পরপরই পূর্বতন ৫০ঃ৫০ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন চুক্তি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিলে বিরদাস তাতে অস্বীকৃতি জানায়। নিয়াজভ একদিকে তেল রপ্তানি এবং ইয়াসলার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের কাজ থেকে বিরদাসকে বিরত থাকতে বলেন কিন্তু বিরদাস আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত এ সমঝোতায় আর কোনো পরিবর্তনে কোনো আগ্রহই প্রকাশ না করে সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত রাখে। বিরদাসের কর্মকর্তারা ঠিকই বুঝতে পারেন যে, কনসোরসিয়াম না করতে পারলে তাদের একার পক্ষে সুপারমুরাতের মত একরোখা একনায়কের খামখেয়ালী থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া বিরদাস নেহায়েতই একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি কোম্পানি যার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মত আন্তর্জাতিক শক্তিধর কোনো সরকার নেই। আর্জেন্টিনার মত তৃতীয় বিশ্বের একটি সরকারের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রভাব খাটানোর চিন্তা করাও অবান্তর মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থনীতি অগ্রাধিকার থাকায় কর্পোরেট আমেরিকা নামে পরিচিত যেকোনো আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী কোম্পানিগুলো সরকারকে তাদের অনুকূলে রাখতে সর্বপ্রকার প্রয়াস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাশাসন এসব কোম্পানিগুলোর বিদেশে স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগে পিছপা অতীতে যেমন হয় নি, বর্তমানেও হচ্ছেনা এবং ভবিষ্যতেও হবেনা।

এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অক্টোবর ১৯৯৫ সনে নিয়াজভ নিউইয়র্কে জাতিসংঘে যোগদিতে আসেন। জাতিসংঘের বৈঠক শেষে তুর্কমেন রাষ্ট্রপতি বিরদাস এবং ইউনোকলের সাথে যুগপৎ বৈঠক করেন এবং ২১ অক্টোবর ১৯৯৫ ঐ বৈঠকেই বিরদাসের কর্মকর্তাদের হকচকিয়ে তাদের উপস্থিতিতে নিয়াজভ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শক্তিশালী ইউনোকল এবং এর প্রধান অন্যতম মধ্যপ্রাচ্যের শরিক সৌদি আরবের ডেল্টা ওয়েল কোম্পানির সাথে পৃথক আর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির মোদ্দা বিষয় ছিল তুর্কমেনিস্তান হতে আরও একটি

www.pathagar.com

পাইপলাইন আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানের বন্দর পর্যন্ত তৈরি করা। এ পাইপলাইনও তৈরি হবে মূলত বিরদাসের প্রকল্পের আদলে প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের জন্য। তবে এ চুক্তিতে পথিমধ্যে আফগানিস্তানেও সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বিরদাসের অনুরূপেই এ পাইপলাইনের দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর বাজার ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করবার পরিকল্পনাও রাখা হয়েছিল।[৫] হতভম্ব বিরদাসের জন্য এটি ছিল সর্বপ্রথম বৃহৎ ধাক্কা। এ ধাক্কা সামলানো বিরদাসের জন্য সম্ভব হয় নি। সেদিন ইউনোকলের ঐ স্বাক্ষর সমারোহে উপস্থিত ছিলেন সাময়িক বিশ্বে কূটনীতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ এককালের সবচেয়ে চর্চিত সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরী কিসিঞ্জার। তিনি ইউনোকল উপদেষ্টার মধ্যে অন্যতম প্রধান। বিরদাস তখনও উপলব্ধি করতে পারে নি যে, তারা যে পথের সূচনা করেছিল তাতে বিরদাস চুনোপুঁটি মাত্র। ইউনোকল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রের হয়ে বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর 'গ্রেটগেম' এর সূচনা করল মাত্র।[৬] এখানে শুধুমাত্র অর্থনীতিই জড়িত নয়, জড়িত রয়েছে একক বিশ্বকে নিজের প্রভাবের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনের। সেদিন থেকে মাত্র ছয় বছরের মাথায় বিশ্ব পরিস্থিতি বদলাবে মধ্যএশিয়ার এক রাষ্ট্র আফগানিস্তানের বদৌলতে। বিরদাস তখন হয়ে থাকবে ইতিহাস মাত্র।

৫। Ahmed Rashid: "Taliban Islam Oil and the Great Game in Central Asia" দ্রষ্টব্য।
৬। Ibid

www.pathagar.com

পাঁচ

বিরদাস আর ইউনোকলের টানাপড়েনে মধ্যএশিয়া

ইউনোকলের হঠাৎ করে সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষিতে আগমন বিরদাসকে বিস্মিত করলেও তারা হাল ছাড়ে নি। আর্জেন্টিনার এ কোম্পানির কর্মকর্তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরিছিলেন যে, ইউনোকলের স্বার্থ রক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এগিয়ে আসবেই এবং এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের জন্য কাজ করবে। তবে এতদিনে বিরদাস বুঝতে পেরিছিল যে, সমগ্র মধ্যএশিয়ার পরিস্থিতি সরাসরি আফগান পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল এবং কাবুলের সাথে ৩০ বছরের চুক্তিই তার রক্ষাকবচ হবে। তবে তালেবানরা যে আফগানিস্তানে নতুন শক্তি হয়ে উদয় হবে তাতে বিরদাসের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। এ কারণেই হঠাৎ করেই বিরদাসের কাছে তালেবানরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। কার্লোস বুলঘোরেনী ক্রমেই তালেবানদের দারস্থ হতে শুরু করলেন। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখলেন।

ইউনোকল যে প্রস্তাব নিয়ে কাজ শুরু করেছিল তা বিরদাসের অনুরূপ হলেও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ছত্রছায়ায় দ্রুতগতিতে তাদের পকিল্পনা নিয়ে এগুতে থাকলে বিরদাস অনেক পিছনে পড়ে যায়। ইউনোকল সরাসরি তুর্কমেনিস্তানের দৌলতাবাদে প্রায় ২৫ tcf মজুদ গ্যাস ফিল্ড থেকে পাকিস্তানের মুলতানের জাতীয় গ্যাস গ্রিডে আনবার পরিকল্পনা হাতে নেয়। এর মানে দাঁড়াল আরও একটি সমান্তরাল গ্যাস পাইপলাইন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সনেই সেন্ট গ্যাস (centgas) নামের কনসোরসিয়াম দাঁড় করায়। সম্পূর্ণ প্রকল্পের ৭০ শতাংশ সেন্টগ্যাস নিজের হাতে রেখে সৌদি আরবের 'ডেল্টানিমির' কে ১০ শতাংশ আর তুর্কমেন কোম্পানিকে দেয়া হলো ৫ শতাংশ। এর মধ্যেই ইউনোকল আরও একটি উচ্চাভিলাষি চুক্তি তুর্কমেনিস্তানের সাথে সম্পন্ন করল।

www.pathagar.com

এ প্রকল্পের নামকরণ করা হলো 'সেন্ট্রাল এশিয়ান অয়েল পাইপলাইন প্রজেক্ট' (CAOPP)। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০৫০ মাইল দীর্ঘ পাইপলাইন দ্বারা তুর্কমেনিস্তানে নতুন আবিষ্কৃত তেল ক্ষেত্র 'চারদজহু' (Chardzhou) হতে সরাসরি পাকিস্তানে নির্মাণাধীন তেল টার্মিনালে বহন করবে। সে সাথে প্রয়োজনে রাশিয়ার বর্তমানে ব্যবহৃত পাইপলাইনের মাধ্যমে সাইবেরিয়ার 'উমসাক', চাইমকেন্ট, কাজাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের বোখারা হতে উত্তোলিত তেলের পাইপলাইনকে প্রস্তাবিত পাইপলাইনের সাথে যুক্ত করে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পকে তৎকালীন ওয়াশিংটনের ক্লিনটন সরকারও সমর্থন দিয়েছিল।

এ সমর্থন যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ করেই দেয় নি বরং এটা ছিল নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই পরিবর্তিত বিশ্বের কূটকৌশলগত পরিবর্তনের আবর্তে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর হতেই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যএশিয় নীতিতে আমূল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর সহনশীল রাষ্ট্র কাজাকিস্তান আর কিরগিজিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রের লগ্নির অনুমোদন দেয়। এ দু'রাষ্ট্রের মধ্য কাজাকিস্তান সামরিক দিক থেকে বেশ শক্তিশালী। এদের হাতে প্রাক্তন সোভিয়েতদের রেখে যাওয়া পারমাণবিক অস্ত্র ছিল যা ১৯৯৩ সনে রাশিয়াকে হস্তান্তর করা হয়। এ কারণেই কাজাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নূর সুলতান নজরবায়েফের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দহরম মহরম বাড়ে। এতকিছুর পরেও ১৯৯৫ এর শেষের দিকে নজরবায়েফের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাধে। নজরবায়েফের সরকাকে দুর্নীতিগ্রস্থ নীতিহীন সরকার আখ্যায়িত করে বিরোধ দানা বাধতে থাকে। কাজাকিস্তানে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ জনগোষ্ঠি রাশিয়ার বংশোদ্ভূত।

আমরা ফিরে আসি ইউনোকল প্রসঙ্গে। মধ্যএশিয়ায় ইউনোকলের আগমন ও বড় ধরনের লগ্নির আশ্বাস দিলে বড় ধরনের সংঘাতেরও হাতছানি দেয়। আফগান পাইপলাইন প্রকল্পের পূর্বেই ইউনোকল কাস্পিয়ান সাগরতটের তেল এবং গ্যাস ক্ষেত্রগুলোতে প্রায় ৯.৫ ভাগ শেয়ার ক্রয় করে। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে আজারি, চিরাগ আর গানেসিল এর মত আজারবাইজানের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো। ১৯৯৫ সনেই ঐসব ক্ষেত্র থেকে ইউনোকলের প্রাপ্ত আয় দাঁড়ায় আনুমানিক ৮.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসব স্থানে শুধু গ্যাস ক্ষেত্রেই নয় ইউনোকল উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণের ক্ষেত্রেও বিরাজমান। আজারবাইজানের তেল শোধনাগারও প্রস্তুত করা হয় ইউরোপীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের মানে।

www.pathagar.com

মধ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমেই বিরদাস আর ইউনোকলের সম্পর্ক দ্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ১৯৯৬ সনের জুলাই মাসে তালেবানদের হাতে কাবুলের পতনের প্রাক্কালে বিরদাস তার কার্যক্ষেত্রে ইউনোকলের অযথা হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে তাদের প্রকল্পকে নস্যাৎ করার অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টনে ইউনোকলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এ মামলায় বিরদাস ইউনোকলের কাছে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এ দাবি ছিল বিরদাসের মধ্যএশিয়া গ্যাস এবং তেল ক্ষেত্রে শেয়ারের সম্ভাব্য লগ্নির সমপরিমাণ। এ অভিযোগে বিরদাস আদালতকে জানায় যে, ১৯৯৫ সনে TAP এর প্রকল্পে ইউনোকলের সহযোগিতা চেয়ে দাখিল করা দলিলাদির ভিত্তিতেই ইউনোকল সাড়া না দিলে বিরদাস এককভাবে তুর্কমেনিস্তানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয় এবং পরবর্তীতে বিরদাসের পরিকল্পনা ধরেই ইউনোকল তাদের পরিকল্পনা রচনা করে। এতদিনে বিরদাস কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে, এ মামলায় হয়তো তাদের খুব একটা সুবিধা হবার নয়। তাকে শেষবারের মত অন্য রাস্তায় চেষ্টা করতে হবে আর তা হবে তালেবান এবং পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টোর সহায়তায়।

হিউস্টনে মামলা দায়েরের দু'মাসের মাথায় রব্বানী সরকারকে পরাস্ত করে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সনে তালেবানরা কাবুল দখল করলে পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। সে সাথে মধ্যএশিয়ায় তালেবান নামক শক্তি 'গ্রেটগেম' এর আরেক পেশাদার উন্নীত হয়। পশতুন গোত্র ভিত্তিক সুন্নি মুসলমান, তালেবানরা সরাসরি পাকিস্তান সমর্থিত ছিল। এমনকি হাজার হাজার পাকিস্তানি তালেবানদের সমর্থনে কাবুল দখলের যুদ্ধে এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। বহু পাকিস্তানি প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা এদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন। কাবুল দখলের দিনই তালেবানরা এক অমানবিক কাজ করে বসল। আর তা ছিল কাবুলে জাতিসংঘের শরণে বিগত তিন বছর থেকে লুক্কায়িত শেষ সোসালিস্ট রাষ্ট্রপতি ডা. নাজিবুল্লাহ এবং তাঁর ভাইকে সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে বিনা বিচারে প্রকাশ্যে কাবুলের রাস্তায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয় এবং পরে এ লাশ চারদিনের মাথায় গলিত অবস্থায় নামিয়ে আনা হয়। তালেবানদের এ ধরনের অমানবিক এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি উপেক্ষা করবার প্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে প্রথমে পশ্চিমা বিশ্ব শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কাবুল দখলের পরপরই পাকিস্তান প্রথমে এবং পরে সৌদি আরব আর ইউএই (UAE

www.pathagar.com

United Arab Emirat) তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের স্বীকৃতির বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখে। পরবর্তীতে কাবুলসহ ৯০ ভাগ এলাকা দখল করলেও রব্বানীই স্বীকৃত রাষ্ট্রপতি থেকে যান।

তালেবানদের উত্থান আর উত্থানের পেছনে আমেরিকার সম্মতি ছিল একথা আজও স্পষ্ট নয় তবে বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদির প্রেক্ষিতে অন্তত এতটুকু প্রতীয়মান যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯১ সনের পর থেকেই আফগান পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। তালেবানদের উত্থান এবং পরবর্তী কোনো বিষয়ই যুক্তরাষ্ট্রকে শঙ্কিত করে নি ১৯৯৮ সন পর্যন্ত। ১৯৯৮ সনের পর থেকে ওসামা বিন লাদেনের যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী নাশকতামূলক কার্যকারিতা পশ্চিমা বিশ্বকে তালেবান বিরোধী করে তোলে।

যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি তালেবানদের উত্থানে সাহায্য না করলেও পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক তেল কোম্পানিগুলোর মধ্যএশিয়ায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় সরাসরি প্রভাব রেখেছে। এসব অর্থনৈতিক কারণে সে সময়েই মধ্যএশিয়ায় দুটি বলয়ের জন্ম নেয়। একটি যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক, যাতে ছিল পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে সৌদিআরব আর অন্যদিকে ছিল ইরান, রাশিয়া এবং দু'একটি মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্র বিশেষ করে উজবেকিস্তান। এসব দেশ প্রথম থেকেই তালেবান বিরোধে অবতীর্ণ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে নতুন ধরনের ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কেন্দ্রিক মধ্যএশিয়ার নীতির কারণে ঐ সময়ে ইউনোকলের যাবতীয় স্বার্থে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলো বিভিন্নভাবে ঐসব দেশের সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করতেও পিছপা হয় নি। ঐ সময়ে ইসলামাবাদ আর আসগাবাদ সরকারের উপরেও একই ধরনের চাপ প্রয়োগ হতে থাকে। স্মরণযোগ্য যে, তালেবানদের এক বিরাট দূতাবাস ইসলামাবাদে খোলা হয়েছিল। ঐ দূতাবাসই ছিল পশ্চিমের সাথে যোগাযোগের একমাত্র পথ। তালেবান শাসিত আফগানিস্তান আর মধ্যএশিয়ায় জ্বালানি সংক্রান্ত ব্যবসার যোগসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে ইসলামাবাদ।

ইউনোকলের মধ্যএশিয়ায় বিশেষ করে পরিকল্পিত আফগানিস্তান হয়ে দক্ষিণমুখি পাইপলাইনের প্রকল্পের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। এ প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অবতারণা হয়। ১৯৯৬ সনের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত

www.pathagar.com

সিমনস্ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর অফিসে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারের সময়ে বিরদাসের সাথে পূর্বতন চুক্তির বিপরীতে ইউনোকলকে এককভাবে পাইপলাইন প্রস্তুত করবার অধিকার দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পীড়াপীড়ি করলে পাক প্রধানমন্ত্রী বিব্রত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে বেনজির সরকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের নিকট লিখিত অনুসূচনামূলক পত্র দাবি করে। এর পর থেকেই বেনজির সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক টানাপড়েন শুরু হয়। বেনজির সরকার বিরদাসের সাথে গৃহীত পূর্বতন চুক্তি বাতিল করে নি। অন্যদিকে কাবুলে তালেবান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে ইউনোকল প্রথমে প্রকাশ্যে স্বাগত জানালেও পরে তা অস্বীকার করে।

কাবুলে পটপরিবর্তনের পরপরই ইউনোকল তৎপর হয়ে উঠে। এ প্রকল্পের অন্যতম শরিক সৌদি আরবের কোম্পানি ডেল্টা নিমির কে তালেবান সরকারের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ডেলটা নিমির একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি হলেও এর সাথে রাজকীয় পরিবারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। ডেলটা নিমিরের অন্যতম শেয়ারহোল্ডার হলেন সৌদি সরকারের এবং রাজকীয় পরিবারের প্রভাবশালী অনেক সদস্য। তালেবানদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ইউনোকল আফগান বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এককালের জাতিসংঘের আফগান প্রতিনিধি মেহমুদ মিস্ত্রির উপদেষ্টা চালর্স সন্তোজকে নিয়োগ করে। তিনি বহু বছর আফগান সমস্যার সাথে জড়িত থাকার কারণে ঐ সময়কার সকল আফগান নেতা এবং তালেবানদের অনেকের সাথেও সুপরিচিত ছিলেন। একই সাথে ইউনোকল পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ওকলেকেও আফগান বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করে। তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী জেহাদের সূচনালগ্ন থেকে পরবর্তী অনেক বছর যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান এবং সিআইএ-আইএসআই এর মধ্য সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন। এ জন্যই পাকিস্তানের সরকার আইএসআই এবং আফগান নেতাদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট স্বজনে পরিণত হয়েছিল।

তালেবানদের কাবুলে প্রবেশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইউনোকলের সর্ব প্রস্তুতি বিরদাসকে অত্যন্ত বিহ্বল করে তোলে। একদিকে এ কোম্পানির তুর্কমেনিস্তানের সাথে বিবাদে সকল কার্যক্রম বন্ধ হবার পর আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্সে তুর্কমেনিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ অন্যদিকে তুর্কমেনিস্তানে সকল কার্যক্রম স্থগিত। বিরদাসের সাথে গ্যাস উত্তোলন

www.pathagar.com

ছাড়া পাইপলাইনের মাধ্যমে দক্ষিণে সঞ্চালনের যেমন চুক্তি হয় নি তেমনি তখনও পাকিস্তানে রপ্তানিরও চুক্তি চূড়ান্ত হয় নি। এর মধ্যে পাকিস্তানেও সরকার পরিবর্তন হয়।

নভেম্বর ১৯৯৬ সনে বেনজির ভুট্টোর সরকারকে দুর্নীতির দায়ে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাচ্যুত করেন। ১৯৯৭ সনের প্রথমদিকেই নির্বাচনের মাধ্যমে মিয়া মোহাম্মদ নওয়াজ শরিফের দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। এর পর থেকে ইউনোকল পাকিস্তানের অপ্রচ্ছন্ন সহযোগিতা পেতে থাকে। সে সাথে ইউনোকল ও পাকিস্তানের মাধ্যমেই তালেবানদের সাথে ঘনিষ্ট হবার প্রয়াস চালিয়ে যায়। এতসব চাপের মধ্যেও বিরদাস আসগাবাদ আর কাবুলে তাদের অফিস চালিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তুর্কমেনিস্তান বিরদাসকে TAP এর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে সকল প্রকারের কূটকৌশল অবলম্বন করে।

এসব অসুবিধার মধ্যে পড়েও বিরদাস একেবারেই দমে যায় নি। শুরু থেকেই তালেবানদের সাথে বিরদাসের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিরদাস তালেবানদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে, যত অন্তরায়ই থাকুক না কেন বিরদাসের প্রকল্পিত TAP এর জন্য আন্তর্জাতিক ঋণের প্রয়োজন হবেনা। আন্তর্জাতিক ঋণ ঐসব দেশেই দেয়া হয় যে দেশের সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। যেহেতু তালেবান সরকারকে তিনটি দেশ ছাড়া আর কোনো দেশ স্বীকৃতি দেয় নি সে কারণেই আফগানিস্তানের কোনো প্রকল্পেই আন্তর্জাতিক ঋণ পাওয়া যাবেনা। বিরদাস তালেবানদের জানায় যে, এ পাইপলাইনের ৫০ঃ৫০ শেয়ার সৌদি আরবের নিনগারচো নামক কোম্পানির এবং এ কোম্পানির যার একজন পৃষ্ঠপোষক সৌদি যুবরাজ তুর্কী বিন ফয়সল। সে ক্ষেত্রে পাইপলাইনের আফগানিস্তান অংশের অর্থ সৌদিরাই যোগান দেবে। যুবরাজ তুর্কী তখন সৌদি আরবে শক্তিশালী জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এবং তালেবানদের সুহৃদ হিতৈসী। তবে পাকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান অংশের জন্য কনসোরসিয়াম তৈরি করতে অসুবিধা হবেনা। বিরদাস তালেবানদের জানায়, তাদের অনুমতি পেলেই কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই পাইপলাইন তৈরির কাজ শুরু করতে পারে। তালেবানরাও এতদিনে পাইপলাইনের কূটনীতির কিছুটা স্বাদ পেয়েছিল, কাজেই হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অপারগতা দেখিয়ে বিরদাসকে ঝুলিয়ে দিল। তালেবানদেরও লক্ষ্য এখন পশ্চিমা বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সূচনা করতে পারে সে স্বীকৃতি। তালেবানদের এ ধরনের মনোভাবের কারণ ছিল

www.pathagar.com

তাদের সাথে একই পরিকল্পনা নিয়ে ইউনোকলের ঘনঘন বৈঠক। এসব বৈঠকের কোনো এক পর্যায়ে ইউনোকলের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টি মিলরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেই ফেললেন, তালেবানরা আমাদের পরিকল্পনায় অতি উৎসাহী এবং সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।[১] ইউনোকল তালেবানদের সাফল্যকে একটি সঠিক পথ বলে বক্তব্য দিয়েছিল।[২] অন্যদিকে আমেরিকার সরকারও তালেবানদের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়াবার চিন্তাভাবনা করছিল কিন্তু সরিয়া আইন জারি, মহিলাদের অধিকার ক্ষুন্ন করণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠাতে ক্লিনটন সরকার ক্রমেই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি স্বীকৃতি না আসা পর্যন্ত ইউনোকলের পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ শুরু করতে অসুবিধা হলেও কান্দাহারে একটি বড় অফিস খুলে বসে। কান্দাহার তখন তালেবানদের আধ্যাত্মিক সদর এবং 'আমিরুল মোমেনিন' বলে পরিচিত মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের কর্মকেন্দ্র। ইউনোকল অফিসের সাথে একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্রও খোলে। সে সাথে তালেবানদের একটি দলকে টেক্সাসের সুগারল্যান্ডে তাদের সদরদপ্তর ভ্রমণের নিমন্ত্রণও জানায়।[৩]

এহেন পরিস্থিতিতে দুই বিবাদমান কোম্পানিই যেসব আঞ্চলিক দেশের তালেবানদের উপর প্রভাব রয়েছে তাদের সাথেই আলোচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে প্রধান হলো সৌদি আরব আর পাকিস্তান। এরই মধ্য পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টোর সরকার বরখাস্ত হবার পর থেকে পরবর্তী সরকার ইউনোকল তথা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশি। পাকিস্তান তালেবানদের বুঝাতে চেষ্টা করে যে, কাবুলের উপর কর্তৃত্ব দৃঢ় করতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। অতি অল্প সময়ে তালেবানরা যে সমগ্র আফগানিস্তান দখল করতে পারে এ ধরনের আইএসআই কর্তৃক প্রদেয় বিশদ ব্যাখ্যা ইউনোকল এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই গ্রহণ করেছিল কিন্তু কার্যত তা হয় নি। তালেবানরা ২০০১ সনে তাদের উৎখাতের সময় পর্যন্ত আফগানিস্তানের উত্তর ভাগ দখল করতে পারে নি আর বোরহান উদ্দীন রব্বানীই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রপতি রয়ে গিয়েছিলেন। অনেক ভাষ্যকারের মতে, পাকিস্তানের পটপরিবর্তনের পেছনেও বিরদাস আর ইউনোকলের টানাপড়েন কাজ করেছিল।

১। Economist Intelligence Unit 4/1996.

২। Reutero, 1 October1996.

৩। Transetions. 1 October 1998.

www.pathagar.com

নওয়াজ শরিফও বেনজির ভুট্টোর মত দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মন্দার কারণ এবং জ্বালানির অপ্রতুলতা সবই তাঁর জানা ছিল তাই তার প্রয়োজন ছিল যত শীঘ্র এ প্রস্তাবিত পাইপলাইন প্রকল্পকে অগ্রসর করে নেয়া যায়।

পাকিস্তানের দৃশ্যপট থেকে বেনজিরের বিদায়ের সময়েই আসগাবাদে যুক্তরাষ্ট্র আর ইউনোকলের চাপে তুর্কমেনিস্তানের উচ্চাভিলাষি রাষ্ট্রপতি বিরদাসের পাইপলাইনের সমান্তরালে সেন্টগ্যাস কনসোরসিয়ামের সাথে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব নাজিমুদ্দিন শেখ কান্দাহার সফর করে মোল্লা ওমরের সাথে উভয় পাইপলাইনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষ হলেও তালেবানরা তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখে। তালেবানদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুর্কমেনিস্তান, পাকিস্তান আর আফগানিস্তানকে পাশ কাটিয়েই তাদের প্রকল্প এক প্রকার পাকাপাকি করে ফেলে। তালেবানদের সাথে পাকিস্তানের আচরণ অনেকটা তাবেদার রাষ্ট্রের মত হতে থাকলে ক্রমেই কান্দাহারের সাথে ইসলামাবাদের সম্পর্কে শীতলভাব পরিলক্ষিত হয়।

তুর্কমেনিস্তানের এ আকস্মিক চুক্তি বিরদাসকে ইউনোকলের বিরুদ্ধে মামলায় বেশ বেকায়দায় ফেলে। একদিকে যেমন বিরদাস চাপের মুখে পড়তে থাকে ঠিক তেমনি অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারও চাপের সম্মুখিন হয়।

পরিস্থিতি আরও একবার ঘোলাটে হয় যখন তুর্কমেনিস্তানের রাষ্ট্রপতি আধুনিকীকরণের নামে রাজধানী আসগাবাদকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়বার এক ব্যয়বহুল পরিকল্পনার জন্য দ্রুত অর্থ যোগাড়ে নেমে পড়েন। এ অর্থ যোগানের একমাত্র উপায় ছিল অতি অল্প সময়ে গ্যাস রপ্তানি। আর এ কারণেই ডিসেম্বর ২৯, ১৯৯৬ সনে হঠাৎ করেই ইরানের মধ্য দিয়ে তুরস্ক পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের চুক্তি করে বসেন। এ চুক্তি সম্পূর্ণভাবে ইরানের নিজস্ব লগ্নির মাধ্যমে দৌলতাবাদ–ইরানের মধ্যে অতি স্বল্প দূরত্বের পাইপলাইনের ব্যবহারে গ্যাস রপ্তানি করার চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়। এ চুক্তি ইউনোকলকে হকচকিত করে তোলে। একইভাবে তুর্কমেনিস্তানের সম্ভাব্য ইরানমুখি হওয়াকে রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে সহজভাবে নিতে পারে নি। নিয়াজভ ইরানের সাথে তাঁর এ ঘনিষ্টতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরূপভাবের আঁচ করতে শুরু করেন।

www.pathagar.com

জানুয়ারি ১৯৯৭ সনের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স বিরদাসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তুর্কমেনিস্তানের কাইমার তেলক্ষেত্র থেকে বিরদাসের রপ্তানি বন্ধ করাকে বে-আইনি বলে ঘোষণা দিলেও নিয়াজভ এ রায়কে প্রত্যাখান করেন।

এ দু'কোম্পানির বিবাদে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হতে থাকে। তালেবান ছাড়াও ক্ষেত্রিয় যুদ্ধবাজ নেতারাও তেল–গ্যাসের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তালেবানরা আন্তর্জাতিক জটিল বিষয়াদি তেমন না বুঝলেও তেল গ্যাসের এ কূটনীতিকে ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করে ফেলেছিলেন। তালেবান নেতৃবৃন্দ নিজেরাও এ খেলায় পাকা খেলোয়াড়ের মত উভয় পক্ষকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সনের প্রথমদিকেই বিরদাস আর ইউনোকলের আমন্ত্রণে তালেবানদের দুটি পৃথক দল ইসলামাবাদ হয়ে একদল আর্জেটিনার বুয়েন্স আয়ার্স অন্যটি যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে উপস্থিত হয়।

প্রথম দলটি একচোখ কানা মোল্লা ওমরের অতি বিশ্বস্ত বলে পরিচিত তৎকালীন তালেবান পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোল্লা গউসের নেতৃত্বে ইউনোকল সদর যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে উপস্থিত হলে তাদেরকে রাজকীয় সম্মানে সম্ভাষণ জানানো হয়। হিউস্টনে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ব্যবসায়ের কেউকেটাদের ছাড়াও টেক্সাস রাজ্যের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথেও আলাপ-আলোচনা হয়। এ সমস্ত আলোচনাতে যুক্তরাষ্ট্র কতৃর্ক তালেবানদের স্বীকৃতির ব্যাপারটিও অত্যন্ত গুরত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়। এ দলটি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি খরচেই রাজধানী ওয়াশিংটনও সফর করে।

অন্য আরেকটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন দল বুয়েন্স আয়ার্সে সফর করে। দু দলই সফর শেষে পবিত্র মক্কা নগরীতে ওমরা শেষে সৌদি আরবের রাজকীয় প্রভাবশালী সদস্য যুবরাজ তুর্কী বিন আব্দুল আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সফরের বিবরণ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য সৌদি আরবের সুপারিশের অনুরোধ জানায়। এ দু'দলই ঐ সফরের পর পাইপলাইনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের উপরে ছেড়ে দেয়।

মিয়া মোহাম্মদ নওয়াজ শরিফ ১৯৯৭ সনের অক্টোবরে একদিনের জন্য আসগাবাদ সফর করে পুনরায় পাইপলাইনের অগ্রগতির ব্যাপারে আলোচনা করেন। এবারও নওয়াজ শরিফ তালেবানদের মতামতকে খুব একটা তোয়াক্কা না করে তুর্কমেনিস্তানের সাথে ইউনোকলকে নিয়ে গ্যাস রপ্তানির মূল্য নির্ধারণ

www.pathagar.com

করেন। তালেবানদের জন্য প্রতি ১০০০ কিউবিক ফিটের পরিবহন ফি হিসেবে ১৫ সেন্ট ধরা হয়। এ হিসেবে আফগানিস্তান বছরে ১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাবার কথা ছিল। তুর্কমেনিস্তানের জন্য ১ ডলার আর ইউনোকল ৬৫–৮৫ সেন্ট পরিবহনের জন্য ধার্য করা হয়েছিল। পরে তালেবানদের নিকট এ প্রস্তাব উপস্থাপন করলে মোল্লা ওমর এ অর্থ যথেষ্ট নয় বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তালেবান ছাড়াও ইউনোকলকে বেসরকারিভাবে প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে পাশে রাখতে খরচের ব্যাপারটিও তাদের ফিস এর মধ্য ধরেছিল। নওয়াজ শরিফ আর নিয়াজভের এ সিদ্ধান্ত তালেবানদের ক্ষুব্ধ করেছিল। অন্যদিকে ইউনোকলের বিভিন্ন যুদ্ধবাজ নেতাদের সাথে যোগাযোগকেও কাবুল ভালোভাবে নেয় নি। তালেবানরা ট্রানজিট ফি হিসেবে অর্থের পরিমাণ বাড়াবার এবং সে সাথে কোম্পানি কর্তৃক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াবার পরিকল্পনায় অর্থলগ্নির প্রস্তাবও দিয়েছিল ঐ সময়ের কাবুল সরকার।

এতসব চাপের প্রেক্ষিতে বিরদাস ক্রমেই পিছপা হতে থাকলো। অন্যদিকে সুদান হতে বিতাড়িত হয়ে আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের উপস্থিতি এবং তালেবানদের সাথে সম্পৃক্ততাই এসবই পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে করে তুললো যে, আফগানিস্তানে নিযুক্ত তৎকালীন মানবিক সাহায্য সমন্বয়কারী প্রতিনিধির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আন্ডার সেক্রেটারি ইয়াসুসি আকাশি যুদ্ধবাজ নেতাদের এবং তেল কোম্পানিগুলোর বিভিন্নমুখি তৎপরতায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৯৯৮ সনের গ্রীষ্ম মৌসুমে আফগানিস্তানে তালেবান আর বিরোধী উত্তর জোটের সাথে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলে দু'টো প্রকল্পই সংকটের মধ্যে পড়ে। ঐ বছরের মার্চ মাসে ইউনোকলের কর্মকর্তা মার্টি মিলার আসগাবাদে ঘোষণা দেন যে, বর্তমান আফগান পরিস্থিতিতে পাইপলাইন প্রকল্প সময়মত সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আফগান পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থলগ্নি দিতে রাজি হবে না। এসব কারণে ইউনোকল প্রকল্পের মেয়াদ আরও বৃদ্ধির জন্য নিয়াজভকে চাপ দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাঁর অসন্তুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। মধ্যএশিয়ার এ একনায়ক প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের 'থিম পার্ক প্রজেক্ট' আসগাবাদ বিমান বন্দরকে হিথরু বিমান বন্দরের আদলে তৈরি করণ, বিভিন্ন স্থানে সোনার তৈরি নিজের প্রতিকৃতি স্থাপন ইত্যাদির পেছনে গ্যাস রপ্তানির অর্থপ্রাপ্তির আশায় আগাম খরচ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে শূন্যের কোঠায়

www.pathagar.com

নিয়ে যান। তদুপরি রাশিয়া সহ অন্যান্য প্রজাতন্ত্র গ্যাসের মূল্য বকেয়া রাখায় রপ্তানি প্রায় বন্ধ ছিল।

অপরদিকে ইউনোকলও স্বদেশে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে। এ কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের বার্ষিক সভায় তালেবানদের মত কট্টরবাদী, যাদের বিরুদ্ধে নারী বিদ্বেষী এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত অভিযোগ রয়েছে তাদের সাথে ব্যবসাকে অনৈতিক বলে বিবৃতি দেয়। ১৯৯৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রের নারীবাদী আন্দোলনে অগ্রে ছিলেন খোদ রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্টলেডি হিলারী ক্লিনটন। তিনি ইউনোকলকে সহযোগিতা না করবার জন্য সরকারকে চাপের মুখে রাখেন। ইউনোকল তখনও মার্কিন সরকারকে আফগানিস্তানে তালেবান কর্তৃক স্বীকৃতি দিয়ে অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোকে সমর্থন করবার জন্য অনেক স্বনামধন্য মার্কিন নাগরিকদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়।

ইউনোকলের জন্য একদিকে ১৯৯৮ সনটা খারাপ গেলেও অন্যদিকে বিরদাসের আনীত মামলা খারিজ হওয়াতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অক্টোবর ১৯৯৮ সনে টেক্সাসের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বিরদাসের আনীত ইউনোকলের বিরুদ্ধে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতিপূরণের মামলাটি খারিজ করে দেয়। আদালতের রায়ে বলা হয়, যেহেতু সমস্ত চুক্তিই টেক্সাসের আইনের আওতায় হয় নি, হয়েছে তুর্কমেনিস্তান এবং আফগানিস্তানের প্রচলিত আইনের আওতায়, কাজেই এ বিষয়ে কোনো রায় দিতে অপারগ। এ রায়ের সাথে সাথেই বিরদাসের শেষ আশাও তিরোহিত হয়।

১৯৯৮ সনের আগস্ট মাসে আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া এবং তানজানিয়ায় ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে হামলা এবং পরে আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মিসাইল হামলার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তালেবান এবং ওসামার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধের সূচনা করে। ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠে ওসামাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আটক করণ এবং সে সাথে তালেবানদের উচ্ছেদ। এতসবের মধ্যেও শেষ চেষ্টা হিসেবে ইউনোকল শেষবারের মত তাদের প্রকল্প নিয়ে মোল্লা ওমরের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি সরাসরি প্রস্তাব নাকচ করে দেন। সূত্রে প্রকাশ, এসব চুক্তির বিষয়ে ওসামা বিন লাদেনই ছিলেন মোল্লা ওমরের পরামর্শদাতা।[৪]

৪। লেখকের পুস্তক 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথাঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা' প্রকাশক-পালক পাবলিশার্স, ঢাকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ঐ বছরের শেষের দিকে ইউনোকল 'সেন্ট গ্যাস' কনসোরসিয়াম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। যে প্রকল্পের জন্য বিরদাসের মত অজ্ঞাত কোম্পানিকে সরানো থেকে শুরু করে প্রায় দু'বছর তালেবানদের সাথে দহরম মহরম করেছিল, সে প্রকল্প ওসামা বিন লাদেনের যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতা এবং তালেবানদের মত সংগঠনের জন্য বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারে নি। এর পেছনে ইউনোকলের কত অর্থ খরচ হয়েছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। ১৯৯৮ সনের শেষ দিকে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম নিম্নমুখি হওয়াতে ইউনোকলেরও প্রচুর ক্ষতিও হয়। এ কারণেই ইউনোকল তুরস্কের পরিকল্পিত পাইপলাইন বাতিল করে, পাকিস্তানের অফিস বন্ধ করে এবং তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও কাজাকিস্তানে লগ্নির ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনে। বস্তুতপক্ষে আফগানিস্তানের প্রকল্পে ইউনোকলের অর্থনৈতিক ক্ষতি হলেও দু'টি কাজ সম্পন্ন করে। প্রথমত: বিরদাসকে দৃশ্যপট থেকে বিদায় দেয়ার মাধ্যমে এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে অন্য কোনো কোম্পানির লগ্নিকে নিরুৎসাহিত করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত: আফগানিস্তানের সংকট গ্যাস পাইপলাইনের টানাপড়েন এতই জটিল করে তোলে যার পরিণতিতে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনের পরের ঘটনায় আজ আফগানিস্তানের দৃশ্যপট থেকে তালেবানরা বিতাড়িত, ওসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমর এখনও নিখোঁজ।[৫] বর্তমানে কাবুলে ইউনোকলের এককালিন উপদেষ্টা হামিদ কারজাই দু'বছরের জন্য অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান সে সাথে উপস্থিত রয়েছেন ইউনোকলের প্রাক্তন উপদেষ্টারা যার মধ্য ড. জালমেই খালেদজাদ অন্যতম। বর্তমানে আফগানিস্তানে উপস্থিত রয়েছে বহুজাতিক সিকিউরিটি ফোর্স আর দক্ষিণে অবস্থান করছে হাজার হাজার মার্কিন সেনা। তারা প্রতিনিয়তই সামরিক অভিযান চালাচ্ছে পলায়নপর তালেবান আর আল কায়দার সদস্যদের বিরুদ্ধে। প্রায় এক বছর হতে চলেছে এখনও যুক্তরাষ্ট্রের মতে তালেবান আর আল কায়দা সদস্যরা আফগানিস্তানকে অস্থিতিশীল করবার প্রয়াসে লিপ্ত। যুক্তরাষ্ট্র বলছে তাদের সেনা উপস্থিতি ততদিন থাকবে যতদিন এসব সন্ত্রাসীদের নির্মূল না করবে। অপরদিকে পাকিস্তানে অক্টোবর ১৯৯৯ সনের পর থেকে জেনারেল পারভেজ মোশারফ ক্ষমতায় রয়েছেন। মোশারফ সহায়তা করছেন যুক্তরাষ্ট্রকে। পাকিস্তানেও উপস্থিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী বিশেষ

৫। বিস্তারিত লেখকের পূর্বে উল্লেখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

করে বেলুচিস্তান আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখন মার্কিনীদের সহযোগী হয়ে তালেবান আর আল কায়দার পলায়নপর সদস্যদের সাথে বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষে লিপ্ত।

১৯৯৯ সনের এপ্রিল মাসে নওয়াজ শরিফ এক শেষ প্রচেষ্টা নেয় আফগান প্রকল্পকে ধরে রাখবার। ঐ মাসে ইসলামাবাদে তুর্কমেনিস্তান এবং তালেবান সদস্যদের উপস্থিতিতে সেন্টগ্যাস কনসোরসিয়ামের জন্য ইউনোকলের বিকল্প কোম্পানি খুঁজবার প্রয়াস নিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে আফগানিস্তানে তালেবানদের অবস্থা আর সে সাথে পাকিস্তানে পরিস্থিতি ক্রমে বিশ্বে বিরূপভাব উপস্থাপিত হবার কারণে কেউই ঐ প্রকল্পে অর্থলগ্নিতে এগিয়ে আসতে উৎসাহ প্রকাশ করে নি। ঐ বছরেই ইউনোকল কাবুল, কান্দাহার থেকে সম্পূর্ণভাবে সকল সম্পর্ক ছেদ করলে এ পাইপলাইন প্রকল্প স্থগিত হয়ে পড়ে।

তুর্কমেনিস্তান–আফগানিস্তান–পাকিস্তান পাইপলাইন প্রজেক্ট এক সময় এক অজ্ঞাত কোম্পানি বিরদাস দ্বারা পরিকল্পিত হবার পর থেকে এ অঞ্চলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি নিবদ্ধিত হয়। পরে সব প্রচেষ্টাই দারুণ হতাশায় পরিণত হয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়, তবে পাইপলাইন প্রজেক্ট একেবারেই ভেস্তে যায় নি। এর প্রেক্ষিতেই মে ২৮, ২০০২ সনে মধ্যএশিয়া তথা দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবর্তিত সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও ইসলামাবাদে, তুর্কমেনিস্তানের রাষ্ট্রপতি সুপার মুরাত নিয়াজভ, আফগানিস্তানের বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার প্রধান হামিদ কারজাই আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মোশারফ ঐ প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়াসে আরেকবার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তবে এ চুক্তিতে ভারতের অংশগ্রহণ না থাকাতে হামিদ কারজাই পরবর্তীতে ভারতকে এ পাইপলাইন প্রকল্পে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। দক্ষিণ এশিয়াতেও জ্বালানি নিয়ে বর্তমানে চলছে প্রচুর কূটনৈতিক খেলা আর এর সাথে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারও যুক্ত হয়েছে।

ইসলামাবাদে সম্পাদিত এ চুক্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে আফগানিস্তানের পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল মনোভাব এবং কাবুল সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তার আন্তর্জাতিক আশ্বাস সব মিলিয়েই এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ইঙ্গিত বহন করে। এ প্রসঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি প্রেস কনফারেন্সের উক্তি উল্লেখযোগ্য। ঐ বক্তব্যে পাক রাষ্ট্রপতি বলেন যে, 'বর্তমানের অনুকূল পরিবেশে এ পাইপলাইন

www.pathagar.com

প্রকল্পের আওতায় মধ্যএশিয়ার হাইড্রোকার্বন সম্পদ দক্ষিণ এশিয়া সহ দূরপ্রাচ্য এবং জাপানেও পরিবহন সম্ভব হবে।'

ধারণা করা হচ্ছে যে, এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে তুর্কমেনিস্তান বছরে ১৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাথমিক পর্যায়ে সরবরাহ করতে সক্ষম হবে যা ক্রমান্বয়ে ২৫ থেকে ৩০ বিলিয়ন কিউবিক মিটারে উন্নীত করা সম্ভব। এ গ্যাসের মূল্য হিসেবে তুর্কমেনিস্তান প্রতি ১০০০ কিউবিক মিটারের জন্য ৪০- ৪২ মার্কিন ডলার গ্রহণ করতে প্রস্তুত। যদিও বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যের চেয়ে এ মূল্য বেশ কম। তবুও তাৎক্ষণিকভাবে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি তবে তুর্কমেন প্রকল্পে বিরদাস রাশিয়ার গ্যাজপ্রম এবং ইতেরা যথেষ্ট আগ্রহ পুনরায় দেখিয়েছে।[৬] তুর্কমেনিস্তানের রাষ্ট্রপতি এ পাইপলাইনের সফলতার জন্য জাতিসংঘের সাহায্য চেয়েছে কিন্তু জাতিসংঘ অর্থ আয়োজনের এ অনুরোধে এখনও কোনো সায় দেয় নি। এ প্রকল্প নিয়ে মধ্যএশিয়া তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আরও চমকপ্রদ ঘটনার অবতারণা হবে কিনা তা হয়ত এ সময়ে বলা সম্ভব হবে না। তবে বিশ্লেষকদের মতামতের সাথে একমত হয়ে বলতে হয় যে, তালেবানরা ইউনোকল তথা মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় তাদের ত্বরিত সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এর পরবর্তী ঘটনাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমবারের মত মধ্যএশিয়ায় তাদের স্বশরীরে উপস্থিতির অনুকূল পরিস্থিতি করে দিয়েছে।

৬। ক্রস পেন্নিয়ার : South/Central Asia : Turkmen, Afghan, Pakistani Leaders Seek Revival of Pipeline Project. May, 30, 2002.

www.pathagar.com

ছয়

তালেবানদের উত্থান–পাইপলাইন রাশিয়া–যুক্তরাষ্ট্রের আফগান নীতি

১৯৭৯ সনে সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান দখলের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে পরোক্ষভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সক্রিয় সহযোগিতায় সিআইএ–আইএসআই অক্ষ গড়ে তুলে দশবছর আফগান 'মুজাহিদদের,' যার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অ-আফগান ছিল, পাকিস্তানের আইএসআই এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বেতনভাতা এবং অস্ত্রায়ন করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষ সাহায্যে যোগ দিয়েছিল সৌদি আরব, মিশর, উপসাগরীয় দেশগুলো আর গণচীন। ক্রমেই পাকিস্তান মিশর আর সৌদি আরব হয়ে ওঠে আফগানিস্তানের দশবছরের জেহাদের চালিকাশক্তি। দশবছরে সিআইএ আর আইএসআই এর প্রশিক্ষণ পেয়ে গড়ে উঠে বহু তথাকথিত ইসলামিক সন্ত্রাসী বা তাদের ভাষায় 'জেহাদি'। এদের মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বের ১ নম্বর সন্ত্রাসী বলে কথিত প্রাক্তন সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন, তার এককালের অ-আফগান মুজাহিদ সংগঠন কেন্দ্র আল-কায়দা, আলজেরিয়ার ইসলামি কট্টরবাদী সংগঠন জিআইএন (GIN) এবং ফিলিপাইনের আবু সাইয়াফের মত সংগঠনগুলো। শুধু এখানেই শেষ হয় নি, প্রায় সমগ্র বিশ্বের, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে এবং ইউরোপের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে সিআইএ এবং আইএসআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথাকথিত সন্ত্রাসীরা। এদের রয়েছে সিআইএ'র অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে। এ সবের ফসল হিসেবে আজ যুক্তরাষ্ট্র শংকিত হয়ে পড়েছে তথাকথিত সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর পর থেকে।[১]

১। লেখকের পুস্তক 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা ঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা', প্রকাশক– পালক পাবলিশার্স, ঢাকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আজ সন্ত্রাস নিরোধের নামে তালেবান উৎখাত হলেও আফগানিস্তানে প্রতিনিয়ত খন্ড যুদ্ধ লেগেই রয়েছে আর এর ফলে নিহত হচ্ছে শত শত নিরীহ আফগানরা। মার্কিন উপস্থিতি রয়েছে পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান আর জর্জিয়ায়। ফিলিপাইনে মার্কিন সেনারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সন্ত্রাস বিরোধী তৎপরতা মোকাবেলায়। এসবই আফগানিস্তানে দশবছরের জেহাদের ফসল।

আফগানিস্তানে ১৯৭৩ সনে জহির শাহের উৎখাতের পর থেকেই অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় তবে, পশ্চিমের প্রায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা শুরু হয় ১৯৭৯ সনের পর থেকেই। ১৯৭৯–৮৯ এ দশ বছরে সিআইএ এবং তার সহযোগী মুসলিম দেশগুলো আফগানিস্তানে প্রায় বিশ বিলিয়ন ডলারের অর্ধেক দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন খরচ করেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলার। এ সব অর্থই খরচ হয়েছে উভয় পক্ষের তরফ থেকে শতশত টন অস্ত্র আর গোলাবারুদ সংগ্রহ আর যোগানে। সমগ্র আফগানিস্তান হয়ে উঠেছিল অস্ত্রের ভান্ডার। তাই আজও সেখানে প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক রক্ষীরা খুঁজে পাচ্ছে শতশত টন গোলবারুদ আর হাতিয়ার।

আফগান জেহাদের সময় 'মুজাহিদিন'দের সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতা শুধুমাত্র আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সিআইএ আর আইএসআই এর তত্ত্বাবধানে এ যুদ্ধ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম প্রধান প্রজাতন্ত্রগুলোতেও ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ঐসব অঞ্চলে জেহাদি সংগঠনকেও সহযোগিতা দেয়া হয়েছিল। শতশত উজবেক, তাজিক, চেচেন আর তুর্কমেন স্বেচ্ছাসেবক এমনকি চীনের সিনজিয়াং এর উইগুর মুসলমানরাও যোগ দিয়েছিল।[২] এসব অঞ্চল বিশেষ করে দক্ষিণ সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতা বাড়ে। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও মস্কোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়।[৩] আফগানিস্তানে পপি চাষ এবং ড্রাগ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হয়। সমগ্র রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে আফগান উৎপাদিত ড্রাগ। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮৭ এর মধ্যেই ড্রাগ ছড়িয়ে পড়ায় উত্থান হয় বড় বড় ড্রাগ মাফিয়াদের। এসব ড্রাগ মাফিয়াদের সাথে তৎকালীন সুপ্রিম সোভিয়েতের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গও জড়িয়ে পড়েন। এসবই অব্যাহত থাকে প্রায় সমস্ত আফগান জেহাদের সময়টা জুড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান যুদ্ধের সময় একটি ভুল করেছিল

২। John K Coaley. "Unholy Wars" Pluto Press. London.

৩। Brigadier Mohd. Yousuf & Major Manle Adkin "The Bear Trap" Jhans Publishers. Pakistan.

www.pathagar.com

তার খেসারত আজও দিয়ে যাচ্ছে আর তা হলো মধ্যএশিয়া প্রজাতন্ত্রগুলো থেকে রিক্রুটকৃত মুসলিম তুর্কি ভাষাভাষি যুকদের সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবে যোগদান করা। এদের মধ্যে ছিল, তুর্কমেন,উজবেক, তাজিক আর উইগুয়িরা। এদের বৃহদাংশ যুদ্ধের প্রায় শেষভাগে, যার মধ্যে বেশির ভাগ উত্তরে আহমেদ শাহ·মাসুদের সাথেই রয়ে যায়। এদের মধ্য থেকেই ক্রমেই মধ্যএশিয়ায় গুপ্তসংগঠনগুলোতে রিক্রট করা হয়। ১৯৯২ সনে কাবুলে নাজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের এবং ১৯৯৪ সনে তালেবানদের আত্মপ্রকাশের এ অন্ত র্বর্তীকালীন সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলার সময়ে প্রাক্তন সোভিয়েত মধ্যএশিয়া বংশোদ্ভূত সেনাসদস্যরা তাদের সমগোত্রীয় বাহিনীতে যোগদিয়ে যুদ্ধ করেছিল। এক কথায় আফগানিস্তানের দশবছরের জেহাদ আর পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি সহ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রাক্তন সোসালিস্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গনের পর থেকেই পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান তথা মধ্যএশিয়া থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। ১৯৯৮ সন পর্যন্ত আফগান তথা মধ্যএশিয়ার পরিস্থিতি ক্ষেত্রিয় শক্তিগুলোর দ্বারাই প্রভাবিত হতে থাকে। এদের মধ্যে প্রধান দেশগুলো ছিল একদিকে রাশিয়া অন্যদিকে ছিল ইরান এবং পাকিস্তান।

পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের তৎপরতা নিয়ে রাশিয়া এবং এর সহযোগী মধ্যএশিয়া প্রজাতন্ত্রগুলো দারুণ উৎকণ্ঠিত ছিল। এদের মধ্যে উজবেকিস্তান সবচেয়ে শঙ্কিত ছিল এবং আজও রয়েছে। ১৯৯৪ সনে তালেবানদের উত্থানের সূচনালগ্নে এ উৎকণ্ঠার উত্তপ্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে সুইজারল্যান্ডের ডেভোসে মধ্যএশিয় দেশগুলোর এক বৈঠকে। ঐ বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন তুরস্ক, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান আর কাজাকিস্তানের সরকার প্রধানগণ, আরও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো।

ঐ বৈঠকে উজবেক রাষ্ট্রপতি ইসলাম করিমভ, বেনজির ভুট্টোর এক রক্তব্যের সরব বিরোধিতা করে জোরালো দাবি করেন যে, পাকিস্তান শুধু আফগান পরিস্থিতিই ঘোলা করছে না বরং মধ্যএশিয়াতেও ইসলামপন্থীদের উস্কানি দিচ্ছে। এর আগে বেনজির ভুট্টো মন্তব্য করেছিলেন যে, আফগানিস্তানে ইসলামিস্টারা মধ্যএশিয়ার জন্য কোনো মাথাব্যাথার কারণ নয়। করিমভ ঐ বৈঠকে পাকিস্তানের

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষি না হয়েও আফগান পরিস্থিতিকে জাতিসংঘের বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণে নেবার অনুরোধ জানান। ঐ সময়ে তালেবান তথা হিকমত ইয়ারের বিরুদ্ধাচারণে উজবেকিস্তান আফগানিস্তানে উজবেক বংশোদ্ভূত নেতা জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তামকে সহযোগিতা করছিলেন। একই সাথে রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ তাজিকিস্তানে মস্কো সমর্থিত সরকারের সাহায্যে দুসানবেকে ইসলামপন্থীদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সামরিক সহযোগিতাও দিয়ে যাচ্ছিল।[৪] এহেন পরিস্থিতিতে তুর্কমেনিস্তান মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়েছিল। তুর্কমেনিস্তান স্বীয় স্বার্থেই আফগান অশান্ত পরিবেশের মধ্যেও পাকিস্তানের সহায়তায় পশ্চিমের কোম্পানি দক্ষিণ এশিয়ার তেল গ্যাস রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিখণ্ডিত হবার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি পূর্ব ইউরোপে নিবদ্ধিত হয়ে পড়ে। আফগানিস্তান তথা সমগ্র মধ্যএশিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নেয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র মধ্যএশিয়ার কোথাও নতুন নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাই অনুধাবন করে নি। মধ্যএশিয়া নীতির যতটুকুই বিদ্যমান ছিল তাও ছিল অস্পষ্ট তথৈবচ। মধ্যএশিয়ার অন্যান্য সম্ভাব্য জ্বালানি ক্ষেত্রের বিশেষ মূল্যায়ন না করে ঐ সময়ে শুধুমাত্র বাকু-চেহেন (আজারবাইজান –তুরস্ক) পাইপলাইন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐ একই সময়ে চেচনিয়া, নাগারনো–কারাবাখ অঞ্চলগুলোতে ইসলামপন্থীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হয়।[৫] অবশ্য এ পরিস্থিতি এখনও বিদ্যমান রয়েছে–তবে ভয়াবহতা হ্রাসের দিকে।

১৯৮৯ সন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র আফগান বিষয়ে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষি হয়ে পড়েছিল এমনকি ১৯৯২ সনের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধও যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি ফেরাতে সক্ষম হয় নি। আফগানিস্তানের ব্যাপারে এ উদাসীনতা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যর্থতা। প্রথমটি হয়েছিল জহির শাহের উৎখাতের পর কম্যুনিস্টদের উত্থানের সময়ে।[৬] সাধারণ আফগানরা কম্যুনিস্ট উত্তর আফগান পরিস্থিতিকে আজও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে। তারা মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের এ উদাসীনতার জন্য, ১৯৯২ সনের পরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পরিণতিই আজকের

৪। Ahmed Rashid "Taliban".

৫। Starobin. Paul, 'The Greatgame' The National Journal March 12, 1999

৬। লেখকের পূর্বোক্ত পুস্তক, দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

(২০০২) পরিস্থিতির উৎপত্তির কারণ। আজকের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দশ বছরের পূর্বে গৃহীত হলে আফগানিস্তানে এত রক্ত ঝড়ত না অথবা বিশ্বের এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতি ঠেকানো সম্ভব হতো।

শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির প্রথম লগ্ন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান–পাকিস্তান–ইরান আর মধ্যএশিয়ার কোনো সুদূরপ্রসারী নীতি ছিল বলে মনে হয় নি। বরং এতদঅঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ইস্যুভিত্তিক হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ঐ সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকের কুয়েত দখল আর তার মধ্যপ্রাচ্যে উপস্থিতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সৌদি আরবের ইসলামি শরিয়া শাসনের পরেও পশ্চিমের সাথে সহঅবস্থানের পরিবেশের অভিজ্ঞতাতেই আফগানিস্তানে তালেবানদের মত ধর্মীয় দলের উত্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের খুব একটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে হয় নি। তাছাড়া সুন্নি তালেবানদের উত্থান একদিকে যেমন ইরানকে কোণঠাসা করবে অন্যদিকে রাশিয়ার বিস্তারকে ঠেকাবে এ মনোভাবের কারণেও ১৯৯৪–৯৬ এর সময়ে তালেবানদের উত্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র মৌন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের এ মৌন সমর্থন ১৯৯৫–'৯৭ তে আরও একটু শক্ত হয় যখন ইউনোকল ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে মধ্যএশিয়ার জ্বালানি রপ্তানির সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে। এ পর্যায়ে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের মুখাপেক্ষি হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইউনোকল এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের প্রকল্পগুলো দক্ষিণ এশিয় সংঘাতগুলো অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশমিত করবে বলে ওয়াশিংটনের নীতি নির্ধারকরা মনে করেছিলেন এবং ধরে নিয়েছিলেন মধ্যএশিয়ায় রাশিয়া আর ইরানের প্রভাব বিস্তার ঠেকাতে সহায়তা করবে।

এসব ধারণা ক্রমেই উবে যেতে থাকে যখন আফগানিস্তানে তালেবানদের প্রণীত অত্যন্ত কট্টর ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়। যে ব্যবস্থায় নারী অধিকার সম্পূর্ণ হরণ করে এমনকি বৈদেশিক দাতব্য সংস্থা তথা জাতিসংঘের সংস্থাগুলো থেকে মহিলা কর্মচারীদের চাকুরিচ্যুতি এবং কর্মসংস্থানকে নিষিদ্ধকরণ, প্রচারযন্ত্রগুলোকে নিষিদ্ধকরণ তদুপরি মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি যোগ দিলে বিশ্ব মতামত ক্রমেই তালেবানদের বিপক্ষে যেতে থাকে। এসব ব্যবস্থা ১৯৯৭ সনের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে শংকিত করে তোলে। তার উপরে যুক্তরাষ্ট্রে নারী আন্দোলন সংস্থাগুলো তালেবানদের নারী বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে সকলপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদের দাবি জানিয়ে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন তখন নিজেই মনিকা লুইনস্কির বিবাদে জড়িয়ে পড়ছিলেন। আর নারীবাদী আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন হিলারী ক্লিনটন নিজে। কাজেই আসন্ন পরবর্তী নির্বাচনে এসব নারীবাদী আন্দোলনের সমর্থনের জন্যই ক্লিনটন প্রশাসন একপা এগিয়ে দুপা পিছিয়ে আসতে শুরু করে।

অন্যদিকে আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের উপস্থিতির পর থেকেই ইউনোকল তার পরিকল্পনা নিয়ে সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছিল। বহু দহরম মহরমের পরেও তালেবানরা ইউনোকলের প্রকল্প সমর্থন করে নি এবং আজও মনে করা হয় ওসামা বিন লাদেনই তালেবানদের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তথা পাকিস্তানের প্রয়াসকেও উপেক্ষা করেছিল। ততদিনে ইরানের শাসকদের মধ্যেও মধ্যপন্থীদের উত্থান যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলেই যাচ্ছিল। ১৯৯৮-'৯৯ আফগানিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে বিরাগভাজন হয়ে পড়ে ঐ সময়ে বিন লাদেনই যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যএশিয়া নীতির মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হন। বিন লাদেনকে এবং তালেবানদের উৎখাত করাই ১৯৯৯ এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আফগান নীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ে। সিআইএ কে সীমিত দায়িত্ব দেয়া হয় তালেবানদের উৎখাত এবং বিন লাদেনকে নিশ্চিহ্ন করবার অভিযানের জন্য। এতদিনে যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, এ কাজ এতই জটিল যে, পাকিস্তানের একার পক্ষে এ পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব নয়।

১৯৯৪ সনে তালেবানদের উত্থান হতে শুরু করে। ১৯৯৫ সনে হেরাত দখল এবং ইসমায়েল খাঁ'র সমর্থকদের হত্যা থেকে শুরু করে কঠোর শরিয়া আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগও তালেবানদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনো বিকল্প প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয় নি। বরং হেরাত অঞ্চল সুন্নি তালেবানদের হাতে আসায় ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি এবং ইউনোকলের ট্রান্স আফগান পাইপলাইনের পরিকল্পনার সম্ভাব্য বাস্তবায়নের সম্ভাবনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন উৎসাহ ব্যাঞ্জক হয়ে উঠে।

অবশ্য ১৯৯৬ সনে তালেবানদের হাতে কাবুলের পতনের আগেই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক স্মারকে সাবধান করা হয়েছিল যে, তালেবানরা যদি আফগানিস্তানে তাদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করতে থাকে তবে ঐ শক্তি রাশিয়া, ভারত আর ইরান তালেবান বিরোধীদের সহায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হবে এবং সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র উভয় সংকটে পড়বে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের মত মিত্র দেশকে সামাল দিতে হবে অন্যদিকে রাশিয়া এবং

www.pathagar.com

ভারতের সাথে ক্রমবর্ধমান সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে। এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আফগানিস্তানে সুসংগত নীতি রাখা সম্ভব হবে না।[৭] ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের পূর্বে আফগানিস্তান নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় নি।

১৯৯৬ সন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সেক্রেটারি স্টেট ওয়ারেন ক্রিস্টোফার এবং দক্ষিণ এশিয় বিষয়ক এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রবিন রাফায়েলের কেউই আফগানিস্তান নিয়ে কোনো মন্তব্য বা চিন্তাভাবনাও করেন নি। তবে জুন ১৯৯৬ তে সেনেটর হ্যাঙ্ক রাউনের নেতৃত্বে ছয় বছরে প্রথমবারের মত রবিন রাফায়েলের সাহচার্যে ভিন্নপন্থী আফগান নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সূত্রে বলা হয়, ঐ বৈঠকে খরচ এবং আয়োজন উভয়ই ইউনোকলের অর্থে করা হয়েছিল। ঐ বৈঠকে ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে কোনো প্রকার অস্ত্র বিক্রির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল বলে প্রকাশ।

এ নিষেধাজ্ঞা পাকিস্তান প্রকাশ্যে সমর্থন করলেও আইএসআই গোপনে সিআইআই কে জানায় যে, এ নিষেধাজ্ঞার কারণে তালেবানদের অভিযানে ক্ষতি হবে এবং তালেবানদের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত না করতে পারলে আফগান সমস্যা আরও সংকটময় হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তালেবানদের দ্রুত কাবুল দখলের উপরেই নির্ভর করছে ট্রান্স আফগান পাইপলাইনের সফলতা।[৮] তবে তালেবানদের উত্থানে সমগ্র মধ্যএশিয়ায় যে ভিন্ন ধরনের সংকটের সূত্রপাত হবে তা রবিন রাফায়েল তার প্রদত্ত ব্যাখ্যায় উল্লেখ করলেও তার ঐ সতর্কবাণীকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট গ্রাহ্য করে নি।

১৯৯৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তালেবান কর্তৃক কাবুল দখলের পর পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, দ্রুত সম্পূর্ণ আফগানিস্তানে তালেবানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে এবং তালেবানরা আফগানিস্তানে স্থিতি ফিরিয়ে আনলে এ ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলো অতি স্বত্বর বাস্তবায়িত হবে। ঐ সময়ে আরেকবার রবিন রাফায়েল বলেন যে, যেহেতু দৃশ্যত তালেবানরা আফগানিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করে সেক্ষেত্রে তালেবানদের উপেক্ষা করা উচিত হবে না; বরং তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তালেবানদের কট্টর শরিয়া আইনকে শিথিল করানো যেতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে,

৭। Ahmed Rashid. Opcit.
৮। Ahmed Rashid. Ibit.

www.pathagar.com

তালেবানদের উত্থান আর সমর্থন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট দ্বিধায় ভুগছিল। শুধু তাই নয়, কাবুল দখলের সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের স্বীকৃতির কথাও বলেছিল তবে তা আরও পরে অস্বীকার করে।

এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক মুখপাত্র বলেছিলেন যে, ইসলামি শরিয়া আইন প্রবর্তনে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমস্যা হবে না। তিনি আরও বলেন যে, অন্তত তালেবানরা কাবুল থেকে একক শক্তি হিসেবে সমগ্র আফগানিস্তান শাসন করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে ইউনোকলের ভাইস–প্রেসিডেন্ট মার্টি মিলার তালেবানদের সফলতা একটি ইতিবাচক বিকাশ বলেও বক্তব্য দিয়েছিলেন।[৯]

কাবুল পতনের পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আফগান রাজধানী সফর করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, রবিন রাফায়েলের স্থলাভিষিক্ত কার্ল ইন্দারফাদ, থমাস পিকারিং এবং জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের দূত বিল রিচার্ডসন। এসব সফরেই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বলে মনে করা হয়। এর পিছনে ছিল ইউনোকলের প্রকল্পকে সমর্থন জোটানো। অবশেষে ১৯৯৭ সনে সেক্রেটারি অব স্টেট মেডেলিন অলব্রাইট ইসলামাবাদ সফর করেন। তালেবানদের নারী বিদ্বেষী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখে প্রথমবারের মত তালেবানদের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের বিরূপভাবের কথা প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সন পর্যন্ত মধ্যএশিয়ার জ্বালানি খাতের উপর কোনো নীতি গ্রহণ করতে পারে নি যার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানিগুলো সুস্পষ্ট নীতির অভাবে স্ব-উদ্যোগে অগ্রসর হতে গিয়ে বারবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের এবং সুপারিশকারীদের শরণাপন্ন হচ্ছিল। এ কারণেই প্রচুর অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিবীদদের সাহায্যে সরকারকে তাদের পক্ষ অবলম্বনে রাজি করাতে থাকে ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কূটনৈতিক সমস্যার উৎপত্তি হয়। ঐ সময়ে এবং বর্তমানেও যে নীতি বহাল রয়েছে তা হলো ইরানের সাথে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুসম্পর্ককে নিরুৎসাহিত করা। এরই প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইউনোকলের ট্রান্স আফগান পাইপলাইন এবং সেন্টগ্যাসকে সমর্থন দিয়ে আসছিল।

১৯৯৭ সনের গোড়ার দিকে ওয়াশিংটন মধ্যএশিয়ায় জ্বালানি নীতির উপর

৯। Ahmed Istiaq,Eastern Medeterranean University Cyprus. Fiend.

www.pathagar.com

আলোকপাত করে মাত্র। তখনও তুর্কমেনিস্তান হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার পথ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয় নি। এ নীতি কাস্পিয়ান সাগর ভিত্তিক। এতে 'পরিবহন করিডোরের' কথা বলা হয় মাত্র। এ করিডোর কাস্পিয়ান হতে তুরস্কের সংযোগের কথা উল্লেখ করা হয়। এ করিডোর প্রকল্পও পরে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করে। যদিও এ করিডোর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যএশিয়ার নীতিতে রাশিয়া আর ইরানকে বাদ দিয়ে প্রণীত কিন্তু এর রাজনৈতিক নীতি একদিকে যেমন মধ্যএশিয়ায় চলমান সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেয় নি তেমনি দূরত্বের ভিত্তিতে জ্বালানি পরিবহনের ক্ষেত্রে অধিক ব্যয়বহুল বলে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর বহু প্রকল্প ঝুলে রয়েছে। এ করিডোর নীতির ফলেই মধ্যএশিয়ার জটিল প্রকৃতির সমস্যাগুলোর সমাধান হয় নি এর মধ্যে এখনও সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে চেচনিয়ায় স্বাধীকারের যুদ্ধে উদ্ভূত পরিস্থিতির।

বর্তমানে ২০০৩ সনেও পৃথিবী পরিবর্তিত হলেও মধ্যএশিয়ায় এখন চলছে নতুন মেরুকরণ। একদার আতঙ্ক তালেবান আর আলকায়দা বিতাড়িত কিন্তু মধ্যএশিয়ার বহু অঞ্চলে সংঘাতময় সমস্যার সমাধান হয় নি। চেচনিয়ার পরিস্থিতি রাশিয়ার জন্য এখনও এক বিরাট সমস্যা। যদিও অধুনা যুক্তরাষ্ট্র চেচনিয়ার ব্যাপারে নমনীয় হয়েছে তবুও রাশিয়া এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছে না যার কারণে ব্যাহত হচ্ছে জ্বালানি পরিবহন করিডোর। জর্জিয়াতে মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। মধ্যএশিয়ায় মুসলিম প্রধান প্রজাতন্ত্রগুলোতে সরকার বিরোধী আন্দোলন ও ইসলামিক সন্ত্রাসের নামে নিপীড়িত হচ্ছে। চেচনিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধীকারের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র জ্বালানি করিডরের কর্তৃত্ব হারানোর ভয়েই রাশিয়া কর্তৃক ইসলামিক সন্ত্রাস অথবা চেচেন বেন্ডিট বলে পরিচিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এখনও মধ্যএশিয়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়, আফগানিস্তানসহ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রচেষ্টায় রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত ইউনোকল ট্রান্স আফগান পাইপলাইন নিয়ে পুনরাবর্তন করে নি তবে হামিদ কারজাই আর খালেদ জাদেদের উপস্থিতি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। ইউনোকল দক্ষিণ এশিয়া তথা মায়ানমারেও তৎপর রয়েছে। সুদূরপ্রসারিত প্রকল্পের অধীনে রয়েছে ট্রান্স এশিয়া জ্বালানি নেটওয়ার্ক। ধারণা করা যায় যে, অচিরেই ওয়াশিংটন নতুন মধ্যএশিয়ায় জ্বালানি নীতি প্রকাশ করবে। আর এ নীতিতে যদি রাশিয়া আর ইরানের বিরোধিতা না করা হয় তবে হয়তো

www.pathagar.com

মধ্যএশিয়ায় চলমান সংকটের সমাধানের সম্ভাবনা উঁকি দিতে পারে।

কাস্পিয়ান সাগরের অধিকার শর্ত নিয়েই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। এ মতবিরোধ অনেকগুলো বৈঠকের পরেও নিরোধ করা সম্ভব হয় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গনের পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ইরানের মধ্যই বৃহত্তর অংশ বিভাজিত ছিল যদিও তুরস্কের ভাগও ছিল সামান্য। এসব বিভাজন ১৯২১-৪০ সনের মধ্যে সোভিয়েত আর ইরানের মধ্যে চুক্তিগুলোর মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল। কিন্তু আরও তিনটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় সমুদ্রের স্বত্ব নিয়ন্ত্রিত পরিধি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে আজারবাইজান আর ইরানের মধ্যে। জুলাই ২০০১ সনে ইরান আর আজারবাইজানের মধ্যে এ বিষয় নিয়েই সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছে। আজারি আর বৃটিশ পেট্রোলিয়ামের (BP) সমীক্ষণ জাহাজ (Survey Ship) আরাজ–আলোভ মার্গ কাঠামো অবলোকনের সময় ইরানের যুদ্ধ জাহাজের চাপের মুখে ঐ সমীক্ষণ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে ইরান রয়েল ডাস্ট/সেল এবং লাসমোকে সিসমিক সার্ভে করবার অধিকার দিলে আজারবাইজান বিরোধিতা করে। এছাড়াও তুর্কমেনিস্তান এবং আজারবাইজানের মধ্যে সেরদার/কিয়াপেজ ক্ষেত্র নিয়ে বিবাদ রয়েছে। এসবের কারণেই কাস্পিয়ান সাগরের তেল উত্তোলন এবং পরিবহনের পাইপলাইনের সম্ভাব্য রাস্তা নিয়ে এসব আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজমান। আজারবাইজান আর ইরানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের কোনো প্রচেষ্টা এখনও সফল হয় নি। বরং আজারবাইজান প্রায়ই ইরানকে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য দোষারোপ করে থাকে। রাশিয়া, আজারবাইজান এবং কাজাকিস্তান 'মোডিফাইড মেরিডিয়ান' প্রিন্সিপালের উপরে ভিত্তি করে সমস্যা সমাধানে সম্মত রয়েছে। তবে ইরান কাস্পিয়ানের সমুদ্রসীমা সমানভাবে ভাগ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। ইরানের সাথে তুর্কমেনিস্তানও যোগ দিয়েছে। ২০০২ সনে ইরানের সাথে কাস্পিয়ান অঞ্চলের বৈঠক ফলপ্রসূ হয় নি। সমস্যা আজও সমাধান হয় নি। ইরান তার দাবিতে অনঢ় আর এ কারণেই ইরানের সাথে কাস্পিয়ান অঞ্চলে কার্যরত বিদেশী কোম্পানিগুলোর বিবাদও বেড়ে চলেছে। কাজেই এহেন অবস্থা ভবিষ্যতে সংঘাতের রূপ নিতে পারে।

কাস্পিয়ান সাগর ঘিরে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সঠিক নিয়ন্ত্রণের আয়তন নিয়ে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসা না হলেও নিজস্ব ঘোষিত এলাকার মধ্য তেলের উত্তোলন এবং সন্ধান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে আজারবাইজান আর

www.pathagar.com

কাজাকিস্তানে এ অনুসন্ধানের কাজ চলছে সবচেয়ে বেশি। আজারবাইজানের প্রধান তেল উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র 'গুনাসলিহ' তেই বেশি লগ্নি আসছে। যদিও এ ক্ষেত্র থেকে ১৯৯১ সনের আগেই তেল উৎপাদন হতো। ২০০১ সন পর্যন্ত বর্ধিত মূলধন লগ্নির ফলে বর্তমান উৎপাদন প্রায় দিনপ্রতি ৩১৭,০০০ ব্যারেলে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে কাজাকিস্তানে স্বাধীনতার পর বৈদেশিক কোম্পানিগুলোর অধিক লগ্নির কারণে ২০০১ সন পর্যন্ত উৎপাদন বেড়েছে দিনপ্রতি ৮০৪,০০০ ব্যারেল। আর বেশিরভাগ তেল উৎপাদন হচ্ছে তেনগিজ, উজান আর কারাগানাক ক্ষেত্রগুলো থেকে। এছাড়াও কাজাকিস্তানের বাড়তি অফসোর তেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়েছে কাসাগাহান ক্ষেত্র আবিষ্কারের পর থেকে। এসব প্রাপ্তির পর থেকে বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে কাজাকিস্তানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে কাস্পিয়ান সাগর তটের এসব প্রজাতন্ত্রগুলোর ২০০১ সন পর্যন্ত উৎপাদন দিনপ্রতি ১.০ মিলিয়ন ব্যারেলে উন্নীত হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এতদঅঞ্চলে অগ্রগামী যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানি স্যাভরন ১৯৯৩ সনে কাজাকিস্তানের সাথে সর্ববৃহৎ চুক্তি করে। এ ১০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে ৫০ঃ৫০ শতাংশ অংশীদারিত্বে তেনগিজ ক্ষেত্র সম্প্রসারণ কাজ হাতে নেয়া হয়। এখানে প্রাথমিকভাবে ৬-৯ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তেনগিজচারোভিল নামের এ যৌথ উদ্যোগের আওতায় ১৯৯৯ সনে দিনপ্রতি ১৯০,০০০ ব্যারেল কে বাড়িয়ে ২০০২ সন পর্যন্ত ৩৮০,০০০ ব্যারেলে উন্নীত করবার পরিকল্পনায় সার্থকভাবে কাজ চলছে। এসব তেল রপ্তানির জন্য তেনগিজ নভোরোসিস্ক পাইপলাইন বিদ্যমান থাকলেও এরই সমান্তরাল ন্যূনতম পক্ষে আরও একটি পাইপলাইনের চিন্তাভাবনা চলছে এবং ২০১০ সনের মধ্যে এটা সম্পূর্ণ হলে এ অঞ্চলে উৎপাদন বেড়ে দিন প্রতি ৭৫০,০০০ ব্যারেলে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৯৯৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আজারবাইজান তার তেল কোম্পানি কর্তৃক আট বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব প্রকল্প সবটাই কাস্পিয়ান সাগরতটের এলাকাতে আজারি, সিরাগ এবং গভীর সমুদ্রে গানাসলি ক্ষেত্রগুলোতে তেল উত্তোলনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। এসব ক্ষেত্রের যোগফলে ৩-৫ বিলিয়ন ব্যারেল মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০০০ সনের মধ্যে সব মিলিয়ে আজারবাইজান ১০০,০০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন শুরু

www.pathagar.com

করে। আর ২০০১ সনের প্রথম তিন মাসেই এ তিন ক্ষেত্র থেকে উৎপাদন হয় দিনপ্রতি ১১৮,৮৮০ ব্যারেল। ধারণা করা হচ্ছে, এ তিন ক্ষেত্র থেকেই ২০১০ সনের মধ্যেই দিনপ্রতি ৮০০,০০০ ব্যারেল উৎপাদিত হবে। এসব তেল ক্ষেত্র থেকে রপ্তানির নিরাপদ পরিবহন পথ হচ্ছে রাজধানী বাকু থেকে তুরস্কের সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত।

কাস্পিয়ান সাগর ঘিরে এ প্রকল্পগুলোর পরিসংখ্যানে বলা হয় যে, ২০১০ সনের মধ্যে এতদঅঞ্চল দিনপ্রতি ৩.৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। আর ২০২০ সনের মধ্যে এ উৎপাদন দিনপ্রতি আরও দুই মিলিয়ন বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস যার বিবরণ পরিশিষ্ট 'গ' তে দেয়া আছে।

এ অঞ্চলে ফি বছরে তেল এবং গ্যাসের যে পরিমাণ উত্তোলনের প্রকল্প বাড়ছে তাতে পরিবহনের জন্য নিত্যনতুন পরিবহন করিডোর খুঁজতে হচ্ছে। এরই মধ্য ২০০০ সন পর্যন্ত কাজাকিস্তান প্রায় দিনপ্রতি ৪৫৭,০০০ ব্যারেল এবং আজারবাইজান দিনপ্রতি ১৫৫,০০০ ব্যারেল রপ্তানি করছে। ঐ বছরেই কাস্পিয়ান অঞ্চল থেকে মোট দিনপ্রতি ৮০০,০০০ ব্যারেল রপ্তানি হয়েছে। আর ২০০০ সনের মধ্যেই প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি হয় মোট ৯৮০ বিলিয়ন ঘনফুট। তবে আজারবাইজান আর কাজাকিস্তান প্রয়োজনীয় পরিবহন মাধ্যমের অভাবে এখন পর্যন্ত তাদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো থেকে পুরোপুরিভাবে গ্যাস উত্তোলন করে নি।

এতসব উৎপাদন এবং উৎপাদনের সম্ভাবনা সবই নির্ভর করছে উৎপাদন ক্ষেত্র হতে বাজারজাতকরণের সম্ভাবনার মধ্যে। তবে প্রধান সমস্যাটি হলো এ বাজারজাতকরণের মাধ্যম নিয়ে, যার মধ্যে সহজ এবং সস্তা ব্যবস্থা হলো পাইপলাইন। যেমনটা আমরা আগেই বলেছি যে, ১৯৯৭ সনের পূর্বে কাস্পিয়ান অঞ্চলে যে সমস্ত পাইপলাইন তৈরি করা হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল রাশিয়ামুখি। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে সমস্যা হয়েছে দক্ষিণমুখি পাইপলাইন নিয়ে। রাশিয়াতে যে জ্বালানি সরবরাহ করা হতো তার গড়পরতা দর ছিল আন্তর্জাতিক বাজার দর থেকে অনেক নিচে যার কারণে উৎপাদনকারী প্রজাতন্ত্রগুলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাশিয়াকে জ্বালানি আন্তর্জাতিক মূল্যের চেয়ে এত কম মূল্যে গ্যাস বিক্রি করতে অপারগতা প্রকাশ করছে। বিবাদটি এখানেই। তাছাড়া রাশিয়ার মধ্যদিয়ে ইউরোপে বাজারজাতকরণ মানে সমস্ত রপ্তানিই

www.pathagar.com

রাশিয়ার জাতীয় কোম্পানি গেজপ্রম (Gazprom) এর মাধ্যমে করতে হবে এবং এর নিয়ন্ত্রণও থাকবে রাশিয়ার আওতায়। উদাহরণস্বরূপ এ কারণেই ১৯৯৭ সনের পর থেকে তুর্কমেনিস্তানের জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ হ্রাস পায়। আর এর একমাত্র কারণ গেজপ্রমের মূল্য তারতম্য। এ কারণে তুর্কমেনিস্তান বহুবছর গ্যাস সঞ্চালন বন্ধ করে রেখেছিল। পরে অবশ্য ১৯৯৮ সনে কোনোভাবে এ সমস্যার সুরাহা হয়। তুর্কমেনিস্তানের এ অভিজ্ঞতার পর থেকেই কাস্পিয়ান সাগরের দেশগুলো শংকিত হয়ে উঠেছে। এ কারণেই এসব দেশ পশ্চিমা দেশের সাহায্য সহযোগিতার জন্য হাত বাড়াচ্ছে।

বর্তমানে প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছে প্রথমত দক্ষিণমুখি পাইপলাইনগুলো নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র চাইছে আফগানিস্তান-পাকিস্তান হয়ে এসব পাইপলাইন প্রবাহিত করতে কিন্তু আফগান পরিস্থিতি দ্রুত স্থিতিশীল না করতে পারলে সেটাও হয়ত ব্যাহত হবে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আফগানিস্তানে ঘটে যাওয়া ঘটনায় কারজাই সরকারের উপরাষ্ট্রপতি হাজি আব্দুল কাদেরকে হত্যা করা হয়। ঐ দেশের অস্থির পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দক্ষিণমুখি গ্যাস রপ্তানির বিকল্প পথ রয়েছে ইরান হয়ে উপসাগরের দিকে অথবা ইরান হতে বেলুচিস্তান হয়ে পাকিস্তানের বন্দরগুলোতে নিয়ে আসা। ইরানের সমস্যা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরান-লিবিয়া নিষেধাজ্ঞা আইন বলবৎ থাকা। এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর উপরে ইরানের সাথে তেল এবং গ্যাস ক্ষেত্রে লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানিগুলোর উপরে রয়েছে ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণ। তবে ইদানিং এসব কোম্পানি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মানতে চাচ্ছে না যার কারণে সরকারের সাথে প্রায়ই সংঘাতে আসছে। মধ্যএশিয়ার এহেন পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন আফগান আর পাকিস্তান ভূ-খণ্ডের একথা আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে রাশিয়ার এককালীন প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক উৎসাহ এবং এসব প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণে বাজার সম্প্রসারণের অভিলাষ সব মিলিয়ে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পাল্লা দিতে হচ্ছে। ২০০১ সনের মধ্যেই রাশিয়া আন্তর্জাতিক পাইপলাইনের সুবিধা দেবার জন্য তার পুরাতন পাইপলাইনগুলোকে সংস্কার, সম্প্রসারণ এবং সে সাথে নতুন পাইপলাইনের পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। রাশিয়ার বাল্টিক সাগর পাইপলাইন ২০০১ সন থেকে

www.pathagar.com

কার্যক্ষম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রাশিয়া বর্তমানে ক্রোয়েশিয়ার (Croatia) সাথে আদরিয়া (Adria) পাইপলাইনকে দুরুজবা (Druzhba) পাইপলাইনের সাথে যুক্ত করবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ দক্ষিণমুখি পাইপলাইন দিয়ে প্রবাহিত জ্বালানি ইউক্রেন-হাঙ্গেরি হয়ে ক্রোয়েশিয়ার আদ্রিয়াতিক (Adriatic) গভীর সমুদ্র বন্দর ওমিজালিতে (Omisali) পৌঁছাবে।

রাশিয়ার এতসব প্রচেষ্টার পরেও কাস্পিয়ান অঞ্চলের প্রজাতন্ত্রগুলো রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তার সুদূরপ্রসারি সমস্যাগুলোর কারণে মস্কোর উপরে ভরসা করতে পারছে না। এ ছাড়াও রাশিয়ার প্রায় সব পরিকল্পনাই কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) বন্দর নভোরোসিস্ক (Novorossiisk) ভিত্তিক। এ বন্দর হতে পর্যায়ক্রমে ট্যাংকারের মাধ্যমে বসফোরাস প্রণালী হয়ে বিশ্ববাজারের জন্য ভূমধ্যসাগরে নিয়ে আসতে হবে। বসফোরাস প্রণালী তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কাজেই এতে তুরস্কের সম্মতি প্রয়োজন যদিও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তুরস্ককে এছাড় দিতেই হবে। তবে তুরস্ক এ পরিকল্পনার বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। তুরস্কের মতে, এতে বসফোরাস প্রণালীর উপরে বাড়তি চাপ পড়বে, যা সামাল দেয়া কঠিন হবে। এসব বাড়তি ট্যাংকারগুলো প্রণালীকে জ্যাম করা ছাড়াও পরিবেশ দূষণের কারণও হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষণে বসফোরাসের উপরে তেনগিজ নভোরোসিস্ক কনসোরসিয়ামের পাইপলাইনের কারণে বসফোরাস প্রণালীতে ট্যাংকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

এতসব কারিগরি সমস্যার উপরেও রয়েছে কাস্পিয়ান অঞ্চলের আশেপাশে বহু বছর ধরে চলমান সংঘর্ষ যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। আর এসব সংঘর্ষপূর্ণ এলাকা বাদ দিয়ে পাইপলাইন প্রকল্প করতে যেমন অর্থ ব্যয় হচ্ছে তেমনি সময়ক্ষেপণ হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। এসব সংঘর্ষের মধ্যে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি তো রয়েছেই আর রয়েছে আরমেনিয়ান অধ্যুষিত নাগারনোকারাবাখ ছিটমহল নিয়ে আজারবাইজান-আরমেনিয়া সংঘর্ষ। আফগাজিয়া আর ওসেটিয়া (Ossetia) বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন। তথাকথিত ইসলামিক গোড়াপন্থীদের সাথে উজবেক সরকারের চলমান সংঘর্ষ। পাকিস্তান ভারত উত্তেজনা আর কাস্পিয়ান সাগরস্থ দেশগুলোর মধ্য বিবাদ। তবে এসব সংঘর্ষের মধ্যে সবচেয়ে জটিল এবং মারাত্মক হলো চেচনিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার চলমান যুদ্ধ। এ যুদ্ধে গ্রোজনি অঞ্চল প্রায় ধ্বংসের মুখে। নিহত হচ্ছে শতশত নিরীহ নাগরিক। চেচনিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী সুন্নি মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ

www.pathagar.com

ক্ষান্ত দিতে রাজি নয়। প্রায় ৩০০ বছর থেকেই চেচনিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধচারণ করে আসছে। এ যুদ্ধে পরোক্ষভাবে একের অধিক শক্তি জড়িত ছিল এবং এখনও রয়েছে। চেচনিয়ার সমস্যা শুধুমাত্র ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত নয়, এর পেছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক তেল গ্যাস পাইপলাইনের নিয়ন্ত্রণ আর জ্বালানি সমৃদ্ধ চেচনিয়ার অধিকাররের প্রশ্ন।

www.pathagar.com

সাত

কাস্পিয়ান সাগর মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প জ্বালানি ভাণ্ডার

১৯২০ সনে মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে সৌদি আরবে, তেলের ব্যবসায়িক উত্তোলনের পর থেকে তৎকালীন বিশ্বে বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা থেকে শুরু করে রাজনীতির নির্ধারকে পরিণত হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে যার আপাতত পরিসমাপ্তি হয় ১৯৪৮ সনে ইসরায়েলের আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে এবং এর সবই ছিল তেল কেন্দ্রিক। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে জ্বালানি হিসেবে তেলের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এসব পরিবর্তন প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পৃথিবী দু'বলয়ে বিভাজনের পর। এ বিভাজনের একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সোসালিস্ট বিশ্বের তথাকথিত নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের শীতল সংঘাতের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি অশান্ত হতে থাকে। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে মধ্যপ্রাচ্যে অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এসবই ছিল জ্বালানির উৎসকে নিজস্ব বলয়ে রাখার প্রচেষ্টা। বর্তমানে শীতল যুদ্ধের শেষে সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙ্গন এবং তথাকথিত সোসালিজমের কথিত বিদায়ের পরও মধ্যপ্রাচ্য অশান্ত রয়েছে। এর কারণ ইসরায়েল আর প্যালেস্টাইনের সংঘাত। আরও রয়েছে ইসলামিক কট্টরবাদ বলে পরিচিত সন্ত্রাসীদের তৎপরতা, সে সাথে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসা জ্বালানি সম্পদ। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানির উপর বিশ্বের ঊর্ধ্বমুখি চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান চাপ। এসব কারণেই এখন পশ্চিমা বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি নিবদ্ধিত

www.pathagar.com

হয়েছে মধ্যএশিয়া বিশেষ করে কাস্পিয়ান সাগর তটের সম্ভাবনাময় তেল এবং গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর উপর। ১৯৯১ থেকে এ পর্যন্ত প্রচুর লগ্নি এসেছে এ অঞ্চলে, সম্প্রসারিত হচ্ছে জ্বালানি ক্ষেত্রগুলো। এ অঞ্চলেও রয়েছে আঞ্চলিক এবং আভ্যন্তরীণ সংঘাত আর এ সংঘাতের মূলেও রয়েছে জ্বালানি। এ অঞ্চলে সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর পর মার্কিন সেনা সমাবেশ হয়েছে জর্জিয়া, আজারবাইজান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে। এ উপস্থিতি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে। লক্ষণীয় যে, মার্কিন উপস্থিতি জ্বালানির সম্ভাব্য পরিবহন করিডোরের উপরেই। ঐতিহাসিক নিরিখে মধ্যএশিয়ায় আলেকজান্ডারের সামরিক উপস্থিতির পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি প্রায় ২৩০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম বহিঃশক্তির উপস্থিতি বলে চিহ্নিত হয়েছে।

কাস্পিয়ান সাগরীয় অঞ্চল এখন বিশ্বের সবচেয়ে সংঘাতপূর্ণ এক অস্থির অবস্থায় রয়েছে। এ অঞ্চলে এখন চলছে জ্বালানি ব্যবসার রাজনীতি। মধ্যপ্রাচ্যের মতই কাস্পিয়ানতটের সম্পদ রয়েছে ৯০ ভাগ মুসলমান প্রধান দেশগুলোর হাতে। স্বভাবতই সংঘাতের একপ্রান্তে রয়েছে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠন যার বর্তমান পরিচয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠি যেমনটা রাশিয়ার চোখে চেচনিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সন্ত্রাস আর চেচেন যোদ্ধারা পরিচিত 'চেচেন ব্যান্ডিড বা চেচেন ডাকাত' বলে। উল্লেখ্য যে, স্যাভরন নামক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির প্রেসিডেন্টের উদ্ধৃতি কাস্পিয়ান সাগরের গুরুত্ব প্রতীয়মান করে তোলে। রিচার্ড সাজকের মতে, কাস্পিয়ান এখন আন্তর্জাতিক তেল শিল্পের পৃথিবীর নতুন সীমান্ত (কাস্পিয়ান সাগরতটের তেল এবং গ্যাসের প্রাপ্তি সম্ভাবনা এবং চলতি ও সম্ভাব্য রপ্তানির পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া আছে)।

কাস্পিয়ান সাগর, রাশিয়ার ভাষায় 'কাসপিয়সকোয় মোর', (Kaspiyskoye More) পারসিয়ান নাম 'দরিয়ায়ে খেজের' (Daraye Khezer), বিশ্বে বৃহত্তম ভূ-সাগর। এটাকে মোটামুটি একটি বৃহদাকায় হ্রদ বলা যায়। পূর্ব ককেসাস পর্বতরাজিতে অবস্থিত এ সাগর পশ্চিম মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সাগরের দক্ষিণে ইরান, দক্ষিণ পশ্চিমে তুরস্ক, পশ্চিমে আজারবাইজান, উত্তর পশ্চিমে রাশিয়া, উত্তরপূর্বে কাজাকিস্তান এবং পূর্বে তুর্কমেনিস্তান অবস্থিত। (কাস্পিয়ান ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। এ সাগরের নাম এ অঞ্চলে বসবাসকারি ঐতিহাসিক 'কাসপি' গোত্র থেকে গৃহীত। এর উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্য ৭৫০ মাইল (১,২০০ কিলোমিটার) এবং গড়ে প্রস্থ্য প্রায় ২০০ মাইল। এর আয়ত ক্ষেত্র ১৪৯,২০০

www.pathagar.com

বর্গমাইল (৩৮৬,৪০০ বর্গ কিলোমিটার), জাপানের চেয়েও আয়তনে বড়। সাগরটি ভূ-পৃষ্ঠ হতে ৯০ ফুট নিচে (২৭ মিটার সমুদ্র হতে নিচে)। গভীরতম জলরাশি ৩,৩৬০ ফুট (১,০২৫ মিটার)।

কাস্পিয়ানকে সাধারণত পৃথিবীর বৃহত্তম লোনা পানির হ্রদ বলা হয়ে থাকে। কাস্পিয়ান সাগর ভূ-তত্ত্ববিদদের জন্য যুগে যুগে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। কারণ এর একসময় আজভ সাগর হয়ে এর যোগসূত্র ভূ-মধ্যসাগরের সাথেও ছিল। এ সাগরের সাথে উত্তর দিক থেকে ভল্গা নদীর সংযোগ রয়েছে যার কারণে প্রায়ই সাগরে পানির গভীরতায় তারতম্য হয়। কাস্পিয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এর তটে প্রচুর জ্বালানির উৎস আর উত্তোলনসহ পরিবহনের সুযোগ। তাছাড়া কাস্পিয়ান সাগর তটবর্তী দেশগুলোর সাথে সহজ যোগাযোগের মাধ্যম। এ সাগর ঘিরে রয়েছে বহু উপজাতির উত্থান আর পতন। এ সাগরের তটের ভূমিতে মধ্যএশিয়ার বড় বড় যোদ্ধা শাসকের বিচরণে এর ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে।[১] আর বর্তমানে কাস্পিয়ান সাগর একদা পারস্য উপসাগরের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছে। এ সাগর তটের সম্পদ ব্ল্যাক গোল্ড বা কালো সোনা বলে পরিচিত তেলের উৎস আবার এ ক্ষেত্রকে আন্তর্জাতিক চারণভূমিতে পরিণত করছে। আমরা ইতিপূর্বের পর্বগুলোতে কাস্পিয়ান সাগরের একটি দেশ তুর্কমেনিস্তান, যে দেশ নিজেকে নব্য কুয়েত ভাবতে শুরু করেছে। আলোচনা করেছি এ পর্বে সার্বিকভাবে কাস্পিয়ান সাগর ঘিরে জ্বালানির উৎস আর সম্ভাব্য বাজারজাতকরণ নিয়ে মেতে ওঠা আন্তর্জাতিক অন্বেষণ নিয়ে আলোচনা করব।

কাস্পিয়ান সাগর ঘিরে প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে এখন চলছে তেলের অনুসন্ধান আর এর বাজারজাতকরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এসব দেশে এ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় ১৯৯১-৯৪ সনে যদিও ইতিপূর্বে এসব প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতে মস্কোর মাধ্যমে কিছু কিছু ইউরোপীয় ইউনিয়নের লগ্নি ছিল তবে এসব লগ্নির সুবাদে তেল উৎপাদন, ব্যবহার এবং সীমিত পরিসরে রপ্তানি সম্পূর্ণই মস্কোর তত্ত্বাবধানেই হতো। কাজেই প্রায় ৯০ ভাগ সম্পদের গন্তব্যস্থল ছিল উত্তরমুখি। তাছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এসব প্রজাতন্ত্রের সম্ভাবনাময় সম্পদ থেকে আঞ্চলিক সরকারগুলো কোনো সুবিধাই গ্রহণ করতে পারে নি। এ কারণেই বিপুল সম্পদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এসব প্রজাতন্ত্রগুলো পশ্চাদপদ

১। Encyclopedia Britannica - 1994-2000.

www.pathagar.com

আর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান তিমিরেই রয়ে গেছে। হঠাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে একদা বিশ্বের এ পশ্চাদপদ জনপদ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলে আসাতে এসব দেশের একনায়কগণ স্বৈরশাসন আরও পাকাপোক্ত করতে সক্ষম হয়। খোদ মস্কোতে রাজনৈতিক ধারার কিঞ্চিত পরিবর্তন হলেও এসব প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র পুরানো সোসালিস্ট কায়দার একক নেতৃত্বে রয়ে গেছে। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বের উন্মুক্ত বাজারের প্রভাবে এসব নেতারা নীতি বিবর্জিত রাজনীতি এবং কূটনীতিতে পটু হয়ে উঠছেন। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থ। আর তাই দোদুল্যমান রয়েছে এক শক্তি থেকে আরেক শক্তির দিকে।

এ বিপুল সম্পদের দেশের মধ্যে আরেকটি প্রধান দেশ কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমের প্রজাতন্ত্র আজারবাইজান। আজারবাইজানের সাথে কাস্পিয়ান সাগরের অংশীদার দেশের অন্যতম ইরান তার পশ্চিমে নিকটবর্তী দেশ একদা অটোমান সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশ তুরস্ক। আজারবাইজান সবেমাত্র তেল রপ্তানি শুরু করেছে এবং এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক জ্বালানি কোম্পানি মূলধন লগ্নি করেছে। ইরানের সাথে কাস্পিয়ানের সীমান্ত নিয়ে টানাপড়েনও শুরু হয়েছে। আজারবাইজানের কথায় পরে আসছি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিখণ্ডিত হবার পর থেকে এসব অঞ্চলে জ্বালানির উৎসকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে গিয়ে আন্তরাষ্ট্র রেষারেষি শুরু হয়। প্রথম দশকে এ অঞ্চলে ব্যবসার বদলে আন্তঃ কোম্পানি বিবাদ, হতাশা আর অসংখ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসব চুক্তির বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অথবা স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উচ্চাভিলাষের কারণে কার্যকর করা যায় নি। বর্তমানে অসংখ্য চুক্তির মধ্যে বাইশটি দেশের তিপ্পান্নটি কোম্পানির সাথে কাস্পিয়ান অঞ্চলে চল্লিশটি চুক্তি সম্পাদন করা হলেও তা অকার্যকর রয়েছে।[২] প্রায় ছয় বছর দৌড়ঝাঁপ আর উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে অনেক নামিদামি কোম্পানির ভাগ্য। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বাস্তব রাজনীতি। এসব রাজনীতির ছকে রয়েছে বড় বড় জ্বালানি কোম্পানি যাদের পেছনে রয়েছে অনেক বৃহৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আর রয়েছে রাশিয়া, চীন, ইরান আর যুক্তরাষ্ট্রের মত আঞ্চলিক আর বিশ্বশক্তি।

কাস্পিয়ান অঞ্চলের এসব লগ্নি শুধু অর্থেরই নয় সে সাথে রয়েছে শক্তি আর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে প্রভাব বিস্তারের মহড়া। কাজেই লগ্নি যেমন বিশাল এই লগ্নি আর সুদূরপ্রসারী আমদানির সম্ভাবনাও তেমনি বিশাল। বিলিয়ন ডলারের

২। Jorgen Woulters "The Quest for Caspian Crude" ABC News. com

www.pathagar.com

নয়, ট্রিলিয়ন ডলারের নতুন আঙ্গিকে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের পুনরুত্থানের চেষ্টা।

কাস্পিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান আর উজবেকিস্তান এ চারটি দেশের সম্পদের মধ্যে রয়েছে তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস। বিশ্ব বিখ্যাত জ্বালানি বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'উডম্যাকেঞ্জির' জরিপে বলা হয়েছে, এ চারটি দেশে তেলের মজুদ আটষট্টি বিলিয়ন ব্যারেল যা সমগ্র ইউরোপের মজুদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি।[৩] এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যের এডনবার্গস্থিত বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অঞ্চল দিনপ্রতি তিন দশমিক চার মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় ২০১০ সনের মধ্যে পৌঁছাতে পারবে। আর এর নব্বই শতাংশ উৎপাদিত হবে কাজাকিস্তান আর আজারবাইজানের তেল ক্ষেত্রগুলো থেকে। বর্তমানে এ ক্ষেত্রের উত্তোলন দিনপ্রতি এক মিলিয়ন ব্যারেল থেকেও কম।

তাছাড়া কাস্পিয়ান অঞ্চলের এসব দেশের সমষ্টিগত প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হচ্ছে দিনপ্রতি পঁচিশ বিলিয়ন কিউবিক ফুট। যদিও এখনও অনেকেই মনে করেন এতসব সম্পদের অধিকারী কাস্পিয়ান অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা এখনও সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি। একবিংশ শতাব্দীতে কাস্পিয়ান অঞ্চলের গুরুত্ব হতিহাসের যে কোনো সময় থেকে অধিক। এসব অঞ্চলের তেলের অবিক্রিত মজুদের পরিমাণ ধরাণা করা হচ্ছে ২০০ বিলিয়ন ব্যারেল আর বর্তমান পরিক্ষিত মজুদ রয়েছে ৭০০ বিলিয়ন ব্যারেল। যাহোক বর্তমানে কাস্পিয়ান অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য থেকে অধিক উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চল বলে বিবেচিত হচ্ছে। যে কোনো কারণেই হোক মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা প্রচারিত হচ্ছে বেশি।

বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার প্রেক্ষিতে কাস্পিয়ান অঞ্চলের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০১০ সনের মধ্যেই বিশ্বের বর্তমান জ্বালানি চাহিদা প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ভোক্তা দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ২০১০ সনের মধ্যে বর্তমানে চাহিদার আমদানি ৫০ শতাংশ বেড়ে ৭০ শতাংশ দাঁড়াবে। এরই প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ তম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াকার বুশ (জুনিয়র) আলাস্কায় তেল সন্ধানের অনুমতির জন্য সেনেটের দ্বারস্থ। এ কারণে মধ্যএশিয়ায় সম্ভাব্য জ্বালানি উৎস এবং পরিবহন করিডরের কাছাকাছি সন্ত্রাস নিরোধের নামে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যএশিয়া অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন রয়েছে।

৩। Jorgen Woulters 'Ibid'.

www.pathagar.com

প্রসঙ্গতঃ কাস্পিয়ান অঞ্চলের বর্তমানে এ বিত্ত বৈভবের অধিকারিত্বে আবির্ভূত হয়েছে একদা সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে পশ্চাদপদ দেশগুলো আর বঞ্চিত হয়েছে রাশিয়া। এসব অঞ্চলে সম্ভাবনা থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐ সম্পদ উত্তোলন করতে সক্ষম হয় নি। এর আরও একটি কারণ ছিল উন্নত প্রযুক্তির অভাব, অর্থে অগ্রগামী পশ্চিমা বিশ্ব, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতা আর শীতল যুদ্ধ।

এ পর্যন্ত এ অঞ্চলের দুটি প্রজাতন্ত্রেই সবচেয়ে বেশি লগ্নি এসেছে, এর মধ্যে আজারবাইজান ছাড়া আর একটি দেশ কাজাকিস্তান। উভয় দেশেই সবচেয়ে বেশি লগ্নিকারী কোম্পানিগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক স্যাভরন (Chevron), এমেকো (Amoco) এবং এক্সন (Exxon) এবং এর সাথে অংশীদারিত্ব রয়েছে ইউরোপসহ রাশিয়া, চীন আর আঞ্চলিক রাষ্ট্র পরিচালিত জ্বালানি কোম্পানিগুলো।

কাস্পিয়ান সাগরের জ্বালানি আর জ্বালানির উৎসকে নিজস্ব আয়ত্তে রাখার যে প্রতিযোগিতা চলছে তা উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ এবং রাশিয়ার জ্বার (CZAR) দের মধ্যের প্রতিযোগিতার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এবারের এ প্রতিযোগিতা সাম্রাজ্য দখলের বদলে জ্বালানি ব্যবসার দখলে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণ এবং চাপ নির্ধারণ করছে রাষ্ট্রীয় সামরিক এবং পররাষ্ট্রনীতি। এর উদাহরণ, অতি সম্প্রতি কাস্পিয়ান অঞ্চলে লগ্নিকারীদের চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র তার পাইপলাইনে লগ্নিকারী এক কোম্পানিকে অবশেষে ১.৬ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ইরানের মধ্যদিয়ে তুরস্ক পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। পারতপক্ষে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ভূ-খণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দিতে অসম্মতি জানিয়ে আসছিল তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্বে ছাড় দিলেও জর্জ বুশের (জুনিয়র) অদূরদর্শী উক্তি 'এক্সিস অব ইভিল' অথবা শয়তানের অক্ষ পরিস্থিতি আরও সংকটময় করেছে। ইরানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সম্ভাবনা আপাতত প্রতিহত হয়েছে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসনের উপরে ইরানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চাপ অব্যাহত রয়েছে।

কাস্পিয়ান অঞ্চলের প্রায় ৯০ ভাগ জ্বালানি সম্পদ রয়েছে তিনটি দেশ আজারবাইজান, কাজাকিস্তান আর তুর্কমেনিস্তানের মধ্যেই সীমিত। আর এসব দেশের দক্ষিণে এবং উত্তরে রয়েছে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান শক্তিশালী প্রতিবেশী। দক্ষিণে ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান আর উত্তরে রাশিয়া।

www.pathagar.com

আট

ককেসাস আর কাস্পিয়ান অঞ্চলের সংঘাত 'চেচনিয়া'

১৯৭৯ সনের ২৫ ডিসেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া যখন দক্ষিণ সীমান্তে আমুদরিয়া নদীর উপরে তাদেরই নির্মিত 'ফ্রেইণ্ডশিপ ব্রিজ' পার হয়ে আফগানিস্তানের মাটিতে প্রবেশ করল সেদিন 'মস্কোর বস্' ব্রেজনেভ বুঝতেও পারেন নি যে, ঐ দশকেই ১৯১৯ সনের ভলসেভিক অভ্যুত্থানে অর্জিত সোসালিস্ট বিশ্বের কবর রচিত হবে। যেসব পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিশ্ব ইতিহাস এবং সভ্যতার বিকাশ নিয়ে পর্যালোচনা করেন তাদের কাছে এখন এটা স্পষ্ট যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানের সাথে মার্কসবাদ যেমনি দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল আর তারই পতনের পর অতি দ্রুত মার্কসবাদ ইতিহাস হতে চলেছে। পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্বের আপাতদৃষ্টিতে জয়ের মধ্যদিয়েই সূচিত হচ্ছে অন্য ধরনের সমাজ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ বিশ্বের প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে প্রয়োজন বেড়ে চলেছে জ্বালানির মত অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের। আর এ কাঁচামালের উৎসের প্রায় ৬০ শতাংশ রয়েছে মুসলিম বিশ্বে, মধ্যপ্রাচ্যে আর মধ্যএশিয়ায়। মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোও মুসলিম প্রধান আর এসব দেশ শাসিত হচ্ছে হয় তথাকথিত ইসলামি এবং পূর্বতন সোসালিস্ট ধ্যানধারণার নেতৃত্বের দ্বারা। আফগান জেহাদ এবং বর্তমান প্রেক্ষিত সবই প্রভাবিত করছে এতদঅঞ্চলকে। এক্ষণে পরিবর্তিত ব্যবস্থা শুধু মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোকেই প্রভাবিত করে নি বরং প্রভাবিত করেছে আশেপাশের বেশ কিছু ক্ষুদ্র এবং মধ্যম আয়তনের ছিটমহলগুলোকে যেগুলো এখনও রাশিয়া এবং অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলো থেকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। এ ছিটমহলগুলো সংঘর্ষে লিপ্ত জাতীয়তাবাদ অথবা ধর্মীয় ভিত্তিতে। বর্তমান বিশ্বের জ্বালানি অর্থনীতির জন্য এসব ছিটমহল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনি একটি অঞ্চলের নাম চেচনিয়া বা চেচেন রিপাবলিক অব

www.pathagar.com

ইচকারিয়া, রাজধানী গ্রোজনি এবং পাল্টানো নাম জোখারগাল, চেচনিয়ার স্বাধীনতাকামী প্রয়াত নেতা জোখার দুদায়েভের নামে রাখা। চেচনিয়া ভৌগোলিক দিক থেকে এক ভূ-বেষ্টিত দেশ। ককেসাস পর্বতরাজিতে অবস্থিত পূর্ব থেকে পশ্চিমে কৃষ্ণ আর কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে ৬০০ মাইল জুড়ে অবস্থিত এ দেশ যা এখনও রাশিয়ার দখলে রয়েছে। চেচনিয়া এবং তৎসংলগ্ন ইঙ্গুস (Ingush) দু'স্থানেই একই গোত্র এবং ধর্মীয় গোষ্ঠির বসবাস। এ অঞ্চলের ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদের অখণ্ডতায় বিভাজনের জন্য স্ট্যালিনের সময় দুটি পৃথক স্বত্ত্বায় ভাগ করা হয়। দু'স্থানেই চেচেন সুন্নি মুসলমানদের বাস। চেচেনদের জনসংখ্যা প্রায় ১.২ মিলিয়ন এবং অন্যদিকে ইঙ্গুসদের সংখ্যা প্রায় একচতুর্থ মিলিয়ন বা আড়াই লাখ। মস্কো থেকে চেচনিয়ার দূরত্ব প্রায় ১০০০ মাইলেরও বেশি দক্ষিণে অবস্থিত। এর দক্ষিণে রয়েছে দাগেস্তান, জর্জিয়া এবং দক্ষিণ ওসেটিয়া (Ossetia) দাগেস্তান পূর্বে এবং উত্তরে, উত্তরে দাগেস্তান ছাড়াও রয়েছে রাশিয়া আর পশ্চিমে উত্তর ওসেটিয়া।

চেচেনরা সুন্নি মুসলমান এবং এদের বেশিরভাগই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং চেচেন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ। চেচেনরা ঘোর সোভিয়েত সোসালিস্ট মতবাদের সময়েও ধর্মের প্রতি আস্থা রেখেই চলেছিল। চেচনিয়ার ইতিহাসও মধ্যএশিয়ার অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের মত বহু শতাব্দীর তবে এসব স্থানেও ইসলাম প্রচার হয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে। ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে অটোমান সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্তির পর থেকে। রাশিয়ার জ্বার (CZAR) সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া দক্ষিণমুখি অভিযান শুরু করলে বেশ কয়েকবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ১৮৫৯ সনে চেচনিয়া সহ ককেসাস অঞ্চল রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করে। ভলসেভিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বছর চেচনিয়া জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন দেশের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। সোভিয়েত সময়ে এ জাতীয়তাবাদকে নস্যাৎ করার জন্য এ ভূ-খন্ডকে দু'ভাগ করা ছাড়াও জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেশান্তরিত করেছিল। চেচনিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হলেও কখনই নির্বাপিত হয় নি। এ জাতীয়তাবাদী চেতনা নতুন করে উজ্জীবিত হওয়া মস্কোর জন্য মাথাব্যথার কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতারা নাৎসী জার্মানির সহযোগিতায় বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করে এবং পরে পুনরায় চেচনিয়ার স্বাধীনচেতা নেতৃবৃন্দ আফগান জেহাদের দশকে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক ঐ জেহাদে যোগ দেবার জন্য পাঠায় এবং এরা জেহাদে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করা ছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধ কৌশলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেয়। এ সময়ে চেচনিয়ার এ বিদ্রোহকে পশ্চিমের অপ্রচ্ছন্ন সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়, উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে আভ্যন্তরীণ চাপে ফেলা।

আফগানিস্তান হতে রাশিয়ার পশ্চাদাপসারণের পর থেকেই চেচনিয়া-মস্কো বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। রাশিয়া চেচনিয়াকে ডাকাতদের রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেয় আর চেচেন নেতা জোখার দুদায়েভকে ককেসাসের গাদ্দাফি বলে আখ্যায়িত করে (জোখার দুদায়েভ বিচ্ছিন্নবাদী নেতা এবং চেচনিয়ার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি এক রহস্যময় অবস্থায় রাশিয়ার কম্পিউটার গাইডেড আকাশ থেকে গ্রাউন্ড মিসাইলের আঘাতে মারা যান)।

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত পশ্চাদাপসারণ শুরু হলে (১৯৮৯ সনে) মধ্যএশিয়া বংশদ্ভূত প্রচুর সৈনিক তাদের অস্ত্রসহ চেচনিয়ায় প্রবেশ করে। এছাড়াও আফগানিস্তানের জেহাদে যোগদানকারী অ-আফগান মুজাহিদরাও জেহাদের শেষ প্রান্তে গ্রোজনি এলাকায় মস্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এসব যোদ্ধাদের একদিকে সৌদিআরব আর অন্যদিকে ইরানের সমর্থনের কারণে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠে। এ যুদ্ধ ক্রমেই দুদায়েভের ইসলামিক বাথ পার্টি প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে স্বাধীন চেচনিয়া রাষ্ট্রের পরিচিতি হয়।

১৯৯১-৯২ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের মুখে চেচনিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রাশিয়ার সৈন্য প্রেরণ শুরু হয় এবং পূর্ণ যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯৯৪ সনে মস্কো দুদায়েভের সাথে আলোচনা শুরু করলে এবং পরে সে আলোচনা ভেঙ্গে গেলে রাশিয়া চেচনিয়ার একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণাকে মেনে না নিয়ে আরও সৈন্য পাঠালে গ্রোজনিতে যুদ্ধ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এ সময়ে সিআইএ তথা যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান তথা মধ্যএশিয়া থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনলে প্রাক্তন আফগান মুজাহিদরা প্রচুর অস্ত্র গ্রোজনিতে পাঠাতে শুরু করে যার মধ্যে আমেরিকার তৈরি স্টিংগার মিসাইলেরও সংযোজন হয়।[১] ১৯৯৪ সনের মধ্যেই রাশিয়া গ্রোজনিতে প্রায় ১৪০,০০০ সৈন্য পাঠায় এবং শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। অনেক রাশিয়ান বিশ্লেষক এ অভিযানকে বরিৎস ইয়ালেতসিনের বড় এক ভুল এবং চেচনিয়াকে দ্বিতীয় আফগানিস্তান বলে আখ্যায়িত করে। আফগান মুজাহিদদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি এবং আফগান জেহাদের সবচেয়ে কট্টর ইসলামপন্থী বলে বিবেচিত হিজবে ইসলামি নেতা গুলবদ্দিন হিকমতইয়ার এ যুদ্ধে

১। John K Cooley 'Unholy Wars' P. 176

www.pathagar.com

লোকবল থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের চালান দেয়। ১৯৯৪–৯৬ পর্যন্ত যুদ্ধে চেচনিয়ার প্রচুর ক্ষতি হয়। প্রায় ৮০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। রাশিয়ার নৃশংসতা নাৎসী জার্মানিকেও হার মানায়।

চেচনিয়ার এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংস্থাগুলো সোচ্চার হয়ে উঠলেও রাশিয়ার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার চেচনিয়ায় রাশিয়ার নীতির বিপক্ষে ছিল কিন্তু আফগানিস্তানে তালেবান এবং আল কায়দা বিরোধী যুদ্ধে রাশিয়ার সমর্থনের কারণে এখন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছে। এমনকি এক সময়ে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো সোচ্চার থাকলেও ২০০২ সনে চেচনিয়ার খবর তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না।

চেচনিয়ায় স্বাধীনতাকামী যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে গ্রোজনি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গ্রোজনিতে আপাতত রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও চেচনিয়াতে এখনও গেরিলা যুদ্ধ শেষ হয় নি। রাশিয়া অবশ্য এ স্বাধীনতা যুদ্ধকে সন্ত্রাসী তৎপরতা বলে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৯ সনের শেষের দিকে গ্রোজনি এবং আশপাশ থেকে প্রায় ২০০,০০০ লোক পালিয়ে পার্শ্ববর্তী ইথিওপিয়ায় (রাশিয়ার এক ছিটমহল) আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

চেচনিয়া নামক অঞ্চলটি রাশিয়ার জন্য একটি ভূ-খণ্ড নয় বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে রাশিয়ার তেল সরবরাহ পথের নিয়ন্ত্রণের ভূ–খণ্ড এবং চেচনিয়ায় নিজস্ব সম্পদের মজুদের স্থান। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪০ সনের পূর্বেও এ অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের তেলের চাহিদার প্রায় ৪৫ শতাংশ সরবরাহ করত।[২] তারপর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইত্যাদির কারণে বর্তমানে মাত্র ১ শতাংশ তেল উৎপাদিত হয়।

১৯৯৬ সনে চেচনিয়া সাময়িকভাবে মস্কোকে পরাজিত করতে সক্ষম হলে খোদ চেচেনদের মধ্যেই বিভেদের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে রাশিয়ার অবরোধের কারণে স্বাধীন চেচনিয়ার (তখনও কোনো রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় নি) আসলান মাসখাদভের সরকার দারুণ অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় পড়ে। এরই মধ্যে ইসলামিক ওয়াহিবিজম চেচনিয়ায় বিভিন্ন বলয়ের সৃষ্টি করে ক্ষেত্রিয় যুদ্ধবাজ নেতাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে সরিয়া আইন জারি করলে সমাজ আরও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আইন–শৃঙ্খলার অব্যবস্থা, চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা আর মাফিয়াদের

২। Ignacio Ramonet 'Chechnya in Chaos' Leader Journal.

www.pathagar.com

শক্তিশালী উত্থানে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। এক কথায় চেচনিয়ার কয়েকশত বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এতে সাধারণ নাগরিকরা এক চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে। ক্রমেই চেচনিয়া অসম্ভবভাবে এক বিভীষিকাময় রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকলে ভূ–খণ্ডের জনগণ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোতে পালিয়ে যায়। রাশিয়া এ দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সনে পুনরায় গ্রোজনি দখল করে। চেচনিয়াকে স্বাধীনতা এবং অতঃপর সহযোগিতা প্রদান না করবার পেছনে প্রধানত তিনটি কারণ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

প্রথমতঃ মে ১৯৯৯ সনে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু এবং জর্জিয়ার সওপসা পাইপলাইন পুনরায় চালু করা হলে মস্কো নিজে এ পাইপলাইনের আওতার বাইরে যায়। উল্লেখ্য, এ পাইপলাইন সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় সহযোগিতায় পুনঃনির্মাণ করা হলে রাশিয়া নিজেকে অবহেলিত মনে করতে থাকে। এরই সাথে আরও একটি পাইপলাইন প্রকল্পের চুক্তি সম্পাদিত হলে অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে মনে করে মস্কো আরও আতঙ্কিত হয়। এ প্রকল্পে তুরস্ক, আজারবাইজান আর জর্জিয়া রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পাশ কেটে বাকু হতে তুরস্কের ভূ-মধ্যসাগরীয় বন্দর পর্যন্ত পাইপলাইনের কাজ হাতে নেয়। মস্কোর নীতিনির্ধারকরা এসব প্রকল্পকে রাশিয়াকে ককেসাস অঞ্চল থেকে তার প্রভাবকে খর্ব করবার প্রয়াস বলে উপলব্ধি করে। এ পাইপলাইনের নিরাপত্তা ক্রমেই ন্যাটোর (NATO) আওতায় আসাতে ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে সে সম্ভাবনা মস্কোকে প্রভাবিত করে।

আগস্ট, ১৯৯৯ সনে আর একটি ঘটনা ঘটে। চেচনিয়ার ওয়াহিবি আন্দোলন প্রসারে দাগেস্তানে প্রবেশকে রাশিয়া স্বাধীন চেচনিয়ার প্রভাব বিস্তারের পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে প্রমাদ গুণে। মস্কো এতদঅঞ্চলে নিজের প্রভাব খর্বিত হবার আশঙ্কায় মরিয়া হয়ে ওঠে।

রাশিয়া আরও শংকিত হয়ে উঠে যখন ১৯৯৯ এর মধ্যভাগে রাশিয়ার কয়েককটি শহরে ভয়াবহ বোমা আক্রমণে প্রায় ৩০০ নাগরিকের প্রাণহানি হয়। বিশেষ কোনো প্রমাণ ছাড়াই এ সন্ত্রাসের জন্য চেচনিয়াকে দায়ী করে। এসব কারণে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন প্রতিকার হিসেবে চেচনিয়ায় পুনরায় আক্রমণ করে গ্রোজনি দখল করে নেয়। রাশিয়া এখন চেচনিয়ায় সর্বশক্তি নিয়োগ

www.pathagar.com

করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে কোনো মূল্যে নস্যাৎ করতে বদ্ধ পরিকর। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনের পর রাশিয়া তার গৃহীত সামরিক অভিযানের বৈধতা খুঁজে পায়। এর মধ্যেই মস্কোর ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা রাশিয়াকে স্বস্তি এনে দেয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাশিয়া বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জোটভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের কাঁধে ভর করে রাশিয়া ককেসাস অঞ্চলে তার প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।[৩]

মানব সভ্যতা বিকাশের সাথে জ্বালানির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। উনিশ শতকে কয়লার ব্যবহার এবং নতুন নতুন উৎসের আবিষ্কার ঘিরে পৃথিবীর তৎকালীন শিল্পোন্নত দেশগুলো অনগ্রসর দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর শিল্পে পিছিয়ে পড়া দেশগুলো হয় শৃঙ্খলিত হয়েছে অথবা সম্পূর্ণভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর মুখাপেক্ষি হয়ে রয়েছে। অনগ্রসর দেশগুলো শক্তিশালী দেশ দ্বারা শোষিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কয়লার পরিবর্তে তেলের ব্যবহার সমগ্র বিশ্বে শিল্প তথা পরিবহন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। এসব পরিবর্তন আর তেলের উৎস ঘিরে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে নতুনভাবে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ঐ সময়ে উপনিবেশবাদের শেষ লগ্ন তাই সরাসরি উপনিবেশ তৈরি না করে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার আরও লাভজনক বিবেচিত হলে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী দু'বলয়ে ভাগ হয়ে গেলে পশ্চিমা তথা পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতৃত্ব নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোসালিস্ট বিশ্বের নেতৃত্ব বর্তায় সোভিয়েত রাশিয়ার উপর। প্রায় পঞ্চাশ বছর এ দুয়ের মধ্যে শীতল যুদ্ধ চললেও এ দু'বলয়ের বহু অনুগামী দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ, ক্ষমতা দখলের জন্য অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান এবং আন্তঃরাষ্ট্র যুদ্ধও হয়। আর এসবের পেছনে এ দুই পরাশক্তির প্রভাব বিস্তারের কারণই চিহ্নিত হয়। শক্তি পরীক্ষা আর দ্রুত শিল্প ও প্রযুক্তি উন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ পিছিয়ে পড়ার বহু কারণের মধ্যে একটি সস্তা এবং সহজলভ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির অভাব। আজও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরি রাশিয়া এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রয়োজনীয় জ্বালানি বহিঃবিশ্ব থেকে কমই আমদানি হতো। সোভিয়েত রাশিয়ার তেল বলতেই

৩। Jean Radvany 'Sale Gurre en Tchetchenie' in Atlas 2000 des Conflicts' Manier de voir No. 49, January 2000.

www.pathagar.com

ককেসাস অঞ্চলের তেলকেই বুঝাতো। আর ককেসাস অঞ্চল এককালীন সাম্রাজ্যবাদ জ্বারদের দ্বারা শাসিত রাশিয়ার সবচেয়ে বড় উপহার ছিল। পরবর্তীতে স্টালিনের সময়ে এসব অঞ্চল আক্ষরিকভাবে কুক্ষিগত করা হয়। সোসালিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বিকাশের উৎস ছিল তেল প্রাপ্তির উপর। রাশিয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ সম্পদের এ সমাহার তাকে বাহিরের মুখাপেক্ষি করে নি। তাই ককেসাস অঞ্চলের বাকু, গ্রোজনি, এম্বা এবং মিকোপ হয়ে ওঠে রাশিয়ার জন্য উপসাগরীয় দেশের মত সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই সমগ্র শীতল যুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভশীল ছিল বেশি। বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও মস্কো তার আভ্যন্তরীণ সম্পদ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক জ্বালানির উপাদানের উৎসগুলোকে যথাসম্ভব সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে অথবা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়াসরত এবং প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহারেও কুণ্ঠিত নয় যেমনটা চেচনিয়ার ব্যাপারে প্রতীয়মান। চেচনিয়া রাশিয়ার নিকট অর্থনৈতিক ও কৌশলগত কারণে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ আর তাই চেচনিয়াকে ধর্ম প্রভাবিত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া দেখতে আগ্রহী নয়।

উপরের বক্তব্যের আলোকে রাশিয়ার নিকট চেচনিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

সমষ্টিগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট তেলের উৎপাদন ছিল তৎকালীন বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্ধেক। এরপরে যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ তেলের উৎপাদন সহ পৃথিবীর সমস্ত তেল উৎপাদন ক্ষেত্রে অধিক উত্তোলন, সঞ্চালন এবং খোদ রাশিয়ার উত্তোলন কমে যাওয়ায় ক্রমেই সোভিয়েত ইউনিয়নের তেলের উৎপাদন বিশ্বের মোট উৎপাদনের বিশ শতাংশে নেমে আসে। এর পরে ১৯৫০ এর সময়ে উরাল–ভল্গা তেল ক্ষেত্র এবং পরে পশ্চিম সাইবেরিয়ায় নতুন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলো থেকে উত্তোলন শুরু হলে রাশিয়ার উৎপাদন শতকরা সাত ভাগ বৃদ্ধি পায়।

এসব খতিয়ানের মধ্যে যে সব অঞ্চলের জ্বালানি সম্পদ প্রধান ভূমিকা রাখে তারমধ্যে আজারবাইজানের বাকু অঞ্চলের পরেই গ্রোজনির নাম আসে। উল্লেখ্য, ভলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে গ্রোজনি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেল ক্ষেত্র। গ্রোজনি অঞ্চলে ১৮৩৩ সনের দিকে তেলের আবিষ্কার হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক উৎপাদন শুরু করে ১৯৮৩ সনে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই

www.pathagar.com

রাশিয়ায় রেভ্যুউলিশনের পূর্বের উৎপাদ দিনপ্রতি ৩৩,৪০০ ব্যারেল ছাড়িয়ে যায়।

এসব অঞ্চলের তেল উত্তোলন ক্ষেত্রে রাশিয়া বিদেশী লগ্নি নিতে কুণ্ঠিত হয় নি। এ কারণে ভলসেভিক আন্দোলনের আগ পর্যন্ত তৎকালীন রাশিয়ার তেল ক্ষেত্রে লগ্নির মোট ২১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ১০৩০ মিলিয়নই ছিল বৈদেশিক লগ্নি।

যুক্তরাজ্য ঐ সময়ে রাশিয়াতে লগ্নির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল। যুক্তরাজ্যের একক লগ্নি ছিল মোট লগ্নিকৃত অর্থের ষাট শতাংশ। তৎকালীন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর মজবুত অর্থব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়ার মত অঞ্চলে লগ্নিতে উৎসাহিত করেছিল। শুধু তাই নয়, তেল আবিষ্কার, উত্তোলন এবং পরিশোধনের ক্ষেত্রে বৃটিশ প্রযুক্তিই ছিল তৎকালীন সময়ের সেরা প্রযুক্তি। কাজেই এসব অঞ্চলের তেল ক্ষেত্রেও বৃটিশ লগ্নি অধিক হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ঐ সময়ে গ্রোজনি (চেচনিয়া) অঞ্চলে বৃটিশ লগ্নি দাঁড়িয়েছিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগে আর এসব তেল ক্ষেত্রে লগ্নির পরিমাণ ছিল নব্বই শতাংশ। তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে বৃটিশ প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করবার মত অবস্থায় ছিলনা।[৪]

চেচনিয়া, বিশেষ করে গ্রোজনি অঞ্চল তেল উৎপাদনের জন্য যত কম বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পরিগণিত হোক না কেন এ অঞ্চল পাইপলাইনের নিয়ন্ত্রণ এবং পরিক্ষীত সংক্ষিপ্ত পরিবহনের ক্ষেত্র হিসেবে ততধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় উত্তর দক্ষিণ যোগাযোগের কারণে। গ্রোজনি অঞ্চল শুধু ককেসাস অঞ্চলের উত্তর দক্ষিণ তেল সঞ্চালনই নিয়ন্ত্রণ করে না বরং প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পুরাতন পাইপলাইনগুলোও নিয়ন্ত্রণ করে। চেচনিয়ায় রাশিয়ার সামরিক অভিযানের সফলতা মূলত এ কারণেই। বিশেষ করে বেশ কয়েকটি প্রকল্প যা বাস্তবায়নাধীন হতে বাকি রয়েছে সেগুলোই চেচনিয়ার পথ অতিক্রম করবার কথা। এসব প্রকল্প শুধু উত্তর দক্ষিণেই সীমাবদ্ধ নয়, উত্তর পূর্বেও বিস্তৃত। এমনকি কয়েকটি প্রকল্পের মধ্যে একটি তেনগিজ, কাজাকিস্তান হতে রাশিয়া হয়ে কৃষ্ণ সাগরের বন্দর নভোরোসিস্ক পর্যন্ত। আরও যে পরিবহন পথগুলো পরীক্ষাধীন রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি যেগুলো বাহ্যত চেচনিয়া ভূ-খণ্ডের মধ্য দিয়ে না গেলেও মোটামুটি চেচনিয়ার আওতার মধ্যেই

৪। Robert E E bel 'The History and Politics of Chechen oil' Centre for Strategic and international Studies, Washington Publication.

www.pathagar.com

থাকবে। কাজেই একটি স্বাধীন বৈরিভাবাপন্ন চেচনিয়া ভবিষ্যতে এসব পাইপলাইনের জন্য হুমকি হয়ে থাকবে তাতে অন্তত মস্কোর কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া বিগত শতাব্দীতে গ্রোজনি অঞ্চলে বেশ কতগুলো তেল পরিশোধনাগারও গড়ে উঠেছে যেগুলোতে গ্রোজনিতে শোধনের পর বাকুতে পরিবহন করা হতো আবার তিকোরেতস্ক থেকে বাকু পরিশোধনাগারে সঞ্চালন করা হতো এবং আজও চলমান রয়েছে। বর্তমানে বাকু অঞ্চলে যেসব পশ্চিমা লগ্নিকারী কোম্পানিগুলো রাশিয়াকে পরিশোধিত তেল সরবরাহের চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের জন্যও নিরাপদ চেচনিয়া অঞ্চলের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় রাশিয়া যদি চেচনিয়া অঞ্চলে নিরাপত্তা দিতে অপারগ হয় তবে সেক্ষেত্রে এসব পশ্চিমা লগ্নিকারী কোম্পানিগুলো তুরস্কের ভূ-খণ্ড দিয়ে উৎপাদিত তেল রপ্তানি করবে আর সেটা হবে রাশিয়ার জন্য অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর।

পাইপলাইনে তেল এবং গ্যাসের প্রেক্ষিতে চেচনিয়ার অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান পরিস্থিতি অনুকূলে নয়। রাশিয়ার জন্য চেচনিয়া যেমন রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু পরিবহন মাশুলের প্রাপ্তির ব্যাপারটিই নয় বরং ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ চেচনিয়াকে রাশিয়ার রাজনৈতিক এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে চেচনিয়া ভবিষ্যতের প্রাক সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর আফগানিস্তানে পরিণত হতে পারে বলে বর্তমানে শুধু রাশিয়াই নয় পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রও শংকিত। রাজনৈতিকভাবে রাশিয়া চেচনিয়ার সমস্যা সমাধান করলেও সামরিক উপস্থিতি রাখতে চাইবে কারণ মস্কো ভালো করেই উপলব্ধি করেছে যে, চেচনিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যুগেযুগে, সময়ে সময়ে স্তিমিত হলেও কখনই শেষ করা সম্ভব হয় নি। এক জোখার দুদায়েভকে হত্যা করলেও চেচেনদের মধ্যে ভবিষ্যতে আর কোনো দুদায়েভের* জন্ম হবে না এমন নিশ্চয়তা অন্তত ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় নি।

---

* পাদটীকা ঃ ১৯৯৬ সনে রাশিয়ার মিসাইল হামলায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্বাধীন চেচনিয়ার ঘোষক এবং রাষ্ট্রপতি জোখার দুদায়েভ রাশিয়া হতে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবেন এবং যুগে যুগে চেচেনদের অনুপ্রেরণা যোগাবেন।

দুদায়েভের জন্ম ১৯৪৪ সনে এবং ঐ বছরেই স্টালিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ৮০,০০০ চেচেন মুসলমানদের কাজাকিস্তান সহ অন্যান্য স্থানে পাঠিয়েছিল দুদায়েভের পরিবার তাদের মধ্যে এক উদ্বাস্তু পরিবার। স্টালিন চেচেনদের নাৎসী জার্মানির সাথে সম্ভাব্য সহযোগিতা নস্যাৎ করবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যএশিয়ায় অর্থলগ্নিকারী কোম্পানিগুলোর জন্য আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ তেমনি চেচনিয়ার এবং পশ্চিমা ঘেষাঁ স্থিতিশীলতা অধিক প্রয়োজনীয়। চেচনিয়া এবং আফগানিস্তান উভয়ের ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের উপরেই নির্ভর করছে অন্যান্য মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্রে জ্বালানি ক্ষেত্রে বিশাল লগ্নির ভবিষ্যৎ। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে দেশটি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে সেটি হলো ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র। তাই ইরান 'শয়তানের অক্ষের' অক্ষভুক্ত এক শক্তিশালী দেশ।

দুদায়েভের শৈশব কাটে কাজাকিস্তানে চেচনিয়ার উদ্বাস্তু হিসেবে। পরে সোভিয়েত মিলিটারি একাডেমিতে পড়পশুনার সময়ে জনৈক রাশিয়ান মহিলার পাণি প্রার্থী হন। ১৯৭৪ সনে ইউরি গ্যাগরিন বিমানবাহিনী একাডেমি হতে স্নাতক ডিগ্রির পর সোভিয়েত বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৮৭-৯০ পর্যন্ত সোভিয়েত বোম্বর ডিভিশনের কমাণ্ডার হিসেবে ইস্তনিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দুদায়েভ এখন পর্যন্ত চেচেন বংশদ্ভুত একমাত্র মেজর জেনারেল। ইস্তনিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হলে দুদায়েভ তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশ নিতে রাজি না হলে তার ডিভিশনকে ১৯৯০ সনে ইস্তনিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। এর পরপরই দুদায়েভকে সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দিলে তিনি চেচনিয়ায় তার পূর্বতন স্থানে বসবাস করতে চলে আসেন। ততদিনে চেচনিয়াও স্বায়ত্বশাসন হতে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। দুদায়েভ ন্যাশনাল কংগ্রেস অব চেচেন পিপলস্ নামক রাজনৈতিক দলে যোগদান করে নেতৃত্বের শিখরে উঠে আসেন। ১৯৯১ সনে মস্কোতে মিখাইয়েল গর্বাচভের বিরুদ্ধে এক নিস্ফল অভ্যুত্থানের সময়েই দুদায়েভ চেচনিয়ায় এবং অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে চেচেন ইঙ্গুস স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্রের মস্কোপন্থী সরকারকে উৎখাত করেন। তিনি একতরফাভাবে চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এবং দুদায়েভের হত্যার মধ্য দিয়ে বরিতস্ ইয়ালেতসিনের প্রথম পর্বের সামরিক অভিযানের ইতি হয়। দুদায়েভ নিজেকে চেচেন কিংবদন্তি ঐতিহাসিক ইসলামিক নেতা ইসমাইল সামিলকে* নিজের আদর্শ বলে মনে করতেন এবং ইসমাইল সামিলের আদলে নিজেকে চেচেনদের সামনে হাজির করতে চেষ্টা করেন। ইসমাইল সামিল চেচনিয়ার স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন এবং অবশেষে ১৮৬৪ সনে জ্বারদের বাহিনীর হাতে পরাস্ত হন। রাশিয়া দুদায়েভকে একজন বিদ্রোহী মাফিয়া নেতা ছাড়া আর কোনোভাবেই স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু চেচেনদের নিকট দুদায়েভ দ্বিতীয় ইসমাইল সামিল হয়ে থাকবেন।

*পাদটীকা-২ ঃ ওহাবি আন্দোলন তথা দাগেস্তান এবং চেচনিয়ার অন্যতম ঐতিহাসিক কিংবদন্তি র নেতা ইসমাইল সামিল প্রায় ২৫ বছর ককেসাস অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন। আর এর ফলেই তৎকালীন রাশিয়ার জন্য এতদঅঞ্চল জয় করা সহজ হয়ে উঠে নি।

আনুমানিক ১৭৯৭ সনে জন্মগ্রহণকারী একজন উচ্চবিত্তের পুত্র সামিল ব্যাকরণ, লজিক, ইতিহাস এবং আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের মধ্য দিয়ে একজন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি হিসেবে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ১৮৩০ সনে ঐ সময় চলমান মুরদিস, সুফিইজম বা সুফিবাদে যোগ দেন। ঐ সময়কার বিখ্যাত দরবেশ সুফি গাজী মাহমুদের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'জেহাদে' শরিক হন। ইতিমধ্যেই রাশিয়া ১৮১৩ সনে ইরান থেকে দাগেস্তানে সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে জয় করে রাশিয়ার

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করলে এ জেহাদের সূচনা হয়। গাজী মাহমুদকে রাশিয়া ১৮৩২ সনে হত্যা করলে গামজাদ বেক তার স্থলাভিষিক্ত হন। এর দু'বছরের মাথাতেই ১৮৩৪ সনে গামজাদ তারই সহচর দ্বারা নিহত হলে সামিলকে দাগেস্তানের তৃতীয় ইমাম হিসেবে বিবেচিত করা হয়।

সামিল ১৮৩৪ সনেই দাগেস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলে তার প্রভাব চেচনিয়া পর্যন্ত বিস্তার করেন। ক্রমেই তিনি বিশাল বাহিনী গড়ে তুলে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ঝটিকা হামলা শুরু করেন। কিন্তু এ অভিযান চালিয়ে সফলা অর্জন তো করতে পারেন নি বরং প্রতি অভিযানেই রাশিয়ায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হন। ১৮৫৭ সনে রাশিয়া পুনরায় সমস্ত শক্তি দিয়ে সামিলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। ততদিনে সামিল কিংবদন্তি নেতা হিসেবে শুধু রাশিয়াতেই নয় সমগ্র পূর্ব ইউরোপেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। সামিল তখন রাশিয়ার পরাক্রমশালী জ্বার সাম্রাজ্যের জন্য আতঙ্ক। অবশেষে বৃহৎ শক্তি রাশিয়ার সাথে ২৫ বছরের যুদ্ধের পর ২৫ আগস্ট ১৮৫৯ সনে সামিলের বাহিনী রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সামিলকে বন্দি অবস্থায় সেন্টপিটার্সবার্গে নিয়ে এলে তাকে মস্কোর দক্ষিণে কালগা নামক জায়গায় দেশান্ত রিত করে। পরে তৎকালীন রাশিয়ার জ্বার শাসকদের নিকট অনুমতি সাপেক্ষে ১৮৭০ সনে মক্কায় পবিত্র হজ্ব পালন করেন এবং ১৮৭১ সনে তিনি পবিত্র মদিনা নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আজও দাগেস্তান আর চেচনিয়ার ঐতিহাসিক বীরগাঁথায় যে নামটি প্রথম উচ্চারিত তার নাম ইমাম ইসমাইল সামিল। আজও রাশিয়ার কাছে ইসমাইল সামিল দাগেস্তান তথা চেচনিয়ার জাতীয়তাবাদের চেতনা হিসেবে আতঙ্কের নাম।

Encyclopedia Britannica 1994 - 2002.

www.pathagar.com

নয়

কাস্পিয়ান অঞ্চলের একটি সমীক্ষা

কাস্পিয়ান অঞ্চলের তেল এবং গ্যাস নিয়ে বর্তমান সংঘাত, সম্ভাবনা এবং আন্তরাষ্ট্র টানাপড়েন আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এ অঞ্চলের সম্পদ এবং এর স্থানান্তর, রপ্তানি পরিস্থিতির পর্যালোচনার প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয়। বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যতে সংঘাত এ কাস্পিয়ান সাগরের সম্পদ ঘিরেই হবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। এ অঞ্চলের দক্ষিণেই রয়েছে কয়েকটি দেশ যেগুলোর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং বহিঃবিশ্বের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখা যায় না। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান আর দক্ষিণ পশ্চিমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ তুরস্ক। তুরস্কের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বহু বছর ধরেই অস্থির। তুরস্কে ইসলামের পুনঃজাগরণ ঠেকাতে সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবীদ এবং সামরিক বাহিনী অত্যন্ত তৎপর। তবে তুরস্কে কুর্দি অসন্তোষ চলমান এবং ভবিষ্যতে তা তুরস্কের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে।

ইরাকের সাথে পশ্চিমের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত এক নতুন আঙ্গিকে মোড় নিচ্ছে। ২০০২ সনে যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসনের একমাত্র প্রত্যয় ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেনের উৎখাত এবং ইরাককে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। এতে ইরাক এবং এতদঅঞ্চলের জ্বালানির উৎসগুলোর পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হবে। সাদ্দাম হোসেনের রাজনৈতিক উত্থান যত চমকপ্রদ পতনও ততই নিষ্ঠুর হবে বলেই অনুমেয়। সাদ্দাম হোসেনের অস্বাভাবিক পতন এ অঞ্চলের অস্থিরতা বাড়াবেই এবং অদূর ভবিষ্যতে তা কমবে বলে মনে হয় না।

ইরানের আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সে দেশে ইসলামিক অভ্যুত্থানের পর থেকে উন্মুক্ত হলেও একদিকে পশ্চিমের সাথে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উন্নতি তো

www.pathagar.com

হয়ই নি বরং যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ তম রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'শয়তানের অক্ষ' (Axis of Evil) এর এক শয়তানে পরিগণিত। শয়তানের অক্ষ বলে কথিত আরও দুটি রাষ্ট্র চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে রয়েছে পার্শ্ববর্তী ইরাক আর দূরপ্রাচ্যের চীন ঘেঁষা কমিউনিস্টপন্থী উত্তর কোরিয়া। ইরানের সাথে এককালের ঘনিষ্ট মিত্র পাকিস্তানের সম্পর্কে চীর ধরেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখল এবং সিআইএ ও আইএসআই কর্তৃক আফগান জেহাদ শুরু করবার পর থেকেই। যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান উভয়েই পাকিস্তান এবং ইরান সমর্থিত মুজাহিদদের একপ্রকার কোণঠাসা করে সমগ্র জেহাদ পরিচালনা করে। এর পরেও তাজিক এবং শিয়া সমর্থিত বোরহানউদ্দিন রব্বানীর সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে পাকিস্তানের পশতুন নেতা গুলবদ্দিনের সমর্থকদের ইরান ভালো চোখে দেখে নি। ইরানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও খারাপ হয় আফগানিস্তানে ওয়াহাবি পশতুন গোষ্ঠি তালেবানদের উত্থানের পর থেকে। বিশেষ করে ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান এবং উজবেক নেতা দোস্তামের সহায়তায় হেরাত দখল এবং ইরান সমর্থিত হেরাত অঞ্চলের যুদ্ধবাজ নেতা ইসমায়েল খাঁর উৎখাতের পর হতে। হেরাত দখলের পর তালেবানরা শিয়াদের উপর অত্যাচার এবং হত্যাযজ্ঞ চালালে এ সম্পর্ক আরও খারাপের দিকে যায়।

১৯৯৮ সনের আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ্ আলী খামেনী পাকিস্তান আর যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে তালেবানদের ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ আনলে পাক-ইরান সম্পর্কের আরও অবনতি হয়। সেপ্টেম্বরের দিকে ইরান তালেবানদের বিরুদ্ধে পূর্ব সীমান্তে প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য সমাবেশ করলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে উত্তেজনা হ্রাসের আহ্বান জানালেও পাক-ইরান সম্পর্কের কোনো উন্নতি হয় নি। সেই থেকে ইরান তালেবানদের বিরুদ্ধে উত্তর জোটকে সমর্থন দিয়ে আসছিল।

এছাড়াও ১৯৯৬ সন থেকে ট্রান্স–আফগান গ্যাস পাইপলাইনের প্রকল্প নিয়েও ইরানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের টানাপড়েন লক্ষণীয় ছিল।

ইরানের সাথে কাস্পিয়ান জলসীমা চিহ্নিত করার বিষয় নিয়ে ইরান সংলগ্ন মধ্যএশিয়ার দেশগুলোর সাথে এখনও সমঝোতা হতে পারে নি বিশেষ করে ইরান আর আজারবাইজানের সাথে। ২০০২ সনের মে মাসেও এ দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকেও এ সমস্যার কোনো সুরাহা হয় নি। বরং আজারবাইজান কাস্পিয়ান সাগরে ইরানের শক্তিশালী নৌবাহিনীর তৎপরতা নিয়ে বহুবার উদ্বেগ

www.pathagar.com

প্রকাশ করেছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সার্বিকভাবে ইরানের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেনের উপরে জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে এখন পর্যন্ত রাজি নয়। এসব কারণেই, স্বল্প দূরত্ব হলেও ইরানের মধ্যদিয়ে কাস্পিয়ান সাগরীয় অঞ্চলের জ্বালানি পরিবহনের পরিকল্পনা বাধাগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে।

উপরের আলোচনার আলোকে এটাই প্রতীয়মান যে, মধ্যএশিয়ার জ্বালানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর ভবিষ্যৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বর্তমানে আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে অত্যন্ত মন্থর গতিতে এগুচ্ছে। এ জ্বালানিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে মধ্যএশিয়ায় বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মার্কিন এবং ইউরোপীয় সামরিক উপস্থিতি মধ্যএশিয়ার ইতিহাসে ৩২৪ খৃস্টপূর্বে আলেকজান্ডারের সামরিক উপস্থিতির আড়াই হাজার বছর পর এই প্রথম। আর এ উপস্থিতির পেছনে রয়েছে জ্বালানি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের লগ্নির নিশ্চয়তা প্রদান এবং বাজারজাতকরণকে আয়ত্তে আনার নিশ্চিত প্রয়াস।

এ পর্যায়ে বিশেষত বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি, ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী জ্বালানির চাহিদা এর উৎস ঘিরে বিভিন্ন ধরনের সংঘাত ইত্যাদির আলোকে মধ্যএশিয়া হতে জ্বালানি রপ্তানি এবং পরিবহন সমস্যার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করছি।

কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে অধিক পরিমাণ লগ্নি ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন এবং অধিক উৎপাদনের কারণে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্তও বাড়ছে। ২০০০ সনেই কাজাকিস্তান দিনপ্রতি ৪৫৭,০০০ ব্যারেল এবং আজারবাইজান দিনপ্রতি ১১৫,০০০ ব্যারেল তেল রপ্তানি করেছে। ঐ বছরেই সমগ্র কাস্পিয়ান অঞ্চলের মোট উৎপাদন দিনপ্রতি ১.৩ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে দিনপ্রতি ৮০০,০০০ ব্যারেল রপ্তানি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, এ উৎপাদনের ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১০ সনের মধ্যে মোট উৎপাদন গিয়ে দাঁড়াবে দিনপ্রতি ৩ মিলিয়ন ব্যারেলে আর ২০২০ সনের মধ্যে তা আরও বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে দিনপ্রতি ৫ মিলিয়ন ব্যারেলে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে উৎপাদন বাড়ছে তবে প্রয়োজনীয় পরিবহনের অপ্রতুলতার কারণ এখনও এর রপ্তানি তেলের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদনে তুর্কমেনিস্তানই এগিয়ে রয়েছে। ২০০০ সনে তুর্কমেন গ্যাসের রপ্তানির পরিমাণই ছিল ১.২

www.pathagar.com

ট্রিলিয়ন ঘনফুট আর সমগ্র কাস্পিয়ানের অন্যান্য দেশগুলোর রপ্তানি ছিল ৯৪০ বিলিয়ন ঘনফুট। উল্লেখ্য, আজারবাইজান এবং কাজাকিস্তান এখনও পুরোমাত্রায় গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়ন সাধন করে নি। শুধুমাত্র আজারবাইজানের শাহ–ডেনিজ ক্ষেত্রের উন্নয়ন করলে ও পরিবহনের বিষয়গুলোর আংশিক সুরাহা হলে এবং বর্ধিত লগ্নির আঙ্গিকে ২০২০ সনের মধ্যে আনুমানিক ২–৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবার সম্ভাবনা আছে।

কাস্পিয়ান অঞ্চলের তেল-গ্যাসের বর্ধিত উত্তোলন এবং সঠিক বাজারজাত করার বিষয়ে বর্তমান সমস্যার বহুদিক রয়েছে। এর কিছু কিছু আমরা পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। তবে এর সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা রাখবার চেষ্টা করছি। এ অঞ্চলের জ্বালানির বর্ধিত উত্তোলনের পূর্বেই বাজারজাত করণের সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য প্রথমেই পদক্ষেপ নিতে হবে। যদিও কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছে তবে পর্যাপ্ত নয়।

রাশিয়ার সাথে এতদঅঞ্চলের দেশগুলোর ১৯৯১–৯৭ পর্যন্ত রপ্তানিকৃত জ্বালানির বিশ্ববাজার সমতুল্য মূল্য না পাওয়া এবং বকেয়া পরিশোধে অপারগতা প্রদর্শনের কারণে কাস্পিয়ান অঞ্চলের দেশগুলো রাশিয়ায় এবং সাবেক রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্বতন পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি রপ্তানিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সদ্য স্বাধীন প্রজাতন্ত্রগুলোতেও পূর্বের পাইপলাইন দ্বারা সরবরাহ করতে আগ্রহী নয় কারণ রাশিয়ার অভ্যন্তরের পাইপলাইনগুলো মস্কো সরকারের নিয়ন্ত্রিত 'গ্যাজপ্রম' (Gazprom) দ্বারা পরিচালিত। এক্ষেত্রে সরবরাহে প্রথমতঃ কাস্পিয়ান অঞ্চলের আঞ্চলিক কোম্পানিগুলো বঞ্চিত হবে, দ্বিতীয়তঃ গ্যাজপ্রম অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে আন্তর্জাতিক মূল্যে চুক্তি সম্পাদনেও আগ্রহী নয়।

প্রধানতঃ এসব কারণেই কাস্পিয়ান অঞ্চলের জন্য গ্যাস রপ্তানির দুটি পথই খোলা রয়েছে। প্রথমত গ্যাজপ্রমের নিকট আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে গ্যাস বিক্রি করা অথবা গ্যাজপ্রমকে রয়ালিটি দিয়ে রাশিয়ার প্রজাতন্ত্রের কাছে রপ্তানি করা। উভয় ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সামলাতে হবে। কাজেই আন্তর্জাতিক বাজার দর এবং অর্থ পেতে হলে কাস্পিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোকে বিকল্প পথের চিন্তা করতেই হবে। কাজেই ক্রমবর্ধমান উত্তোলন এবং নতুন ক্ষেত্রগুলো সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে উদ্বৃত্ত তেল এবং গ্যাস রপ্তানি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে সাথে দারিদ্রপীড়িত একদা অবহেলিত

www.pathagar.com

এসব অঞ্চল হঠাৎ প্রচুর অর্থ আর বৈভবের জন্য ভবিষ্যতে যে কোনো অবস্থাতেই রপ্তানির জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় কোন বাজারে রপ্তানি করা অর্থ এবং নিরাপত্তার দিক থেকে নিশ্চিত হবে।

ট্রাসেকা (TRACECA : Transport System-Europe-Caucasus-Asia) পূর্বের ঐতিহাসিক সিল্ক রুট। ১৯৯৩ সনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ককেসাস ও কাস্পিয়ান জ্বালানি সম্পদ উন্নয়ন এবং পশ্চিম-পূর্ব করিডর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউরোপ হতে কৃষ্ণসাগর হয়ে ককেসাস এবং কাস্পিয়ান অঞ্চল হয়ে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত যোগ করবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তেমনিভাবে ১৯৯৮ সনে বারটি দেশ আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা বাকু ডিক্লারেশন বলে পরিচিত। এ সিদ্ধান্তে বলা হয়, এসব দেশের মধ্যে নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জ্বালানি পরিবহনের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য একযোগে কাজ করবে। এ বারটি দেশের মধ্যে অন্যতম হলো আজারবাইজান, বুলগেরিয়া, কাজাকিস্তান, রোমানিয়া, তুরস্ক এবং উজবেকিস্তান সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দেশ সমূহ। এ বৈঠকেই পূর্বের আলোচিত প্রধান পাইপলাইন বাকু– চেহেনকে প্রধান সরবরাহ পথ ধরা হয়। অবশ্য এ পাইপলাইনের রপ্তানির গন্তব্যস্থান ইউরোপ। এছাড়াও ইউরোপের জন্য আরও কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

কাস্পিয়ান তটের জ্বালানির বাজার ইউরোপ, না পূর্বের এশিয়ার ভূ-খন্ড এ নিয়ে প্রচুর সমীক্ষা চলেছে এবং এখনও চলছে। বিশ্বের জ্বালানি ব্যবসায় জড়িত বিশেষজ্ঞদের মতে এশিয়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ইউরোপের তুলনায় এশিয়ার বাজার অপেক্ষাকৃত লাভজনক হবে তাতে সন্দেহ নেই। উন্মুক্ত বিশ্ববাজার ব্যবস্থায় এশিয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যে কয়েক শতাংশ বেশি তাতে এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় ধারণা রয়েছে। এসব বিশেষজ্ঞদের মতে যেখানে আগামী ১০-১৫ বছরে ইউরোপের তেলের চাহিদা মাত্র ১ মিলিয়ন ব্যারেল দিনপ্রতি বাড়াবার সম্ভাবনা সেখানে পূর্ব দিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন ব্যারেল। তবে সমস্যা হলো যে, এ বাজারে প্রবেশ করতে হলে অনেক লম্বা এবং সংঘাতময় পরিবেশের মধ্যদিয়ে পরিবহন করিডর বের করতে হবে এবং তাও আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করবার প্রয়োজন। এ পরিবহনের জন্য ইউরোপীয় অঞ্চলের তুলনায় খরচ পড়বে কয়েকগুণ বেশি।

www.pathagar.com

এশিয়ার বাজারে কাস্পিয়ান অঞ্চলের তেল এবং গ্যাসের পরিবহনের সংক্ষিপ্ত পথ হচ্ছে সরাসরি দক্ষিণমুখি। এর মানে হচ্ছে হয় ইরান অথবা আফগানিস্তান–পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে এশিয়ার বাজারে প্রবেশ যা হবে দুঃস্বপ্নের মত। এ ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত তুর্কমেনিস্তান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আর ইরানের পথে আজারবাইজান, উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানের জ্বালানির পথ রয়েছে সরাসরি উপসাগরের দিকে অথবা দক্ষিণ পূর্বমুখি পাকিস্তানের ভূ-খন্ডের ভেতর দিয়ে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের ভূ-খন্ড ব্যবহার অন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড় করাবে, সেক্ষেত্রে আফগানিস্তান–পাকিস্তান হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক পথ।

রাশিয়ার পুরাতন এবং নতুন পাইপলাইনের সমন্বয়ে উত্তর পশ্চিমে বাল্টিক এবং কৃষ্ণসাগরের পথ। ডিসেম্বর ২০০১ সন থেকে রাশিয়ার বাল্টিক পাইপলাইন সিস্টেম কার্যকর করা হয়েছে। এ পরিবহন করিডর ক্রোশিয়া এককালীন পূর্বইউরোপে জ্বালানি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

এসব পরিকল্পিত পথগুলোতেই সমস্যা রয়েছে যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করবার প্রচষ্টায় রত রয়েছে পৃথিবীর বৃহৎ লগ্নিকারী দেশগুলো। রাশিয়ার অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে কাস্পিয়ান অঞ্চলের জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলো ঐ পথ ব্যবহারে ভরসা পাচ্ছে না। অন্যদিকে তুরস্ক বসফরাস প্রণালী দিয়ে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান তেলের জাহাজগুলোর যাতায়াতের কারণে পরিবেশ দূষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত। দক্ষিণের সংঘাতের বিস্তারিত কিছুটা আলোচনা আগেও করেছি। আফগানিস্তান থেকে তালেবানরা বিতাড়িত হলেও বিগত ২৩ বছরের অস্থিরতা কাটাতে এ ভূ–খন্ডকে আরও বহুবছর আভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্যে থাকতে হতে পারে। আজারবাইজান, আরমেনিয়া, নাগারনো–কারাবাগ, চেচনিয়া এবং জর্জিয়ার ওসেটিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সহজে প্রশমিত হবার নয়। উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানের বর্তমান সরকার বিরোধীরা সে দেশের সরকারকে উৎখাত করবার চেষ্টায় রত। এর উপরে রয়েছে এসব অঞ্চলে ধর্মীয় মৌলবাদের দ্রুত প্রসার আর চলমান সংঘাত।

দক্ষিণ এশিয়া ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রয়েছে। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে বিবাদমান দুটি দেশ ভারত আর পাকিস্তানের রণসম্ভারে যুক্ত হয়েছে পারমাণবিক মারণাস্ত্র। দু'দেশের ইতিহাসে সহযেগিতার উদাহরণ অত্যন্ত কম, রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অধ্যায়। কাশ্মীর ঘিরে দু'দেশের বিবাদ এখন

www.pathagar.com

এক নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে আর তা হলো পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তিত তাবৎ দুনিয়ার জ্বালানি ব্যবসায়ীরা। ভারত এক বিরাট জ্বালানি বাজারের সম্ভাবনার দেশ এবং এদেশে প্রবেশের জন্য উন্মুখ রয়েছে পশ্চিমের বৃহৎ জ্বালানি কোম্পানিগুলো।

www.pathagar.com

দশ

দক্ষিণ এশিয় জটিলতায় জ্বালানি

এ পুস্তকের গোড়ার দিকে আফগানিস্তানের কথা দিয়ে শুরু করলেও ট্রান্স-আফগান পাইপলাইন ছিল মুখ্য বিষয়। এ ট্রান্স-আফগান গ্যাস এবং পরবর্তীতে তেলের পাইপলাইনের পথ হলো পাকিস্তানের মধ্যদিয়ে এবং প্রাথমিক পরিকল্পনায় পাকিস্তানের মুলতান হয়ে দিল্লিতে ভারতের জাতীয় জ্বালানি স্পার এর সাথে যুক্ত হবার কথা ছিল। এ পরিকল্পনা আজও রয়েছে কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ বাজার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যদিয়ে স্থাপিত পাইপলাইনের উপরে নির্ভর করতে রাজি নয়। স্মরণযোগ্য যে, মে ২০০২ সনে তুর্কমেনিস্তান–আফগানিস্তান–পাকিস্তানের মধ্যে পাইপলাইন পরিকল্পনা পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্যোগের জন্য চুক্তি করলেও ভারত এতে যোগ দেবার কোনো ইঙ্গিত এখন পর্যন্ত দেয় নি। অন্যদিকে আফগানিস্তানের অবস্থা অনুকূলে হলেও ইউনোকলের উদ্যোগে গঠিত সেন্টগ্যাস কনসোরসিয়ামও পুনরুজ্জীবিত করা হয় নি। ইউনোকল এ প্রকল্পে পুনঃ অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বিশ্বের লগ্নিকারী জ্বালানি কোম্পানিগুলো যার মধ্যে ইউনোকলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা আফগানিস্তানে যে কোনো মূল্যে স্থিতি বহাল রাখতে আগ্রহী। আফগানিস্তানের বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকার প্রধান হামিদ কারজাইও একসময় এ কোম্পানির আফগান বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষ দূত জালমি খালেদজাদ এক সময়ে ইউনোকলের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। এ কারণে সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রস্তাবিত পাইপলাইনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অত্যন্ত আগ্রহী থাকবে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতির কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় যে উত্তেজনা বহাল রয়েছে তাতে ভারত সরকারের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা সহজে সুরাহা হবার নয়। ভারত মায়ানমারের সাথে চুক্তি করেছে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির জন্য, সে সাথে রয়েছে বাংলাদেশ থেকেও আমদানির পরিকল্পনা। এ দুদেশের রপ্তানিকৃত গ্যাসও ভারতের সম্পূর্ণ চাহিদা বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলোর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না। এ কারণেই ভারত বেশ কয়েকটি পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিম ও মধ্যএশিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের এবং জ্বালানি আমদানির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ চেষ্টার অংশ হিসেবে ভারত চাইছে পাকিস্তানের ভূ-খন্ডকে বাদ দিয়ে পরিবহনের পন্থা এবং রাস্তা উদ্ভাবনের। পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতির কারণেই ভারতের দ্রুত শিল্পবিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে। তবে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে সামরিক ভূ-কৌশলগত দিক ছাড়াও ভারত–পাকিস্তান সম্পর্ক মধ্যএশিয়ার সম্পদ ব্যবহার এবং এর সাথে জড়িত রাজনীতির উপরে নির্ভর করবে। দক্ষিণ এশিয়ার জ্বালানি সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সঙ্গত কারণেই ভারত–পাকিস্তান সম্পর্কের প্রধান অন্তরায় কাশ্মীর যা দু'দেশের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাশ্মীর নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা অত্যন্ত সঙ্গত বলে মনে করছি।

১৯৪৭ সনে ধর্মের উপর ভিত্তি করে ভাগ হবার পূর্বে ভারতবর্ষের সাথে ঐতিহাসিক এবং সরাসরি ভৌগোলিক সম্পর্ক পশ্চিমে ইরান এবং আফগানিস্তান হয়ে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত ছিল। অন্যদিকে কাশ্মীর হয়ে চীনের সিনজিয়াং এবং রাশিয়ার সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করা যেত। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খাইবার গিরিপথ ছিল ভারতের সাথে সরাসরি মধ্যএশিয়ার ঐতিহাসিক যোগাযোগের পথ। এ পথ ধরে আলেকজান্ডার, সেলুকাস আর মোগলরা যেমন মধ্যএশিয়া দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল তেমনি অশোক এবং চন্দ্রগুপ্ত মধ্যএশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। পশ্চিমে বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়ে ইরান বা তৎকালে পারস্য হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ করে পারস্যের প্রভাব যেমন ভারতে প্রবশ করে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও পারস্যে পড়ে। পারস্য আর মধ্যএশিয়ার প্রভাব আজও ভারতে মুসলমান শাসন আমলের পুরাকীর্তিগুলোতে লক্ষণীয়।

কাশ্মীরের গুরুত্ব ভারতের সাথে উত্তর পশ্চিমের বহিঃবিশ্বের সাথে বাণিজ্য আর যোগাযোগের ক্ষেত্র হিসেবে কখনই কম ছিল না। এ যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত

www.pathagar.com

মহাত্মপূর্ণ ইতিহাস বিখ্যাত সিল্ক রুটের (Silkroute) মধ্যে যার কিয়দাংশ আজকের পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বর্তমানে যোগাযোগ ক্ষেত্রের এসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোই পাকিস্তানের দখলে উত্তরাঞ্চল বা নর্দান এরিয়া এবং আজাদ কাশ্মীর বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

মোগল শাসনের শুরুর দিকেই কাশ্মীরের মধ্যদিয়ে চীনের ইয়ারকান্দ হয়ে (আজকের সিনজিয়াং প্রদেশের শহর) মঙ্গোলিয়া এবং রাশিয়ায় সরাসরি প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। মঙ্গোল থেকে মোগল আক্রমণ আর ভারতবর্ষে শাসন শুরু করা প্রারম্ভ থেকে যে পথটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো তা ছিল আজকের শ্রীনগর থেকে লেহ্ হয়ে সিনজিয়াং পর্যন্ত এবং সেখান থেকে মধ্যএশিয়ার সিল্ক রুট। মোগলদের সময় এ বাণিজ্য পথে চলত হাজার হাজার ঘোড়া, উট আর ইরাকের কাফেলা। এসব কাফেলা যাওয়ার পথে চীনের তৎকালীন সিনজিয়াং এ আর ফিরতি পথে কাশ্মীরের শ্রীনগরে তাদের পণ্য বিক্রয় অথবা আদান-প্রদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও হতো। আজও এ দু'স্থানের সংস্কৃতির ভেতরে প্রচুর সাদৃশ্য বিদ্যমান। শ্রীনগর থেকে যে রাস্তাটি বের হতো তা সুউচ্চ হিমালয় পর্বতরাজি পার হয়ে জজিলা পর্বতরাজি (উচ্চতা ৩৫২৮ মিটার) পার হয়ে দারাস আর কারগিলে প্রবেশ করত। কারগিল পূর্বদিক হয়ে ফোতোলা উপত্যকা (৪০৯৪ মিটার) নিচে সিন্দু নদীর অববাহিকা ধরে লেহ্ নামক শহরে পৌছাত। শ্রীনগর থেকে লেহ'র তখন দূরত্ব ছিল ৩৮৯ কিলোমিটার।

লেহতে এসব কাফেলা বিশ্রাম আর বাণিজ্য শেষ করে উত্তরে মধ্যএশিয়ার দিকে রওয়ানা হতো। প্রচুর পর্বত আর সিওক নদী পার হয়ে বিশ্ববিখ্যাত কারাকোরাম পর্বতমালার কারাকোরাম (৫৫৭৫ মিটার উচ্চতা) গিরিপথ হয়ে নিচের সমতলে প্রবেশ করে কাফেলা ইয়ারকান্দ শহরে প্রবেশ করত। লেহ থেকে ইয়ারকান্দের দূরত্ব ছিল ৭৭১ কিলোমিটার। বর্তমানে লেহ ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল লাদ্দাকের রাজধানী। লাদ্দাকের কথা আমরা আরও পরে জানব। আর কারাকোরাম গিরিপথ বর্তমানে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত প্রশস্ত সড়ক যা আজকের চীনের সিনজিয়াং (সিনকিয়াং) প্রদেশকে পাকিস্তানের সাথে সড়ক পথে যুক্ত করেছে। বিশ্বকূটনীতিতে পাকিস্তানের ভৌগোলিক গুরুত্বের যতটুকু মাহত্ম্য রয়েছে এ যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, চীনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকাতে চীনের মধ্যএশিয় অঞ্চল পাকিস্তানের বন্দরগুলোর উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সে সাথে এ যোগাযোগ

www.pathagar.com

রয়েছে নির্ভেজাল যাতায়াতের জন্য সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পাকিস্তানের জন্য কারাকোরামের এ পথ সামরিক জীয়নকাঠি বলা যায়। পশ্চিমের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে এ পথেই পাকিস্তান আর চীনের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন মিসাইল এবং তার প্রয়োজনীয় অংশের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। বর্তমানে এ যোগাযোগ গিলগিত–হুনজা হয়ে খুনজাহারো গিরিপথের পরেই চীনে প্রবেশ করে আর এ পথের নাম কারাকোরাম হাইওয়ে যা পুরাতন সিল্ক রুটের অংশ। এ রাস্তার গড়পরতা উচ্চতা ৪০০০ মিটার। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতায় অবস্থিত মহাসড়ক। এ সড়ক শুরু হয় এবোটাবাদ থেকে। আর সমগ্র পাকিস্তান যুক্ত হয়ে আছে এ সড়কের অপর প্রান্তে।

কারাকোরাম মহাসড়ক তৈরি হয় পুরাতন সিল্ক রুটের কিয়দাংশ ধরে। ১৯৫৮ সনের পরে পাকিস্তানের সাথে গণচীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পরপরই তৎকালীন সিনকিয়াং অঞ্চলের সীমান্ত নির্ধারণ নিয়ে বৃটেন, ভারত আর চীনের সাথে যে মতভেদ ছিল তা পাকিস্তান চীনের সাথে মীমাংসা করে। পাকিস্তান চীনের নিকট সীমান্তের বেশকিছু ভূমি হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে দু'দেশের সামরিক প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে এ রাস্তার কাজ শুরু হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারত চীনের নিকট পাকিস্তানের এ ভূমি হস্তান্তরকে অবৈধ বলে আজও দাবি করছে। ভারতের মতে, এ অঞ্চল পাকিস্তান কর্তৃক ১৯৪৭ সনে অবৈধ দখলকৃত বৃহত্তর কাশ্মীরের এলাকা যা ভারত আজও দাবি করছে। আর পাকিস্তান এ অঞ্চলকে কেন্দ্রের শাসনে রেখেছে। এসব কথায় আমরা আরও পরে ফিরব। কারাকোরাম হাইওয়ে বা মহাসড়ক তৈরি শুরু হয় ১৯৫৯ সনে আর শেষ হয় ১৯৭৯ সনে। বিশ বছরে এ সড়ক তৈরি করা হয় উভয় দেশের সামরিক প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ২৪,০০০ শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে। রাস্তার জন্য ভাঙ্গতে হয় প্রচুর পর্বতের পাথর যা আজও অনেক সময় গড়িয়ে পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। বছরের অনেক সময় বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে যায় এ মহাসড়ক। এ মহাসড়কের এক পাশ দিয়ে হুনজা হতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় প্রায় ২৫০০ মিটার নিচ দিয়ে গিলগিত নদী যা সমতলে গিয়ে সিন্ধু নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে। (১৯৮৯ সনে এ রাস্তায় আমি খুনজারাহ্ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। খুনজারাহের পরেই চীনের ছোট জনপদ ঐতিহাসিক কাসগড়)।

আমরা বৃহত্তর কাশ্মীরের ভূ-খন্ডের গুরুত্বে ফেরার পূর্বে বহুল আলোচিত সিল্ক রুটের সাথে কিছুটা পরিচিত হব। ঐতিহাসিকদের মতে, ইউরোপ হতে এ

www.pathagar.com

রাস্তার প্রথম ব্যবহার হয় আলেকজান্ডারের মধ্যএশিয়ায় তথা ভারতে প্রবেশের মধ্যদিয়ে, পরে চীন হতে মঙ্গোলরা পশ্চিম দিকে মধ্যএশিয়া হতে পারস্য (বর্তমানের ইরান) মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) আর আনাতোলিয়া (তুরস্ক) পর্যন্ত সামরিক অভিযান আর বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করেছিল। একই পথ মধ্যএশিয়ার সমরখন্দ, বোখারা (বর্তমান উজবেকিস্তান) হতে হিন্দুকুশ পার হয়ে কাবুল–কান্দাহার হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। পরে দিল্লিকে পূর্বে বঙ্গোপসাগরের তটপর্যন্ত যুক্ত করে। অন্য আর একটি রাস্তা চীনের সিয়ান হতে দক্ষিণে কারাকোরামের পথ ধরে কাশ্মীর হয়ে শ্রীনগরের পথে চলে আসে। আজ এ পথের অনেক জায়গা প্রশস্ত মহাসড়কে পরিণত হয়েছে যার সামান্য অংশের কথা আমরা বলেছি। এপথ ধরেই মধ্যএশিয়া মহাসড়ক যা ইউরোপকে সংযোগ করবে, যা জাতিসংঘের এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্পের অধীনে রয়েছে। ভারতের জন্য মাঝখানে রয়েছে বৈরি পাকিস্তান আর ভারতের মতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। এ পথে ১২৭০ সনের দিকে বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইটালীয় বংশোদ্ভূত মার্কোপলো রোম থেকে তৎকালীন চায়না বা ক্যাথেতে ভ্রমণ করেন তখন এ রাস্তা ১৫০০ বছর পুরানো ছিল বলে উল্লেখিত রয়েছে। এ রাস্তা ধরেই আরবের সাথে বাণিজ্য সূত্রে মধ্যএশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়।

ফিরে আসি শ্রীনগরের পথে। অবিভক্ত ভারতের কাশ্মীরের প্রাণশহর শ্রীনগরের উত্তরে নৈসর্গিক এলাকা গিলগিতের (বর্তমান পাকিস্তানে) পথ ছিল ৩৬৫ কিলোমিটার। এ রাস্তাটি ছিল সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গিলগিতের উচ্চভূমি থেকে উত্তর দক্ষিণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতো। আজও উত্তর দক্ষিণ পর্যবেক্ষণের জন্য এস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সন্নিকটেই রয়েছে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ রণভূমি সিয়াচীন। সেখানে যুদ্ধাবস্থায় মোতায়েন রয়েছে পাক–ভারতের সৈন্যবাহিনী। সিয়াচীন রণক্ষেত্রের উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফুট। গিলগিতের পথেই সমগ্র কাশ্মীরের জন্য একসময়ে কাশ্মীরের শাসকদের সামরিক উপকরণ চলাচল করত। শ্রীনগর হয়ে পশ্চিমে জেলাম উপত্যকা আর নীলাম উপত্যকা হয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর অববাহিকায় প্রবেশ করা যেত। শ্রীনগরের সাথে উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব পশ্চিমের এ যোগাযোগ একদিকে যেমন অবিভক্ত ভারতের মাহাত্ম্য বাড়িয়েছিল তেমনি বৃটিশ শাসকদের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার জ্বার (CZAR) এ আর চীনের মাংচু রাজবংশের দক্ষিণমুখি অভিযানের আশংকায় শংকিত থাকতে হতো। এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়

www.pathagar.com

১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির পর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং কাশ্মীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পাকিস্তানের দখলে আসার পর থেকে ভারতের সাথে মধ্যএশিয়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারত মধ্যএশিয়ার সাথে ভৌগোলিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে ভারতের সাথে স্থলপথে মধ্যএশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যেকোনো যোগাযোগ পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। আর এখানেই ভারতের বড় একটি সমস্যা বিশেষ করে বর্তমান আঙ্গীকে জ্বালানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে।

কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো অক্টোবর ১৯৪৭ সনেই ভারতের হাতছাড়া হয়ে যায়। আর ১৯৬২ সনে চীন-ভারত যুদ্ধের পর চীন কাশ্মীরের উত্তরপূর্বের লাদ্দাক অঞ্চলের আকসাইচীন নামক জায়গায় প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল দখল করে নেয় যা আজও চীনের দখলে রয়েছে। চীনের মতে এ অঞ্চলের প্রায় ১,২৫,০০০ বর্গমাইল চীনের বৈধ এলাকা যা বৃটিশ-ভারত অবৈধভাবে তিব্বতের কাছ থেকে নিয়েছিল। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে কাশ্মীর বিবাদ একই স্থানে রয়ে গেছে। কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ভারত উভয়েই অনঢ় আর চীন নীরব। কাশ্মীরের উচ্চ ভূমিগুলো পাকিস্তানের ভৌগোলিক মাহাত্ম যেমন বাড়িয়েছে তেমনি ভারতকে করেছে ভূ-কৌশলগত (Strategic) অবস্থানের দিক থেকে দুর্বল। কাশ্মীর ১৯৪৯ সনের ২৭ জুলাই করাচী চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের দু'ভাগকে সিজফায়ার লাইনের মাধ্যমে ভাগ করা হয় যা ১৯৭২ সনের সিমলা চুক্তির আওতায় নিয়ন্ত্রণ রেখায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৫২ সনের জানুয়ারির ২ তারিখে ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় কিন্তু ঐ শাসনতন্ত্রে বৃহত্তর কাশ্মীর ভারতের অংশ হিসেবে রয়ে যায়। বর্তমানে কাশ্মীরের প্রাদেশিক পরিষদে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের, যা আজাদ কাশ্মীর আর উত্তরাঞ্চল বলে পরিচিত কাশ্মীরের জন্য ২৩টি সংসদ পদ শূন্য রাখা হয়েছে। ভারতের বর্তমান বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) সরকার পাকিস্তানের নিকট অধিকৃত বলে দাবিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে দেবার দাবি জানাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান কাশ্মীরের বাকি অঞ্চলে ভারতের নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজি নয়। কাশ্মীর নিয়ে দুটি যুদ্ধও হয়ে গেছে। তৃতীয় যুদ্ধের পর মানে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে সিমলা চুক্তিতে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা পুনর্নির্ধারণ করে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবার কথা বলা হয়েছিল। সিমলা চুক্তিও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। ১৯৮৯ সন থেকে কাশ্মীর

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিলে ভারত পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করে। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানে চতুর্থবারের মত সামরিক অভ্যুত্থান হলে এ সংঘাত চরমে উঠে। ভারত বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের সহযোগী দেশ বলে আখ্যায়িত করবার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার অব্যাহত রেখেছে।

ভারত কাশ্মীরের চলমান সংঘর্ষকে সীমান্তপাড়ের সংঘর্ষ বলে আখ্যায়িত করছে আর অন্যদিকে পাকিস্তান একে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলছে। ভারত পাকিস্তানকে তালেবান আর সন্ত্রাস সমর্থক বলে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিল কিন্তু সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনে নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলা পরবর্তী আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযানে পাকিস্তান নিঃশর্ত সমর্থন দেয়ায় সে পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন হয়। আজ থেকে ২৩ বছর পূর্বে পাকিস্তানের তৃতীয় সামরিক শাসক জিয়াউল হক সে সময় আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরোধিতা করায় যুক্তরাষ্ট্রের বৈধতা পেয়েছিল আর ২০০১ সনে জেনারেল পারভেজ মোশারফ তেমনিভাবে আফগানিস্তানে তালেবান আর ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দার বিরোধিতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির মিত্র হয়ে শুধু বৈধতায় নয় বরং পাকিস্তানের ভৌগোলিক গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করল। এ পরিস্থিতি ভারতের জন্য সুখকর হয় নি। ভারত পাকিস্তান সম্মুখ সংঘর্ষ না হলেও এ দু'দেশের সেনাবাহিনী বিগত দশবছরেরও উপরে মুখোমুখি রয়েছে এক বিরল পরিস্থিতিতে সে জায়গার নাম সিয়াচীন।

সিয়াচীন নামক গ্লোসিয়ার (বরফের নদী) নিয়ে উভয় পক্ষই নিজের জায়গা বলে বিবাদমান। সিমলা চুক্তির আওতায় রাইন অব কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ রেখার বিশদ ব্যাখ্যা গ্রিডপয়েন্ট এন জে ৯৮৪২ শেষ হয় কিন্তু তার উত্তরের এসব গ্লোসিয়ারের কর্তৃত্বের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল না। আর তা নিয়েই বিবাদের সূত্রপাত হয় ১৯৮৪ সনে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী 'মেঘদূত' নামে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬,০০০ ফুটের উপরে এ অঞ্চল দখল করে। এর পরপরই ভারতের আধিপত্য ঠেকাতে পাকিস্তানও তার সেনাবাহিনী ঐ অঞ্চলে পাঠায়। প্রায় ২০,০০০ ফুট উচ্চতায় দু'দেশের সেনাবাহিনী মুখোমুখি মোতায়েন রয়েছে, হতাহত হয়েছে প্রচুর আর তার চেয়ে বেশি হত হচ্ছে উচ্চতা জনিত অসুখ আর অতিরিক্ত শীতের জন্য।

১৯০৭ সনে একদল পবর্ত আরোহী কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তের পৃথিবীর

www.pathagar.com

সর্ববৃহৎ বলে কথিত গ্লেসিয়ার (হিমবাহ বা তুষার নদী অথবা বরফ নদী) প্রায় ১৬০০০ থেকে ২০০০০ ফুটের উপরে আবিষ্কার করে। এটি প্রস্থে ৩ মাইল আর দৈর্ঘ্যে ৪৭ মাইল। এ গ্লোসিয়ারের উৎপত্তি হয় বর্তমান চীন–পাকিস্তান সীমান্তের ইন্দরা কোলী নামক গিরিপথের এক প্রান্ত থেকে। পাকিস্তানে অবস্থিত বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কে–২ (K-2 : KARAKORAM) যে সরাসরি ৩৭ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত এ গ্লোসিয়ারের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব (Strategic Importance) উভয়েই অনুধাবন করে। আর তাই এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কোনো পক্ষই পিছু হটতে রাজি নয়। পাকিস্তানের দিক থেকে এ হিমবাহে পাঁচটি গিরিপথ দিয়ে প্রবেশের পথ রয়েছে। এর সবগুলোই গড়ে ২০,০০০ ফুটের উপরে। ভারতের দিক থেকে লাদ্দাক অঞ্চলের নুবারা নদী পথ দিয়ে পাশ ধরে প্রবেশের পথ রয়েছে। ১৯৮৪ সন থেকে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের প্রায় ৪০০০ সৈনিক প্রাণ হারিয়ে ফেলে আর বছরে প্রায় ৩০০ প্রাণহানি হয় শুধুমাত্র ঠাণ্ডাজনিত কারণে।[১]

এ গ্লোসিয়ারের সামরিক গুরুত্বের মধ্যে পর্যবেক্ষণই প্রধান। ভারতের জন্য আধুনিক পর্যবেক্ষণ যন্ত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে চীন পাকিস্তানের কারাকোরাম মহাসড়কের এবং চীনের তিব্বত অঞ্চল ও কাশগড় অঞ্চলের পর্যবেক্ষণ সম্ভব। অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষেও ভারতের সম্পূর্ণ কাশ্মীরের চলারপথ এবং সৈন্য সমাবেশের উপর পর্যবেক্ষণ সম্ভব। এছাড়াও ভারতকে প্রতিহত করতে না পারলে যে পাঁচটি গিরিপথের মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চলে প্রবেশপথ রয়েছে তা সামরিক হুমকির মুখে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। কাশ্মীর ঘিরে ভারত পাকিস্তানের এ টানাপড়েন এখন দুই প্রতিবেশী পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মধ্যে উত্তেজনার প্রধান উৎস সে বিষয়ে তাবৎ দুনিয়া জ্ঞাত এবং শংকিত। এ সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব নয়। ভারতের জন্য কাশ্মীর অখণ্ডতার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক কারণ একমাত্র কাশ্মীরই মুসলমান প্রধান রাজ্য। যদিও কাশ্মীরের লাদ্দাক অঞ্চলে বৌদ্ধ আর জম্মু অঞ্চলে হিন্দু পণ্ডিতদের বাস তবুও কাশ্মীর বলতে মুসলমানদের সমস্যাই বোঝায়। কাশ্মীরিদের নিকট এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভূ-খণ্ড কিন্তু ভারত–পাকিস্তান উভয়েই স্বীয় স্বার্থে কাশ্মীরকে ধর্মের আচ্ছাদন দিতে ব্যস্ত। যদিও পাকিস্তানের সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাশ্মীর অঞ্চল দখলে রয়েছে তবুও সমগ্র কাশ্মীর পাকিস্তানের গভীরতা বাড়াবে, পাকিস্তানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে। এমনকি পাকিস্তানপন্থী স্বাধীন

১। Robert Wiresing "Pakistan's Security Under Zia 1977-1988.

www.pathagar.com

কাশ্মীরও পাকিস্তানের কাম্য নয়। এ বিবাদ কবে কিভাবে শেষ হবে তা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে এ বিবাদ ঘিরে দক্ষিণএশিয়াতে উত্তেজনা প্রবাহমান থাকবে আগামী বছরগুলোতেও।

কাশ্মীর আর এর ভূ-খণ্ড ঘিরে বিবাদের কথা পাঠকদের অল্পবিস্তর নিশ্চয়ই জানা আছে তাই বিশদ বিবরণ থেকে বিরত থেকে শুধুমাত্র সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরলাম। তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি ভূ-কৌশলগত (Geo-Strategic) দিকগুলো। ভারত পাকিস্তান সম্পর্কে অন্যান্য বিবাদমান বিষয় থাকলেও কাশ্মীরই এ দু'দেশের মধ্যে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এ কারণে উভয় দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারছেনা। এ বিবাদের কারণে ভারত যেমন পাকিস্তানকে কোণঠাসা করবার প্রয়াসে ব্যস্ত পাকিস্তানও তেমনি ভারতকে বিরত করতে ব্যস্ত। একে অপরকে এতই অবিশ্বাস করছে যা বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে দুটি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিরল। পাকিস্তানকে পাশ কাটানো এবং অবিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই ভারতের মধ্যপ্রাচ্য অথবা মধ্যএশিয়ার উন্মোচিত রপ্তানি বাজার এবং পর্যাপ্ত জ্বালানি আমদানির পরিবেশ সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে।

ভারতের অতিরিক্ত জ্বালানি চাহিদা যার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে- তা পূরণ করার অভিলাসে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বেশ কয়েকটি চুক্তি করেও সহজ পরিবহনের অন্তরায়ের কারণে কার্যকর করতে পারে নি। ২০০০ সনে যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দক্ষিণএশিয়ায় ভারতের প্রতিদিনের চাহিদা ৯৬ মিলিয়ন কিউবিক মিটার অপরদিকে ভারতের নিজস্ব খাত থেকে প্রাপ্ত মাত্র দিনপ্রতি ৬৭ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। কাজেই এ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঘাটতি দিনপ্রতি ২৯ মিলিয়ন কিউবিক মিটার যা গত দুবছরে আরও বেড়েছে।[২] অন্যদিকে দক্ষিণএশিয়ার আরেক দেশ পাকিস্তানের বর্তমান চাহিদা ২০০৬ এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।[৩] ভারতের জ্বালানি খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস মাত্র ৮ ভাগ ব্যবহার হয় যদিও ফি বছর এ পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের জ্বালানি চাহিদার প্রায় ২৭ শতাংশ পূরণ হয় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে। কাজেই দু'দেশেরই চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ ইরানের রয়েছে রপ্তানিযোগ্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস।

২। Dadwal, Sheboni Roy "The current Oil Crisis, Implications for India" IDSA 21 Sept. 2000.
৩। "Energy and Environment Cooperation" Verson October 10, 2000

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইরানে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ৮১২ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট (812 tcf)। কাজেই ভৌগোলিক সন্নিকটতার কারণেই ইরান স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান ও ভারতের চাহিদা মেটাতে সক্ষম এবং ইরান থেকে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের জন্য পাইপলাইন দ্বারা পরিবহনও সম্ভব। এতে খরচও কম পড়বে। তবে এ পরিবহনেও অন্তরায় রয়েছে। ভারতের জন্য পাকিস্তানের ভূ-খণ্ড ব্যবহার আর পাকিস্তানের জন্য ইরানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের টানাপড়েন সে সাথে ইরানের উপরে আন্তর্জাতিক লগ্নিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা। কাজেই ইরানের সাথে গ্যাস চুক্তির লগ্নি আপাতত স্থানীয় নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ করতে হবে। ইরানের সাথে ১৯৯৫ সনে পাকিস্তানের আর ২০০০ সনে ভারতের গ্যাস রপ্তানির চুক্তি হয়েছিল স্থলপথে গ্যাস পরিবহনের ভিত্তিতে কিন্তু সে চুক্তি ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতির কারণে আজও কার্যকর হয় নি। তারপরেও ভারত-পাক সম্পর্কের আরও অবনতি হয়েছে। ইরান-পাক-ভারত গ্যাস চুক্তি ও পরিবহন সমস্যা বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে পাঠকদের সহজ অনুধাবনের জন্য নিম্নে এ তিন দেশের গ্যাস মজুদ, উত্তোলন এবং ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ছক দেয়া হলো।

ছক –১ ঃ প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিসংখ্যান বিশেষ দেশ সমূহের (সিআইএ ২০০০)

(২০০০ সন ভিত্তিক)[৪]

দেশ	গ্যাস মজুদের পরিমাণ	গ্যাস উত্তোলন	গ্যাসের ব্যবহার
ভারত	২৯.৯ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট (Tcf)	৭৬১ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (Bcf)	৭৬১ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (Bcf)
ইরান	৮১২ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট (Tcf)	১.৯ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (Bcf)	১.৮ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (Bcf)
পাকিস্তান	২১.৬ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট (Tcf)	০.৭ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (Bcf)	০.৭ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (Bcf)

৪। CIA Fact Sheet - 2000, Country Report.

www.pathagar.com

১৯৮৮ সনে ইরান দক্ষিণ পারস্য ক্ষেত্রে গ্যাসের বিশাল মজুদ আবিষ্কার করে। সেই থেকে ইরান সরকার এ গ্যাসকে দ্রুত রপ্তানি বাজারে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছিল। শুরু থেকেই ইরানের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ার বাজার বিশেষ করে পাকিস্তান আর ভারতের বাজারে ইরানের গ্যাস বিক্রি করবার ইচ্ছা। এ প্রকল্প নিয়ে ইরান পাকিস্তানের সাথে বহুবার যোগাযোগ করলেও আফগান পরিস্থিতি পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত বিরোধী জোট তদুপরি আফগান মুজাহিদদের সমর্থন নিয়ে তেহরান আর ইসলামাবাদের মধ্যে কিছুটা শীতল সম্পর্কের কারণে এ প্রকল্প নিয়ে ইসলামাবাদ খুব উৎসাহ প্রকাশ করে নি। অন্যদিকে ভারত আগ্রহ প্রকাশ করলেও পাকিস্তানের মধ্যদিয়ে পাইপলাইনের বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী না হয়ে বিকল্প পরিকল্পনা ইরান সরকারের নিকট উপস্থাপন করে। এ পরিকল্পনায় পাকিস্তানের ভূ-খণ্ড সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ইরান হতে ভারতে গ্যাস সরবরাহের প্রস্তাব রাখে কিন্তু এ প্রস্তাবের বাস্তবায়ন অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিবেচনা করে উৎসাহ প্রকাশ না করায় এ বিষয়টি আর এগোয় নি। ১৯৯৫ সনে পাকিস্তান ইরানের সাথে গালফ অঞ্চল হয়ে করাচীতে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানির একটি প্রাথমিক স্মারক স্বাক্ষর করে। এর পরপরই ইরান উদ্যোগী হয়ে এ প্রস্তাবিত পাইপলাইনটি ভারত পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা উপস্থাপন করলে পাকিস্তানের অসম্মতি না থাকলেও ভারত পাকিস্তানের সাথে এ ধরনের চুক্তির বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করে নি। প্রসঙ্গত, ঐ সময়ে কাবুলে গৃহযুদ্ধের পক্ষে –বিপক্ষে সমর্থন নিয়েও ভারতের সাথে পাকিস্তানের ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল।

২০০০ সনে প্রথমবারের মত ভারত ইরান থেকে গ্যাস আমদানির ব্যাপারে সরকারি পর্যায়ে পাকিস্তানের সাথে কথাবার্তা শুরু করে। বিশেষ করে এ সরবরাহের সম্ভাব্য পরিবহনের মাধ্যম নিয়েই প্রধানত আলাপ চলতে থাকে। ইতিপূর্বেই ভারত–ইরান দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি যার মধ্যে গ্যাস আমদানিও স্থান পেয়েছিল এবং আরও জোরদার করবার জন্য ১৯৯৯ সন থেকে দ্বি-পাক্ষিক টাস্কফোর্স গঠন করেছিল। তবে গ্যাসের বিষয়টি ভারত আগস্ট ২০০০ থেকে পাকিস্তানের সাথেও আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করে।

১৯৯৫ সনে তেহরানের সাথে ইসলামাবাদের যে প্রাথমিক আলোচনা হয় তাতে ইরানের দক্ষিণ পারস্য ক্ষেত্র থেকে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার খরচের মাধ্যমে করাচী পর্যন্ত ৮৭০ মাইল দীর্ঘ্য পাইপলাইনের প্রকল্প খতিয়ে দেখবার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেয়া হয়। ঐ সময়ে করাচী ছাড়া আর কোনো শহরের কথা উল্লেখ করা হয় নি। পরে পাকিস্তানের মুলতান হয়ে দিল্লি হয়ে গুজরাটের তট পর্যন্ত নিয়ে যাবার পরিকল্পনায় ২,৬৭০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ৪৮ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের পাইপলাইনের মধ্যদিয়ে গ্যাস প্রবাহিত করবার পরিকল্পনার প্রাথমিক আলাপ আলোচনা স্থান পায়। এ পাইপলাইন থেকে পাকিস্তান বছরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার রয়ালিটি হিসেবে পাবার কথা ছিল সেই সাথে ইরান থেকে গ্যাস আমদানি করলে পাকিস্তানের প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবারও কথা ছিল।[৫] এ প্রকল্প বাস্তবায়নে চারটি বড় কোম্পানি আগ্রহ দেখায়। এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিএইচপি, এনআইজিসি, মালয়েশিয়ার পেট্রোনার্স এবং ফ্রান্সের টোটাল এবং ঐ সময়ে ইরান–তুরস্ক পাইপলাইনের কাজে নিয়োজিত ছিল। একটি কনসোরসিয়াম দক্ষিণ পারস্যে গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত ছিল। এ প্রকল্পের সম্ভাব্য অতিরিক্ত যোগদানকারীদের মধ্যে ছিল ইরান ন্যাশনাল গ্যাস কোম্পানি এবং গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড। এ প্রকল্প নিয়ে ইরান–ভারতের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। ততদিনে ভারত–পাকিস্তান পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বে পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কার্গিল যুদ্ধ আর অক্টোবর ১৯৯৯ সনে পাকিস্তানে পারভেজ মোশারফের ক্ষমতা দখল ভারতকে এ প্রকল্পের বিষয়ে পুনঃ বিবেচনা করতে বাধ্য করে। ভারতের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। তবে ২০০০ সনে মোশারফ তেহরান সফর করে এ পাইপলাইনের প্রকল্পে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন। পাকিস্তান ভারত এবং ইরান উভয়কেই এ প্রকল্পের নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে থাকে। শুধু তাই নয় পাকিস্তানের অংশের পাইপলাইন তৈরি তিন বছরে শেষ করবে বলে ইরানকে আশ্বাস দিয়ে ট্রানজিট ফি আরও বাড়াতে অনুরোধ জানায়। এ ব্যাপারে মোশারফের উৎসাহ-ই ছিল বেশি। ২০০০ সনে নিউইয়র্কে মোশারফের সাথে ইরানের রাষ্ট্রপতি খাতেমির সাক্ষাৎকারের সময়েও তিনি পাইপলাইনের নিরাপত্তায় তাঁর অগ্রাধিকার দেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এর পূর্বেই দিল্লিতে বাজপেয়ি–মোশারফ বৈঠক ফলপ্রসূ না হবার কারণে দু'দেশের তিক্ততা এখনও উপশম হয় নি। নিউইয়র্কে মোশারফের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির সাথে যে কোনো বৈঠক ভারতের অনীহার জন্য সম্ভব হয় নি। কাজেই মোশারফের হয়ে ইরানই ভারতের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এত আশ্বাসের পরও ভারত পাকিস্তানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। দিল্লিতে ভারতের কূটনৈতিক এবং সামরিক পণ্ডিতরা কিছুতেই পাকিস্তানের হাতে

৫। Hindustan Times July 7, 2000

www.pathagar.com

ভারত বিরোধে ব্যবহার করা যায় এমন কোনো বাড়তি সুবিধা দিতে রাজি ছিল না। এদের মতে ভারতের সাথে পাকিস্তানের কোনো ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবাহিত গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভারতকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারবে। কাজেই ভারতে জেনে শুনে পাকিস্তানের হাতে এ ধরনের অস্ত্র তুলে দিতে রাজি নয়। মোশারফকে ভারত এমনিতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ প্রকল্প সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনের পর আরও গভীর সংকটে পড়ে। ভারত এখন সমুদ্রগামী ট্যাংকারে করে গ্যাস আমদানির প্রস্তাব ইরানের কাছে রাখলে ইরান এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি। এরই মধ্যে ভারতে গ্যাসের চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুণ। জ্বালানির অভাবে ভারতের মহারাষ্ট্রের ধাবর বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না। এরই প্রেক্ষিতে ধাবর প্রকল্পে ভারতের অংশীদার এনরন (Enron) কাতার থেকে সমুদ্রগামী ট্যাংকার যোগে জরুরি ভিত্তিতে তরলীকৃত গ্যাস আমদানি করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ইরান হতে ভারতের গ্যাস আমদানির সম্ভাবনা ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বাস্তবায়ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে বহু যোজন দূরে।

অন্যদিকে আফগানিস্তানের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বহুল আলোচিত তুর্কমেনিস্তান–আফগানিস্তান–পাকিস্তান পাইপলাইন প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে ইসলামাবাদে ২৮ মে ২০০২ সনে শীর্ষ বৈঠকের মধ্যদিয়ে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরর প্রকল্প পুনরায় স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি তুর্কমেন রাষ্ট্রপতি সুপার মুরাত নিয়াজভ আফগান অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রধান হামিদ কারজাই আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মোশারফের স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর কারজাই এ প্রকল্পে যোগদানের জন্য ভারতকেও আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, এ পাইপলাইনে ভারতের যোগদান এ অঞ্চলে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করবে; কিন্তু ভারতের তরফ থেকে কোনো বিবৃতি দেয়া হয় নি। স্মরণযোগ্য যে, ট্রান্স–আফগান পাইপলাইন প্রকল্প বলে খ্যাত এ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনোকল ভারতকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। ইউনোকল 'সেন্টগ্যাস' নামে কনসোরসিয়াম করে প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে বলে দাবি করাতে শেয়ার হোল্ডারদের চাপের মুখে তালেবানদের কাবুল দখলের পর প্রকল্প স্থগিত রেখেছিল। ট্রান্স আফগান পাইপলাইন সুই হয়ে একদিকে মুলতান আর দক্ষিণে গোয়াদর পর্যন্ত নিয়ে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ১৪৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ্য পাইপলাইন দিয়ে বাৎসরিক ১৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার পরে

www.pathagar.com

২০–৩০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস সঞ্চালন করা হবে। এর প্রাথমিক মূল্য ধার্য করা হয়েছে প্রতি ১০০০ কিউবিক মিটারের জন্য ৪০–৪২ মার্কিন ডলার।

ভারতে এখন দ্রুত শিল্পায়নের প্রচেষ্টা চলছে। এ প্রচেষ্টা চলছে আভ্যন্তরীণ তথা বিশ্ববাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদার প্রেক্ষিতে। তাছাড়া ভারত পারমাণবিক শক্তি হিসেবে বিশ্বে নিজের স্থান করতে সক্ষম হলেও অর্থনৈতিক আঙ্গিকে উন্নয়নশীল দেশের সীমারেখা এখনও অতিক্রম করতে পারে নি। এ সীমা অতিক্রম করতে হলে প্রয়োজন হবে দ্রুত শিল্পের বিকাশ। তাই ভারতে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা স্বত্বর পূরণ করতে না পারলে এ প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়বে। জ্বালানির উপকরণের ভিতর যেহেতু গ্যাস অত্যন্ত সস্তা তাই শিল্প কারখানাগুলোতে গ্যাসের চাহিদাই বেশি। ভারতে উত্তোলনকৃত গ্যাসের ৭০ ভাগই আসে গুজরাটের মজুদ থেকে বিশেষ করে বোম্বে তটের ক্ষেত্রগুলো থেকে। যদিও ভারত সরকার গ্যাসের নতুন ক্ষেত্র সন্ধানের জন্য প্রচুর অর্থ যোগান দিচ্ছে, তাতেও চাহিদা পূরণ হবার মত নয়।

পাকিস্তান তার আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য বহু স্থানে গ্যাস অনুসন্ধানের তৎপরতা চালিয়ে গেলেও তেমন চমকপ্রদ ফল এখনও পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে পাকিস্তানের পুরাতন ক্ষেত্রগুলোও নিঃশেষিত হয়ে আসছে।

এসব কারণেই এবং বিশ্ব উন্মুক্ত অর্থনীতির পরিবেশে আশা করা গিয়েছিল যে, দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক আঙ্গিকই প্রাধান্য পাবে কিন্তু তেমনটা হয় নি। সমগ্র উপমহাদেশ ভারত–পাকিস্তানের ইতিহাসে আটকে পড়া সংকটের হাতে জিম্মি হয়ে রয়েছে। তাছাড়াও ভারতের হামবড়া ভাব প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারছে না। বর্তমানে ভারতের সামাজিক কাঠামোর যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে পরিচিত দেশে ভয়াবহ ধর্মান্ধতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার্থে হিন্দুত্বকে যেভাবে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে তাতে শুধু প্রতিবেশী দেশগুলোই নয় স্বয়ং ভারতের অভ্যন্তরেই আশংকার সৃষ্টি হচ্ছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা থেকে যে ধর্মান্ধতার নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল তা রাজনীতিকে কতখানি প্রভাবিত করেছে তার উদাহরণ গুজরাটে ২০০২ সনে দাঙ্গার বিশ্লেষণ করলেই প্রতীয়মান হয়।

ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক অবনতি হতে থাকে ২০০০ সনের মাঝামাঝি থেকে যা পর্যায়ক্রমে অবনতির দিকেই যেতে থাকে। ইরানের সাথে ভারতের

www.pathagar.com

দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত থাকলেও ভারত পাইপলাইনের পরিকল্পনায় উৎসাহ হারিয়ে তরলীকৃত গ্যাস বিকল্প পাইপলাইনের মাধ্যমে আমদানির প্রস্তাব দেয়। এতে বলা হয়, পাকিস্তানের সংরক্ষিত জলসীমার বাইর দিয়ে পানির নিচের পাইপলাইনের চিন্তাভাবনা করবার জন্য কিন্তু তারা সুস্পষ্টভাবে জানায় যে, সে দেশের এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনের ধারের কাছে দিয়েও এ পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে দিতে পাকিস্তান রাজি নয়। এ কারণেই এ পরিকল্পনাও আর এগুতে পারে নি।

ভারত ওমানের কাছ থেকে গ্যাস ক্রয়ের চিন্তাভাবনাও করছিল। ওমান থেকেও গ্যাস পরিবহনের ক্ষেত্রে ইরানের মত একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। ভারত ওমান থেকে ট্যাংকারের মাধ্যমে তরলীকৃত গ্যাস আমদানির প্রস্তাব দিলে তা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে না বিধায় সার্বিক চুক্তি না করে শুধুমাত্র ধাবর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এনরনের মাধ্যমে ১.২ মিলিয়ন টন তরলীকৃত গ্যাস জাহাজযোগে পরিবহনের চুক্তি করেছিল। কিন্তু এতে ভারতের সার্বিক ঘাটতি পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় নি।

ভারতের সাথে পাকিস্তানের অস্বাভাবিক সম্পর্কের কারণে শুধু জ্বালানি ক্ষেত্রেই নয় বরং মধ্যএশিয়ার সাথে সংক্ষিপ্ত বাণিজ্য পথেও বাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে ২০০০ সনে ভারত-ইরান-রাশিয়া উত্তর দক্ষিণ পরিবহন করিডর এর স্মারক স্বাক্ষর করে। এ পরিকল্পনায় আরব সাগরে ভারতীয় বন্দর হতে দক্ষিণ ইরানের সমুদ্রবন্দর, বন্দর অব্বাস পর্যন্ত ইরানের মালামাল খালাস করে সে দেশের ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে কাস্পিয়ান সাগরের মাধ্যমে উত্তরে রাশিয়াতে পরিবহন করার ব্যবস্থা রাখা হয়। একইভাবে ভারতের জন্য রাশিয়া তথা ইরানের মালামালও আমদানির ব্যবস্থা রাখা হয়। এ পথের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইরান চেষ্টা করছে কাবুলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের মধ্যদিয়ে তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-ইরান পথও ব্যবহার করবার জন্য। ভারত হয়ত ভবিষ্যতে এ পথ কেবলমাত্র তরলীকৃত গ্যাস আমদানির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। যদিও এধরনের উদ্যোগ এখনও নেয়া হয় নি। দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনাময় পরিস্থিতির কারণে এবং পাকিস্তানের ভূ-খণ্ডের ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে ভারতের জন্য মধ্যএশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে স্থলপথে প্রাকৃতিক গ্যাসের আশু আমদানি সম্ভব হবে না। আর বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক যে পর্যায়ে আছে তাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। যতদিন পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যার সুদূরপ্রসারী

www.pathagar.com

সমাধান না হবে ততদিন পর্যন্ত এ সম্পর্ক টানাপড়েনের মধ্যে থাকবে। বাহ্যত পাকিস্তান সহযোগিতার হাত বাড়ালেও ঐতিহাসিক রেষারেষি এবং অবিশ্বাসের কারণে ভারত পাকিস্তানের কোনো প্রস্তাবকেই গুরুত্ব দিতে চাইবে না। এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ বেসামরিক সরকারের পক্ষেও করা সম্ভব হবে কিনা তাও সন্দেহাতীত নয়। মধ্যএশিয়া তথা ইরান থেকে গ্যাস আমদানির তিরোহিত সম্ভাবনা ভারতের বড় বড় শিল্পপতিদের ভাবিয়ে তুলছে। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারত মধ্যএশিয়ার সম্ভাবনাময় জ্বালানি ক্ষেত্রগুলোতেও লগ্নি করতে চায় আর এ কারণেই বহু শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব ভারতের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর কিছু অত্যন্ত ব্যয়বহুল আর কোনো কোনো প্রস্তাব আদৌ যৌক্তিক কিনা তাও যাচাই করে দেখার অপেক্ষা রাখে। তবে এসব প্রস্তাবেই একটি বিষয় লক্ষণীয় আর তা হলো পাকিস্তান ভূ-খণ্ডকে পাশ কাটিয়ে গ্যাসের সহজ পরিবহন করা।

এমন একটি সাম্প্রতিক প্রস্তাব হলো রাশিয়া-চীন-ভারত পাইপলাইন প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাই। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ পরিকল্পনা সম্ভাবনা যাচাইয়ের প্রস্তাবেও ভারত-পাকিস্তানের টানাপড়েনের রেশ পাওয়া যায়। মে ২৮, ২০০২ সনে ইসলামাবাদে ট্রান্স-আফগান পাইপলাইনের পুনরুজ্জীবিত করবার ঘোষণার পরপরই ভারতের ওএনজিসি (ONGC : Oil and Natural Gas Corporation-Overseas) ট্রান্স-আফগান পাইপলাইনের বিকল্পে এ পরিকল্পনা যাচাইয়ের জন্য ঘোষণা দেয়। এ পরিকল্পনা যাকে সংক্ষেপে RCI বলা হয়েছে (Rassia-China-India)। রাশিয়া হতে তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান-কাজাকিস্তান হয়ে চীনের সিনজিয়াং প্রদেশের কাশগড় হয়ে ভারতে প্রবেশ পথের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কাশগড় হতে ভারতে লাদ্দাক অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে সিয়াচীনের সন্নিকট দিয়ে ভারত চীন নিয়ন্ত্রণ লাইনের মধ্যদিয়ে অথবা হিমাচল প্রদেশ দিয়ে উত্তর ভারতে গ্যাস প্রবাহিত করবে। এ পাইপলাইন পূর্বদিকে চীনের প্রস্তাবিত তুর্কমেনিস্তান-উজবেকিস্তান-সিনজিয়াং-সাংহাই পাইপলাইনর সাথে যুক্ত হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জুলাই ৪, ২০০২ চীন রয়েল ডাচ শেল (Royal Dutch Shell) এর নিয়ন্ত্রণে গঠিত কনসোরসিয়ামের সাথে উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হতে সাংহাই পর্যন্ত ৪০০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পাইপলাইন প্রস্তুতের প্রকল্প হস্তান্তর করে। এ পাইপলাইনের প্রাথমিক খরচ ধরা হয়েছে ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পরবর্তীতে এ পাইপলাইন তুর্কমেনিস্তানের সাথে যুক্ত হবার সম্ভাবনা প্রায়

www.pathagar.com

নিশ্চিত। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এ কনসোরসিয়ামে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে রাশিয়ার গেজপ্রম, যুক্তরাষ্ট্রের এক্সন-মোবিল (Exxon-Mobil)। চীনের পেট্রোচায়না এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য ছিল যে, জুন মাসের প্রথমদিকে ভারত কাজাকিস্তানের আলমাতি সম্মেলনের সময়ে সাংহাই–৬ নামে পরিচিত গ্রুপে এ প্রস্তাব রেখেছিল। চীনের পূর্বপশ্চিম গ্যাস পাইপলাইনের সাথে ভারতের প্রস্তাবের যোগসূত্র থাকা স্বাভাবিক। সাংহাই–৬ এর সদস্যবৃন্দ ঐ প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবিত পাইপলাইন তৈরি হলে এটি হবে বিশ্বের এক বিস্ময় কারণ যে পথের পরিকল্পনা করা হয়েছে সে পথ শুধু দূরত্বের দিক থেকেই নয় বরং পৃথিবীর উচ্চভূমিগুলোর উপর দিয়ে নিতে হবে। এ পাইপলাইন যদি কখনও বাস্তবে রূপ নেয় তা হবে একবিংশ শতাব্দীর পুনরুজ্জীবিত 'সিল্ক রুট'। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ বিলিয়ন ডলার। মধ্যএশিয়ার দেশগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করেছে। কারণ মধ্যএশিয়ার দেশগুলো যেকোনো পথে দক্ষিণ এবং পূর্বএশিয়ার বৃহত্তর জ্বালানি বাজারে প্রবেশের জন্য উদগ্রীব।[৬]

এ প্রস্তাবে অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক বিষয়ও জড়িত রয়েছে। এ প্রস্তাবের মধ্যদিয়ে ভারত পাকিস্তান স্বাক্ষরিত ট্রান্স–আফগান পাইপলাইনে অংশগ্রহণ না করবার অভিপ্রায় পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করে। দ্বিতীয়তঃ চীনের ভূ–খণ্ড ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভারত চীনের সাথে অর্থনৈতিক যোগসূত্রের মাধ্যমে বিগত চল্লিশ বছরের তিক্ততার অবসান ঘটাবার প্রয়াস নিতে চাইছে। ভারত বহুদিন থেকেই রাশিয়ার গেজপ্রম আর উজবেকিস্তানের লুকওয়েল (Lukoil) এর বিশ শতাংশ শেয়ার গ্যাস রপ্তানি সমস্যা সমাধান সাপেক্ষে ক্রয় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ পাইপলাইন সম্ভব হলে ভারত শুধু শেয়ারই নয় উজবেকিস্তানের তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের বৃহৎ লগ্নিরও ইচ্ছা রাখে। প্রসঙ্গতঃ উজবেকিস্তান আর কাজাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক অন্য যেকোনো প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র হতে ভালো। মে ২০০২ সনে ভারত কাজাকিস্তানের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ পরিকল্পনা কতখানি সফল হবে সে বিষয়ে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রস্তাবনা কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া অর্থনৈতিক

৬। Kazi "Is the Proposed Rassia-China-India Pipeline Feasible?" Central Asia- Cauccasas Analysis : July 3. 2002.

www.pathagar.com

দিক থেকে কতখানি সম্ভাব্য তা ভেবে দেখবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া ১৯৬২ সনের পর থেকে চীনের পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে ভারত মধ্যএশিয়া রেলপথ নির্মাণের উপর্যুপরি অনুরোধ এ পর্যন্ত চীনের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। কাজেই এ পরিকল্পনা চীনের নিকট কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে।

পশ্চিম দিক হতে সরাসরি প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি ভারতের জন্য এ পর্যন্ত সফল হয় নি। অন্যদিকে ভারতের বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সংকটে জর্জরিত বৃহৎ শিল্প কারখানাগুলো দিল্লির রাজনৈতিক সরকারের উপর এ সংকট মোচনের জন্য ক্রমাগত চাপ অব্যাহত রেখেছে। তাছাড়া ভারতের শাসক দল (২০০২ সন) বিজেপির নেতৃত্বে জোট সরকার এসব সংকটের আশু নিরসন করতে না পারলে এ সংকট নিয়ে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। এসব কারণেই দিল্লি সরকার মায়ানমারের সেনা শাসকদের দ্বারস্থ হয়ে মায়ানমার থেকে উত্তর ভারতের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সে সাথে বাংলাদেশ থেকে বিশ বছরে প্রায় ৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট (4 tcf) গ্যাস আমদানির অপেক্ষায় রয়েছে। এ দু'জায়গা থেকেই পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিবহনের পরিকল্পনা রয়েছে। মায়ানমারের পাইপলাইনের পরিবহন করিডর হিসেবে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডকে বেছে নেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে। উল্লেখ্য, মায়ানমার এবং বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বহুল আলোচিত কোম্পানি ইউনোকলের প্রচুর লগ্নি রয়েছে। ভারতের বাজারে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে ইউনোকলের প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশ সরকার দোদুল্যমান।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জ্বালানি সম্পদের মধ্যে একমাত্র গ্যাসই উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৯ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্যাস উত্তোলন ছিল ৩১৯.৬ বিলিয়ন কিউবিক ফুট। যদিও বাংলাদেশে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় ১৯৬০ সনে সিলেটের ছাতক থেকে তবুও আজ পর্যন্ত এ উত্তোলনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নতুন অনুসন্ধান জারি থাকলেও সঠিক গ্যাসের বর্তমান মজুদ এবং সম্ভাব্য মজুদের সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। কাজেই এ ক্ষেত্রে সঠিক পরিসংখ্যান না থাকার কারণেই বাদানুবাদ লেগেই রয়েছে। ২০০১ সনের শেষের দিকে পেট্রোবাংলা আর নরওয়ের বিশেষজ্ঞ দল জরিপ চালিয়েছিল তাকে সঠিক ধরলে প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ১৬.৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট (tcf) অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

ভিত্তিক ভূ-জরিপ সংস্থার এক জরিপের মতে, বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত মজুদের পরিমাণ মোটামুটি ৩২.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট ধরা যেতে পারে। এ জরিপের মতে, বাংলাদেশ এতদঅঞ্চলের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত হতে পার।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারেও প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। গ্যাস ব্যবহারের নতুন পরিধি গাড়িতে সিএসজি ব্যবহারের সাথে সাথে আরও প্রশস্ত হয়েছে। দেশের বিদ্যুৎ এবং কৃত্রিম সার ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান চাপের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সার কারখানাগুলো তৈরি হচ্ছে সেসব এখন প্রাকৃতিক গ্যাসের মুখাপেক্ষি।

২০০২ সনে বাংলাদেশের সরকারি জ্বালানি সংস্থা পেট্রোবাংলার হাতে প্রায় ২০টির অধিক গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে যার মধ্যে প্রায় অর্ধেকে এ পর্যন্ত গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যেও ৪টি ছাড়া বাকি ক্ষেত্রগুলোতে এ পর্যন্ত যে গ্যাস পাওয়া গেছে তার উত্তোলন অর্থকরী হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যে সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রগুলোকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান গ্যাস ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে সদ্য আবিষ্কৃত ইউনোকল পরিচালিত বিবিয়ানা, তিতাস, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং জালালাবাদ। এর প্রায় সবগুলোই দেশের পূর্বদিকে বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে। আর সাঙ্গু নদীর অববাহিকা জুড়ে এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পৃথিবীর বৃহত্তম খ্যাত কোম্পনিগুলো নিয়োজিত রয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে কেয়ার্ন এনার্জি (Cairn Energy), শেল (Shell) এবং, হেলিবার্টন (Helleburton)। এগুলো সবই যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ভিত্তিক কোম্পানি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি মি. ডিক চেনী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত হেলিবার্টন এর মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) ছিলেন। সাঙ্গু বাংলাদেশের প্রথম উপকূলীয় আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র যা আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৮ সনে এবং এটিই প্রথম সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক কোম্পানি পরিচালিত গ্যাস ক্ষেত্র। এর প্রমাণিত মজুদ খুব বেশি না হলেও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। বর্তমানে প্রায় ৮৫০ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (bcf) মজুদ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।

জানুয়ারি ২০০০ সনে সাঙ্গু প্রজেক্টের অন্তর্গত সাঙ্গু-১ এ শেল বাংলাদেশ এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (SBED) একটি ক্ষেত্র আবিষ্কারের ঘোষণা এর বিস্তারিত এখনও জানা যায় নি। এরই প্রেক্ষিতে আগস্ট ২০০০ সনে শেল প্রায় ৪০-৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে আর এ প্রকল্পে ব্লক-১৫

www.pathagar.com

সন্দীপের পূর্বে খনন কাজে হাত দিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জায়গাগুলোতেও অনুসন্ধান চলছে তবে এসবের সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে, এসব ছোটছোট ক্ষেত্রগুলোতে ৫০০–১০০০ বিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস মজুদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আর যেসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চলছে তার মধ্যে রয়েছে সালদা নদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, ফেনী, কুমটা এবং শাহবাজপুর।

যে সমস্ত বৈদেশিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে সাবসিডিয়ারি গঠন করে কাজ করছে তাদের মধ্যে শেল এবং ইউনোকল প্রধান। এদুটি কোম্পানি লং টার্ম ভিত্তিতে বাংলাদেশে গ্যাসের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। ১৯৯৭ সনে ইউনোকল বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মত প্রবেশ করে এবং ঐ সময়ে অক্সিডেন্টালের ব্লক–১২, ১৩ এবং ১৪ এর ৫০% অংশীদারিত্ব কিনে নেয় এবং পরে এসব ব্লকের গ্যাস পেট্রোবাংলার সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ঐ সমস্ত ব্লকে প্রবেশ করে। ১৯৯৮ সনে অক্সিডেন্টাল–ইউনোকল সিলেটের বিবিয়ানাতে দেশের সর্ববৃহৎ মজুদ খুঁজে পায় যার পরিমাণ ৪–৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট (tcf), এতে ব্লক–১২ এবং অন্যান্য ব্লকে প্রাপ্তির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ১৯৯৭ সনে সিলেটে একটি কূপে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতির মুখে অক্সিডেন্টাল ১৯৯৮ সনে সমস্ত দায়দেনাসহ স্বত্ব ইউনোকলের কাছে হস্তান্তর করে। অক্সিডেন্টাল এসব লাভবান ক্ষেত্র থেকে কেন নিজেকে গুটিয়ে নেয় তা হয়তো সহজে জনা যাবে না তবে মাগুরছড়া নামক কূপের অগ্নিকাণ্ডে হাজার কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি এবং জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি পূরণে অক্সিডেন্টালের উত্তরাধিকারী ইউনোকল এখনও ক্ষতিপূরণ দিতে গড়িমসি করছে। বাংলাদেশ সরকার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় সুবিধা করতে পারছে না। কাজেই ভবিষ্যতে আদালতের শরণাপন্ন হবে কিনা সেটিও ভাবার বিষয়। মাগুরছড়ার কথায় পরে আসব।

১৯৯৭ সনের পরে বাংলাদেশ দ্বিতীয় দফায় বিদেশী কোম্পনিগুলোকে গ্যাস এবং তেল অনুসন্ধানের অনুমতি দেয় এবং তারই প্রেক্ষিতে কেয়ার্ন, রয়েল ডাচ শেল এবং ইউনোকল যথাক্রমে ৫, ১০ এবং ৭ নম্বর ব্লকে অনুসন্ধানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ২০০১ সনে বাংলাদেশ ইউনোকলের সাথে উৎপাদনে অংশীদারিত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করে বিশেষ করে ৭ নং ব্লকের জন্য। এপ্রিল ২০০১ সনে বাংলাদেশ ব্লক–৯ এ অনুসন্ধানের জন্য একটি কনসোরসিয়াম তৈরি করে যাতে যোগদান করে স্যাভরন, টেরসাকো এবং তাল্লো অয়েল।

বর্তমানে এসব বিদেশী কোম্পানি ছাড়া আভ্যন্তরীণ গ্যাস সাপ্লাইয়ের

www.pathagar.com

জন্য নিয়োজিত রয়েছে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি এবং বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি।

যে ক্ষেত্রগুলোতে এ পর্যন্ত গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে শাহাবাজপুর পেট্রোবাংলার কোম্পানি বাপেক্স মাত্র ৩৩০–৪০০ বিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস আবিষ্কার করেছে। এ আবিষ্কারের পরপরই পেট্রোবাংলা আর ইউনোকল যৌথভাবে এ ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করবার উদ্যোগ নিয়েছে। ১৯৯৮ সনেই শেল এবং কেয়ার্ন একজোট হয়ে সাঙ্গু এবং সেমুতাং ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং উৎপাদনের জন্য কাজ করছে।

উপর্যুক্ত বিবরণ মোতাবেক এখন অব্দি এসব আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোই বাংলাদেশে লগ্নি করেছে তবে একথা ঠিক যে, এসব কোম্পানির মধ্যে ইউনোকলই সবচেয়ে শক্তিধর আর এ কোম্পানির সাফল্যই বেশি। বর্তমানে ইউনোকলের পরিকল্পনাধীন পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিবহনযোগ্য গ্যাস রপ্তানি নিয়েই চলছে সরকারি মহলে বিভিন্ন মতবাদ। চাপ আসছে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা আর লগ্নিকারীদের কাছ থেকে গ্যাস রপ্তানির জন্য। সে সাথে দেশের অভ্যন্তরে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে বিদেশী কোম্পানির দালালিতে নিয়োজিত রয়েছে অনেক ভুঁইফোঁড় চিন্তাবিশারদরা।

বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এ গ্যাস রপ্তানি চুক্তির আওতায় আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর চাপের মুখে থাকবে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, তৃতীয় বিশ্বে এসব বৃহৎ লগ্নিকারী কোম্পানিগুলো অনেক সময় সেদেশের সরকার থেকেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, যেকোনো ক্ষয়ক্ষতিও সরকারের কাঁধে চাপায় অথবা সাধারণত ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণও প্রদান করে না। ভারতের ভূপাল দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের সামান্যতম অংশ আজও পূরণ করা হয় নি। আমাদের দেশে অক্সিডেন্টালের মাগুরছড়া কূপে জুন ১৪, ১৯৯৭ সনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রায় দু'পক্ষকাল যে অগ্নিনির্বাপন না করতে পারায় সম্পদ ধ্বংস হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আজও আমাদের সরকার আদায় করতে পারে নি। বাংলাদেশ সরকার প্রথমে অক্সিডেন্টাল এবং পরে ইউনোকল এর নিকট ২.৫ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়া বাবদ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা দাবি করে। তদুপরি অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি সহ প্রায় আরও ২০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়।

www.pathagar.com

সূত্রমতে, ইউনোকল রেলওয়ে এবং চা বাগানের ক্ষতি বাবদ সামান্য ক্ষতিপূরণ দিলেও অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দিতে প্রায় অস্বীকার করে।

মাগুরছড়ায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা আজও চোখে পড়ার মত। প্রায় ১৭ থেকে ২১ দিন পর মাগুরছড়ার আগুন নেভানো সম্ভব হয়। এ আগুনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় সরকারের বন বিভাগের রিজার্ভ ফরেস্টের। বাংলাদেশের ইতিহাসে মানুষের সৃষ্ট এতবড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বোধহয় আর নজির নেই।

অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, ঐ প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তার গাফিলতিতেই এতবড় দুর্ঘটনা ঘটেছে যদিও একথা কোম্পানির কর্মকর্তারা মেনে নেন নি। এ দুর্ঘটনায় প্রায় ৮৭.৫০ একর বনভূমি সম্পূর্ণভাবে জ্বলে যায়। যাহোক, ইউনোকল মাগুরছড়াসহ অন্যান্য প্রজেক্টের জন্য পেট্রোবাংলাকে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে বলে সূত্রে প্রকাশ।[৭]

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এ জ্বালানি কোম্পানি বাংলাদেশে গ্যাস ক্ষেত্রে লগ্নি এবং সিলেটের বিবিয়ানার ১২ নং ব্লকে গ্যাস প্রাপ্তির পর থেকে গ্যাস রপ্তানির পাঁয়তারা চলছে। এ বিতর্ক শুরু হয় বিগত শতকে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে। তৎকালীন সরকার আভ্যন্তরীণ এবং তথাকথিত বৈদেশিক চাপের মুখে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে গ্যাস রপ্তানির সম্ভাবনায় উৎসাহিত হলেও বাংলাদেশে এর সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ধারণায় বাস্তবায়ন করতে পারে নি। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সফরকে ঘিরেও এ বিতর্ক জন্ম দিয়েছিল। এ সফরকে গ্যাস রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের আর এক প্রয়াস বলে বাংলাদেশের জনগণের মনে হওয়াতে সরকারকে বেশ বিব্রত হতে হয়। এ বিব্রতবোধের কারণেই তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে গ্যাস সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয় নি। তিনি আরও বলেন, 'দেশের জন্য পঞ্চাশ বছরের মজুদ নিশ্চিত করবার পরই উদ্বৃত্ত গ্যাস রপ্তানির চিন্তা করা হবে।'

পরবর্তী বিএনপি সরকারের সামনেও গ্যাস রপ্তানি একটি মুখ্য বিষয়ে রূপান্তরিত হয়। সরকারের বিভিন্ন মহল বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীবর্গ ক্রমেই ভারতে গ্যাস রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য লাভবান হবে বলে দেশবাসীকে জ্ঞাত করবার প্রয়াসে ব্রত থাকেন। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়েও ভারতে গ্যাস রপ্তানির জন্য নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে গর্জে উঠেন বহু চিন্তাবিদরা। সরকার

৭। Audity Falguni 'Magurchari' The Independent, Dhaka, March 31, 2000.

www.pathagar.com

সঠিক পন্থা নির্ণয়ের জন্য সরকারি পর্যায়ে দুটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। এর একটি ছিল বর্তমানের মজুদের ভিত্তিতে রপ্তানির সম্ভাবনা যাচাই করা, অন্যটি সঠিক মজুদ নির্ণয় করা। কিন্তু এ দুটি কমিটি পৃথক পৃথক যে দুটি রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করেছে তাতেও দু'ধরনের সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। এর একটি 'গ্যাস রিজার্ভ নির্ণয় কমিটি' (National Committee on Gas Reserve; NCGR) তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশের মজুদ ৩ জুলাই ২০০২ সনে ১২ টিসিএফ হতে ১৫.৫ টিসিএফ এর মধ্যে হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পরিমাণ ২০২০ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এ কমিটি অবশ্য তাদের প্রতিবেদন নরওয়ের প্রতিবেদন দ্বারা প্রভাবিত বলে উল্লেখ করেছিল। এতে আরও বলা হয় যে, মজুদ নিরূপণের জন্য এ কমিটি দেশের ১২টি চিহ্নিত গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে প্রধানত তিতাস, বিবিয়ানা, রশিদপুর এবং হবিগঞ্জের গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর মজুদের পরিমাণ থেকে উপরোক্ত পরিমাণ নির্ধারণ করেছে।

এ কমিটির একজন সদস্য অবশ্য বলেছিলেন যে, যদি জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ৩ হতে ৭ শতাংশের মধ্যে ধরা হয় তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের চাহিদা মেটাতে অনুমানেয় ৪২ হতে ৭২ টিসিএফ গ্যাসের প্রয়োজন হবে। এ কমিটি তাদের প্রতিবেদনের শেষাংশে উল্লেখ করে যে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বাড়াতে হলে সীমিত আকারে গ্যাস রপ্তানি করা যেতে পারে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর চাপের মধ্যে প্রধান কোম্পানি ইউনোকল তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে যে, সহসা গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত না নিলে বাংলাদেশ সরকার 'বর্তমান সুযোগের উন্মুক্ত দ্বারের সুবিধা পাবে না'। তাদের মতে, বাংলাদেশের গ্যাস ভারতের বৃহৎ বাজারে এ সময়েই প্রবেশ না করলে ভারতের বাজার এবং অন্যান্য দেশের রপ্তানির কারণে হয় সম্পূর্ণ বন্ধ অথবা সংকুচিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধারণা কতখানি সত্য তা ভারতের বাজার, শিল্প কারখানাগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা আর আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার সংঘাতপূর্ণ পরিবেশের বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে যাচাই করা সম্ভব নয়। তবে ইদানিং ভারতের বিশেষজ্ঞরা যে মতামত দিয়েছেন তাতে মনে হয় না যে, ভারত কোনোভাবেই তার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারবে।

ডিসেম্বর ২০০২ সনে ভারতের সংসদে পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উপমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গানওয়ার বলেছেন যে, ভারতের পূর্ব উপকূলে

www.pathagar.com

বিশ্বমানের প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনার পরও 'চাহিদা আর সরবরাহের মধ্যে বিশাল ব্যবধান থেকেই যাবে'। অধুনা ভারতের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কানাডার নিকো রিসোর্স অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা গোদাবরী তটে যে গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে তাতে প্রতিদিনে ২৫–৩৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস উত্তোলন এবং বাজারজাতকরণের সম্ভাবনা থাকলেও বর্তমানের চাহিদা প্রতিদিনে প্রায় ৫০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার মেটাতে সক্ষম হবে না। এক প্রতিবেদনে বলা হয় ভারতের 'হাইড্রোকার্বন ভষন' ২০২৫ এ গ্যাসের ব্যবহারের মাত্রা ধরা হয়েছে ১৫১ মিলিয়ন কিউবিক মিটার দিনপ্রতি। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে এ চাহিদা ২০০৬–৭ সনেই বৃদ্ধি পেয়ে দিনপ্রতি ২৩১ কিউবিক মিটারে দাঁড়াবে। এ চাহিদার বিপরীতে বর্তমানে সর্বসাকুল্যে দিনপ্রতি ৬৫ কিউবিক মিটারের সরবরাহ রয়েছে মাত্র।

সাম্প্রতিক তথ্যগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, ভারতে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাজার আরও বহু বছর উন্মুক্ত থাকবে। আর ভারতকে এ চাহিদা মেটাতে হলে ভবিষ্যতেও তার দ্বার আমদানির জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা যেতে পারে যে, ভারতে বাংলাদেশের গ্যাসের বাজার আরও অনেকগুলো বছরের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

যে গ্যাস রপ্তানি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের চাপ বাংলাদেশের উপরে অব্যাহত রয়েছে তারই প্রেক্ষিতে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তেল–গ্যাস কোম্পানি ইউনোকল বেশ পূর্বেই তাদের রপ্তানি বিষয়ক পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করেছিল।

তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্যাস রপ্তানির প্রক্রিয়ার প্রজেক্টের নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ ন্যাচারাল গ্যাস পাইপলাইন প্রজক্ট বা সংক্ষেপে বিএনজিপিপি (Bangladesh Natural Gas Pipeline Project : BNGPP) পেট্রোবাংলাকে (Petrobangla) দাখিল করা এ প্রজেক্টে ৩০ ইঞ্চি মোটা ১,৩৬৩ কিলোমিটার পাইপলাইন তৈরি করে বাংলাদেশের উত্তরের বিবিয়ানা ক্ষেত্র থেকে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং উত্তর ভারতের বাজারে রপ্তানি করা হবে। পরবর্তীতে এ পাইপলাইন দিল্লি হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে। প্রাথমিকভাবে এ পাইপলাইনে প্রতিদিন ৫শ' মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস রপ্তানি করার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ভারতের ভেতরের বাজার এবং অন্যান্য লাইনের সংগে সংযুক্তকরণ ভারতের কনসোর্টিয়াম

www.pathagar.com

(consortium) কতৃর্ক প্রস্তুত করা হবে।

এ রিপোর্টে বলা হয়েছে পাইপলাইন তৈরি এবং সরবরাহ শুরু হবার পর থেকে ভবিষ্যতে বিশ বছর সময়ে বাংলাদেশ রাজস্ব বাবদ ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সমতুল্য টাকা ২০,০০০ কোটি) আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রস্তাবিত পাইপলাইন তৈরি বাবদ লগ্নি আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, এ প্রজেক্ট কার্যকর হলে বাংলাদেশ গ্যাস ভিত্তিক জ্বালানি বিষয়ে আঞ্চলিক কার্যক্রম ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইউনোকল এর প্রতিবেদনে যে বিষয়টির উপর বারবার গুরুত্ব দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে তা হলো window of opportunity (সম্ভাবনার জানালা) আশু সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এক্ষুণি ভারতের উন্মুক্ত ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাজারে প্রবেশ করবে, না এ সুযোগ হাত ছাড়া করবে। এ মতামত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এতে মনে হয় বাংলাদেশ সরকারকে এক ধরনের চাপের মধ্যে ফেলা হয়েছে। ইউনোকল তিনটি সুস্পষ্ট ভারতীয় বাজারের কথা বলেছে। প্রথমতঃ এইচবিজে (HBJ) উত্তর ভারত রুট মার্কেট। রুট মার্কেট বলতে পাইপলাইনের গতিপথের বাজারগুলোর কথা বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, প্রধান গতিপথের ৬টি পার্শ্বপথের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে দূর্গাপুর/কলকাতা, বারাওনি, বোকারো, ফুলপুর, কানপুর, অউরিয়াসহ অন্যান্য সেন্টারে সাপ্লাই করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ভারতের বোকারোতে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ স্টিল মিল। এক কথায় ভারতের প্রায় সমস্ত বড় ভারি শিল্প স্থাপনা প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

ইউনোকল এরই মধ্যে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে লেটারস অব ইন্টারেস্ট (LOI) এবং সমঝোতা স্মারক সংগ্রহ করেছে। এদের সমষ্টিগত চাহিদা রয়েছে দিনে ৩.২ বিলিয়ন ঘনফুট যা প্রস্তাবিত সরবরাহের ৬ গুণ বেশি। এর অর্থ দাঁড়ায়, এ চাহিদা মেটাতে হলে ইউনোকলকে গ্যাস সরবরাহ আরও বাড়াতে হবে এবং প্রয়োজন হবে নতুন উৎসের এবং আরও পাইপলাইনের। বাংলাদেশের গ্যাস ভারতের ভেতর পরিবহনের জন্য ভারতে যে কনসোর্সিয়াম প্রস্তাবিত হয়েছে তা ভারতের পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে। এতে যোগ দিয়েছে ইন্ডিয়ান ওয়েল কোম্পানি লিমিটেড, গ্যাস অথোরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ওয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড–এ কনসোর্টিয়াম গ্যাস আমদানির অপেক্ষায়।

www.pathagar.com

ইউনোকলের রিপোর্টে বাংলাদেশে গ্যাস উৎপাদনের যে সম্ভাব্যতা দেখানো হয়েছে তাতে বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অতি সম্প্রতি জিওলজিক্যাল সার্ভে পেট্রোবাংলা এবং বাংলাদেশ খনিজ ও জ্বালানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের হাইড্রোকার্বন ইউনিট সম্মিলিত এক সমীক্ষা চালিয়েছে। এসব সমীক্ষায় নিম্নবর্ণিত ফলাফলের মতামতের বর্ণনা দিয়েছে।

(১) এইচ সি ইউ এর সমীক্ষায় ধরা হয়েছে, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের ২২টিতে মজুদ পরিমাণ রয়েছে ২০.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং ২০০১ সন পর্যন্ত রয়েছে ১৬.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

(২) ইউনোকল এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব ক্ষেত্র থেকে আরও ১২.৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট উত্তোলন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৩) পেট্রোবাংলা, এইচ সি ইউ এবং অন্য এজেন্সিগুলোর মতে, এখনও অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে আরও ৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে ধারণা করা যায়।

এসবের যোগফল হিসেবে বাংলাদেশে গ্যাসের উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে আনুমানিক ৬৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এসব সমীক্ষায় ব্যবহারের মাত্রাকে হিসেবে ধরে পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ দিনপ্রতি ১১০০ মিলিয়ন ঘনফুট, কাজেই ৬৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রায় ১৬০ বছরে নিঃশেষিত হওয়ার কথা।

ইউনোকল এর এ রিপোর্টে আগামী ২০ বছরে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও দেশে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস উদ্বৃত্ত থাকবে। উল্লেখ্য, ইউনোকল আগামী ২০ বছরের চুক্তির ইচ্ছা রাখে। এখানে বিশ্ব বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ফার্ম উড ম্যাকেনজির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, বিবিয়ানা ক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশের বাজারে গ্যাস সরবরাহ করতে দেশীয় প্রক্রিয়ায় আরও ৮ বছরের এবং এর আংশিক ব্যবহার এবং পুনঃউত্তোলন ক্ষমতা অর্জনে আভ্যন্তরীণ বাজারকে আর ১৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ২০০৮ সন পর্যন্ত বর্তমান চাহিদা পূরণ করার জন্য পেট্রোবাংলা বর্তমানে চলতি ক্ষেত্র এবং ভবিষ্যৎ সমআবিষ্কারের অপেক্ষমান ক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলন করলেই যথেষ্ট হবে।

ইউনোকল এর রিপোর্টে উপসংহারে পুনঃগুরুত্ব দিয়ে বলা হয়,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির ক্ষেত্র থাকলেও তা সময়সাপেক্ষ। ত্বরিত সিদ্ধান্ত না নিলে তা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলা হয়েছে, ভারতের ক্রমবর্ধমান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারে প্রকল্পগুলো এখনও উন্মুক্ত থাকলেও এরা এদের পরিকল্পনায় বহুদূর এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি এবং এর সাফল্য নির্ভর করবে সময়মত নেয়া সিদ্ধান্তের উপর (সব তথ্য ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত)।

উপরের সমীক্ষায় ধারণা করা যেতে পারে, ইউনোকল বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারটি একরকম নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছে। বিশ্বের এ বৃহৎ কোম্পানি পৃথিবীর প্রায় গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তে গ্যাস রপ্তানির কাজে নিয়োজিত। এ অঞ্চলের জন্য ইউনোকলের মার্কেট এরিয়া ভারতকে ধরা হয়েছে। ইউনোকল ইতিমধ্যে মায়ানমারের আন্দামান সাগর তটের ইয়াদানা ক্ষেত্রে মায়ানমার ওয়েল এন্ড গ্যাস এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে অংশীদার হিসেবে চুক্তি করেছে। মায়ানমারের সরকার কর্তৃক পরিচালিত এর সঙ্গে এক্ষেত্রে সম্প্রারণ আর থাইল্যান্ডের অন্যতম বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস রপ্তানির চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ও পাইপলাইন তৈরির জন্য ১.২ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প করা হয়েছে এবং এর কাজ প্রায় শেষের পথে। এ পাইপলাইন তৈরি করে মায়ানমারের সেনা সরকার এবং ইউনোকলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পরিবেশ বিনষ্ট করণের অভিযোগ এনেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই মানবাধিকার ও পরিবেশবাদিরা দুটি মামলা রুজু করেছিল।

মধ্যএশিয়ায় বিশেষ করে তুর্কমেনিস্তান–আফগানিস্তান–পাকিস্তান পাইপলাইন নিয়ে ইউনোকল আর আর্জেন্টিনার বিরদাস এর সঙ্গে বিবাদ ইতিহাস হয়ে রয়েছে। মামলা করে বিরদাসকে এ অঞ্চল থেকে বিদায় করতে হয়েছে। ১৯৯৮ সন পর্যন্ত এ পাইপলাইনের কারণে আফগানিস্তানে তালেবান শাসকদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সোচ্চার হয় নি। ১৯৯৯ সনে আফগানিস্তানে খোস্ত নামক এলাকায় ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মিসাইল হামলার পর ইউনোকল এ অঞ্চলের পাইপলাইন পরিকল্পনা বন্ধ রাখে। এ পাইপলাইনের প্রধান বাজার ও পাকিস্তানের সুই হয়ে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে ইরানের মধ্যদিয়ে পাইপলাইন তৈরির ব্যাপারে এখনও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আপত্তি রয়েছে। ইতিমধ্যে গতবছর পাক-ভারত আগ্রা সম্মেলনের আগে ইরান আর ভারতের মধ্যে এবং ইদানিং মায়ানমারের সঙ্গে

www.pathagar.com

ভারত গ্যাস সরবরাহের চুক্তি করেছে বলে খবরে প্রকাশ। পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতার কারণে ইরান থেকে ভারতের গ্যাস প্রাপ্তির আশু সম্ভাবনা নেই। মায়ানমার থেকে গ্যাস আমদানির সংক্ষিপ্ত পথের জন্য প্রয়োজন হবে বাংলাদেশের। ভারতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হলে এসব আমদানি অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্যাস আমদানির প্রয়োজনীয়তা আরও প্রকট হয়েছে এনরন নামে অন্যতম বৃহত্তম মার্কিন কোম্পানির দেউলিয়া হবার পর। এনরন ভারতের মহারাষ্ট্রের ধাবরে অন্যতম বৃহত্তম বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনার কাজে চুক্তিবদ্ধ ছিল। ভারতের মহারাষ্ট্রের পূর্বতন সরকারের সঙ্গে এনরন প্রজেক্ট নিয়ে মতানৈক্য হলে এর কাজ বহুদিন বন্ধ থাকে। বর্তমানে এ প্রজেক্টের কাজ পুনরায় শুরু হলেও এনরনের কেলেংকারীর পর তা স্তিমিত হয়ে রয়েছে। এনরন (ENRON) অবশ্য বলেছে যে, ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের বিষয়ে মূল এনরনের দেউলিয়া হওয়ার কোনো প্রভাব পড়বে না। এরই মধ্যে খবরে প্রকাশ, এনরন নাম বদলিয়ে শিগগিরই নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করবে।

বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে তাতে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর উৎসাহই বেশি। এ উৎসাহের কারণ শুধু বাংলাদেশের গ্যাসের ব্যাপারেই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ বাজার ভারতের চারদিক মধ্যএশিয়া তথা পূর্বএশিয়ার মায়ানমারের গ্যাস সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে এসব কোম্পানি বাংলাদেশের রপ্তানির ব্যাপারে অতি উৎসাহি মনে হয়। লক্ষণীয় যে, প্রায় পঞ্চাশ বছর পর মায়ানমারের সেনা শাসকরা তাদের কট্টর বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেলেছে। ইদানিং গণতন্ত্রবাদী নেত্রী অং সান সুচির মুক্তির ঘটনাটিকেও অনেকে মায়ানমারের আন্তর্জাতিক লগ্নির ব্যাপারটিকে সম্পৃক্ত করছেন। বলা হয়ে থাকে, দক্ষিণ মায়ানমারের পর্যাপ্ত গ্যাস এবং তেলের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোর সম্ভাব্য বাজার পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আর দক্ষিণ এশিয়া।

এই আন্তর্জাতিক রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে বাংলাদেশ একা দাঁড়িয়ে থাকতে পরছে না। তবে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেও বাংলাদেশের ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। আমাদের দেশকে দ্রুত শিল্পায়ন করতে হলেও প্রাকৃতিক গ্যাসই হবে আমাদের একমাত্র সস্তা জ্বালানির উৎস।

পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্যএশিয়ায় বর্তমানে জ্বালানি নিয়ে যে আন্তর্জাতিক খেলা চলছে তাতে দেশের বৃহত্তম ভোক্তা দেশগুলো সরাসরি

www.pathagar.com

জড়িত। আর এসব দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বাগ্রে–যদিও জাপানের চাহিদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে ইউরোপ এবং রাশিয়াও অধিকাংশ জ্বালানি যার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসও রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে ক্রমেই এসব দেশ মধ্যএশিয়ায় নতুন সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে লগ্নি করছে। পৃথিবীর বৃহত্তম তেল–গ্যাস কোম্পানিগুলোর সিংহভাগই যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক, তার পরেই আসে বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া আর জাপান। এসব দেশ তৃতীয় বিশ্বে জ্বালানি খাতে ক্রমাগত লগ্নি করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ কোম্পানিগুলো এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে বহু যুগ ধরে কাজ করছে। এদের অন্যতম প্রধান ইউনোকল যার পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

জ্বালানিকে কেন্দ্র করে বিশ্বের কূটনৈতিক দাবার গুঁটি হিসেবে দক্ষিণ এশিয়া অন্যতম। ইউনোকল ভারত–বাংলাদেশ–পাকিস্তান এবং মায়ানমারে অত্যন্ত তৎপর। এসব দেশের প্রতিটিতেই এ কোম্পানির তৎপরতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে, বিশেষ করে ভারত–বাংলাদেশ আর মায়ানমারে। বর্তমানে পাকিস্তানে এবং মায়ানমারে ইউনোকল এর তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ বাজার যে ভারত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইউনোকল বাংলাদেশকেও বিশ্বের জ্বালানি রাজনীতির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য মোতাবেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ কোম্পানি ২০০২ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লগ্নি করেছে। তাছাড়াও ইদানিং এ কোম্পানি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকাতরে অর্থ অনুদান দিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে প্রস্তাবিত হচ্ছে বাংলাদেশের ভূ–খণ্ড ব্যবহার করে মায়ানমার হতে ভারতের জন্য পাইপলাইন নিয়ে যাবার। এ প্রস্তাব বিএনপি সরকারের নিকট উত্থাপন করে এক অজ্ঞাত পরিচিত কোম্পানি মোহনা হোল্ডিং লিমিটেড। এ ধরনের পরিকল্পনার কথা আমরা ইতিপূর্বেই বিভিন্নস্থানে বলেছি। বাংলাদেশ গ্যাস রপ্তানির জন্য জোর দেবার পেছনে এ প্রকল্পের কিছুটা যোগসূত্র রয়েছে। সে বিষয়ে পরে আলোচনায় আসবার ইচ্ছা রাখি।

মায়ানমার–বাংলাদেশ–ভারত গ্যাস পাইপলাইনের সম্ভাব্য রাস্তা ধরা হয়েছে মায়ানমার হতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যদিয়ে কুমিল্লা এবং রাজশাহী হয়ে ভারতে প্রবশ করবে। সংবাদে প্রকাশ এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরও বলা হয়েছে, এ প্রকল্পের জন্য একটি কনসোরসিয়াম গঠিত হবে আর বাংলাদেশ সরকারের হয়ে প্রমুখ ভাগীদার হবে

www.pathagar.com

পেট্রোবাংলা। এ বিষয়ে রাজনৈতিক পক্ষই অতি উৎসাহী মনে হচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে যে, শর্ত থাকবে যে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত পাইপলাইনের সমস্ত দায়িত্ব থাকবে বাংলাদেশের এবং এ পাইপলাইন বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক হবে। অনুমান করা হচ্ছে যে, এতে পাইপলাইন ভাড়া বাবদ সরকার পাবে বাৎসরিক ১০০০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ অংশে স্থাপনে খরচ হবে ৯০০ কোটি টাকা। এ পাইপলাইনের ব্যাস হবে ৩০–৪০ ইঞ্চি, তবে দিনপ্রতি কত ঘনফুট গ্যাস ভারত আমদানি করবে তার বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নি। এটি এখনও প্রস্তাব আকারে রয়েছে। সরকার প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখছে। অনেকেই এ প্রস্তাবে উৎফুল্ল হলেও পেট্রোবাংলা এ প্রস্তাবে এখনও কোনো মতামত দেয় নি বলে খবরে প্রকাশ।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমার যার পূর্ব নাম ছিল বার্মা। বার্মার সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ সুপ্রাচীন। মায়ানমারে ১৯৬২ সন থেকে সেনা শাসনের জন্য সে দেশটি আজও প্রায় একঘরে হয়ে রয়েছে। তবে বিগত দু'দশক ধরে মায়ানমারের সরকার তেল এবং গ্যাস আবিষ্কারের ক্ষেত্র বিশ্বের জন্য খুলে দিয়েছে। এরই সুবাদে বিশ্বের অতি পরিচিত কোম্পানিগুলো মায়ানমারে গ্যাস এবং তেল অনুসন্ধানের খাতে প্রচুর অর্থ লগ্নি করেছে। ১৯৯৮ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মায়ানমারে এ পর্যন্ত মোট ২৬.৫ টিসিএফ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র যেটি নিয়ে প্রচুর প্রচার হয়েছে সেটি হলো আন্দামান সাগর তটের ইয়াদানা ক্ষেত্র।

ইয়াদানা ক্ষেত্রের অন্যতম শরিক ছিল বিশ্ববিখ্যাত ইউনোকল কোম্পানি। ইয়াদানায় রয়েছে ৫ টিসিএফ গ্যাসের মজুদ যা বিশ্বের উন্নততম প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে ধরা হয়। মায়ানমার গ্যাস ক্ষেত্র প্রজেক্টের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে শুধু উত্তোলনই নয়, সামিল ছিল পাইপলাইনের মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ডে গ্যাস রপ্তানি। এ কাজ ১৯৯৮ সনে সম্পন্ন করা হয়েছিল। এখান থেকে থাইল্যান্ডের রিচুবারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস রপ্তানি করা হলেও এ ক্ষেত্রে গ্যাস উদ্বৃত্ত থেকে যায়। আর এ রপ্তানি নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ইউনোকল সমস্যায় পড়ে।

২০০২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লসএঞ্জেল্‌সে উচ্চতর আদালতে মায়ানমারে পাইপলাইন তৈরির সময় পরিবেশ বিনষ্ট আর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সেনা শাসকদের সাথে যোগসাজসের দুটি পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সন থেকেই মানবাধিকার সংরক্ষণ সংস্থাগুলো ইউনোকল এর বিরুদ্ধে পাইপলাইন তৈরির জন্য বলপূর্বক শ্রম আদায়, শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন প্রদান, অত্যাচার এবং অমানুষিক আচরনের অভিযোগ আনে। তবে এক পর্যায়ে এসব অভিযোগ আদালত কোম্পানির পক্ষে খারিজ করে দেয়।

ইয়াদানা ক্ষেত্রের অন্য শেয়ার হোল্ডার কোম্পানিগুলোর অন্যতম ফ্রান্সের টোটাল তার ৩১ শতাংশ শেয়ার ইউনোকল এর নিকট বিক্রি করে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়। অন্যদিকে ২৮ শতাংশ শেয়ারের মালিক ইউনোকল টোটালের শেয়ারগুলো কিনে নিলেও ১৯৯৮ সনের শেষের দিকে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি মায়ানমার সরকার কর্তৃক সে দেশে গণতন্ত্র হরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদির জন্য অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করলে ইউনোকল তাদের শেয়ারগুলো মায়ানমারের জাতীয় তেল কোম্পানি MOGE (Mayanmar Oil and Gas Enterprise) এর কাছে বিক্রয় করে আপাতত উক্ত প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়। মায়ানমার সরকার বর্তমানে এ ক্ষেত্রের উত্তোলন হতে রাষ্ট্রীয় কোম্পানির আয় বাড়াবার জন্য রপ্তানি বাজার খুঁজছে। এরই প্রেক্ষিতে ভারতের বাজারে রপ্তানির দ্বার উন্মুক্ত করেছে। স্মরণযোগ্য যে, ডিসেম্বর ২০০২ সনে মায়ানমারের সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এক সংক্ষিপ্ত সফর করেন। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এ সফরের পেছনে মায়ানমার –বাংলাদেশ–ভারত পাইপলাইনের বিষয়টিই অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল।

ইউনোকল মায়ানমারে তাদের কার্যকলাপ বর্তমানে স্থগিত রাখলেও ইয়াংগুনের বর্তমান রাজনৈতিক উদারতার আভাসের আঙ্গিকে মনে হয় যে, বৈদেশিক লগ্নি পুনরায় ইয়াংগুনে পৌছা শুরু করবে। দীর্ঘ একযুগ গৃহবন্দি রাখার পর মায়ানমারের সামরিকজান্তা সে দেশে প্রায় একযুগ আগে অনুষ্ঠিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নির্বাচিত নেত্রী অং সাং সুচিকে মুক্তি দিয়েছে। ইতিমধ্যে সুচিও বর্তমানে সরকারের সাথে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিয়ে একযোগে কাজ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অং সাং সুচি মায়ানমারের (বার্মা) স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্র সৈনিক এবং প্রথম হবু প্রধানমন্ত্রী জেনারেল অং সানের একমাত্র কন্যা। জেনারেল অং সান স্বাধীনতার কয়েক মাস পূর্বেই ১৯ জুলাই ১৯৪৭ সনে তৎকালীন সংসদ এবং ৬ জন মন্ত্রী সহ আততায়ীর হাতে নিহত হন। মায়ানমারের স্বাধীনতার পরপরই সুচির মাতা ভারতে তৎকালীন বার্মার প্রথম

The Independent, Dhaka, 18 December, 2002.

www.pathagar.com

রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলে দু'বছর বয়সের সুচি ভারতেই বিদ্যার হাতেখড়ি নেন। সুচি ১৯৬০ সন পর্যন্ত ভারতে লেখাপড়া শেষ করে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য গমন করেন, পরে একজন বৃটিশ নাগরিকের সাথে বিয়ে হলে সেখানে থেকে যান। ১৯৮৮ সনে রুগ্ন মাতাকে দেখতে এসে মায়ানমারের রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির সাথে জড়িত হয়ে পড়লে সামরিক সরকার গৃহবন্দি করলেও সে অবস্থা থেকেই তাঁর দল নির্বাচনে প্রায় ৮০ ভাগ আসন দখল করে। জুন ১৯, ১৯৪৫ তে জন্মগ্রহণকারী সুচি ১৯৯১ সনে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। আজও সুচি গণতন্ত্রের তালাশে মায়ানমারের রাজনীতিতে একমাত্র নয়ন।

যাহোক, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ থাকলেও বিশ্ব জ্বালানি পরিস্থিতি এবং গণতান্ত্রিক নেত্রী সুচির প্রতি ইয়াংগুনের শাসকদের নমনীয়তার কারণেই অল্প পর্যায়ে হলেও বৈদেশিক লগ্নি আসতে শুরু করেছে। বর্তমানে মায়ানমারের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলোতে গ্যাস এবং সীমিত পরিমাণে প্রাপ্ত তেল ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়নের জন্যই প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। অনেকেই মনে করেন, গ্যাসের পাশাপাশি মায়ানমারের তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং ঐ ক্ষেত্রেও প্রায় সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। মায়ানমারের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ কয়েক দশক ধরে চরম সংকটের মধ্যে রয়েছে আর সে কারণেই ইয়াংগুন বর্তমানে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের দ্বার খুলতে উদগ্রীব বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের উত্তোলন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে। আর এ কারণে পরিবর্তিত বিশ্বে এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের যুগেই পিছিয়ে পড়া দেশ মায়ানমার পূর্বে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সাথে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের সংস্থায় যোগ দিতে ইচ্ছুক, অন্যদিকে সম্ভাব্য রপ্তানি বাজারের খোঁজে রত। এর একটি বৃহৎ সম্ভাব্য বাজার ভারত। পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে পারলে এ অঞ্চলে মায়ানমার পশ্চিমা বিশ্বের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। বিশেষ করে উত্তরে চীনের অবস্থান এবং মায়ানমারের মাধ্যমে দক্ষিণমুখি যোগাযোগের সম্ভাবনার কারণে। মায়ানমার অতি সন্তর্পণে বহিঃবিশ্বে প্রবেশের পথে প্রথমেই নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছে এবং এরই প্রেক্ষিতে ASEAN এ পর্যবেক্ষকের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রস্তাব করা হচ্ছে SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) এ অন্তর্ভুক্তির। অবশ্য বাংলাদেশের সাথে

www.pathagar.com

মায়ানমারের সড়ক যোগাযোগ কল্পে এশিয়ান হাইওয়ের অন্তর্গত অংশটুকু উন্নয়নে দু'দেশই সম্মত হয়েছে।

বাংলাদেশ মায়ানমারের সম্পর্ক উন্নয়ন বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দু'দেশই সমাদ্রিত হবে। শুধু ঐতিহাসিক নিরিখেই নয়, বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা এবং অঞ্চলিক কূটনৈতিক ও ভৌগোলিক কৌশলগত কারণেও অন্যতম প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মায়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড় করণের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রয়োজন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্পর্ক হতে হবে সমতা এবং সমঝোতার ভিত্তিতে। মায়ানমার–বাংলাদেশ–ভারত গ্যাস পাইপলাইন সে সম্পর্ক আরও গভীর করবে তাতে সন্দেহ নেই তবে এ প্রস্তাবনার অন্যান্য বিষয় যা আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ এবং সার্বিক নিরাপত্তার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা তা অবশ্য ভেবে দেখতে হবে। এ প্রস্তাবনার বিশেষ বিবেচ্য দিকগুলো, অন্তত আমার মতে, অতীব গুরুত্ব বহন করে।

প্রথমতঃ এ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের পর এত লম্বা পাইপলাইনের নিরাপত্তার বিষয়টি। দ্বিতীয়তঃ উত্তর–পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে চলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং এর সম্ভাব্য সমাধানের সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ এ পাইপলাইন স্থাপনার কারণে বাংলাদেশের যে ভূ-খণ্ড ব্যবহার হবে সেসব জমির মালিকানা এবং তাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি। এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। চতুর্থতঃ পরিবেশ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপর্যুক্ত তৃতীয় এবং চতুর্থ বিষয় দুটি বিশেষভাব উল্লেখ্যনীয় কারণ ইতিপূর্বে যেমনটা বলা হয়েছে যে, মায়ানমার–থাইল্যাণ্ড পাইপলাইন স্থাপনার সময় এ দুটি বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোকে আদালতে দাঁড়াতে হয়েছে। সে সাথে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পরিবেশ বিনষ্টের জন্য মায়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বের দরাবারে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

সবশেষে যে বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে তা হলো, পাইপলাইন বাবদ প্রাপ্ত অর্থের নীট পরিসংখ্যান এবং এ লব্ধ অর্থের সঠিক বিতরণ এবং বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োগের পরিকল্পনা। এ সমগ্র পরিকল্পনা যদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে না পারে এবং যে সমস্ত জনসাধারণকে নিজস্ব জায়গা জমি অথবা বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হবে তাদের প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন অথবা যথাযথ ক্ষতিপূরণ না দেয়া হয় তবে হিতে বিপরীত ফলাফলও হতে পারে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নিজস্ব গ্যাস রপ্তানির পরিকল্পনা তদুপরি মায়ানমার হতে ভারতে গ্যাস রপ্তানির সম্ভাবনায় বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ নামক ছোট এ দেশটি ক্রমেই আন্তর্জাতিক জ্বালানি কূটনীতির অঙ্গন হয়ে উঠছে। পরিকল্পিত ট্রান্স–এশিয়ান পাইপলাইন, যা সুদূর জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত করবার চিন্তাভাবনা চলছে। তাতে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের জ্বালানি সংকট সে দেশের দ্রুত শিল্পায়নে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এ ব্যাঘাত ভারতের আকাঙ্খিত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করছে না। ভারতের অন্যতম পরাশক্তি হেসেবে বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রমাণিত করতে হলে সামরিক ও পারমাণবিক বল বৃদ্ধির সমান্তরালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতেই হবে। এ কথা ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতা এবং দল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে থাকেন। পূর্বএশিয়া হতে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে হলে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্রে রেখেই দিল্লি ঢাকার সাথে তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

www.pathagar.com

এগার

নব্য উপনিবেশবাদ-ইরাক সংকট

লেখকের নিবেদন

আমার এ পুস্তকটি প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল ঠিক ঐ সময়টিতে ইরাক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতি সমাপ্ত, বাগদাদ ইরাক দখলের অপেক্ষায় মাত্র। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা তৎকালীন প্রগতিশীল বলে পরিচিত বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসীরা বলে আসছিলেন সে সত্যই প্রকটভাবে দৃশ্যমান। সাদ্দামবিহীন বাগদাদ এখন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের করাল গ্রাসে আর মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানির নিয়ন্ত্রক ইঙ্গ-মার্কিন বহুজাতিক বৃহৎ কোম্পানিগুলো। অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য, ভবিষ্যৎ বিশাল সংকটে নিমজ্জিত। তাই আমি প্রসঙ্গতই পুস্তকের এ পর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ইরাক সংকটের নেপথ্যে ইরানি উপাখ্যান

১৯৭৮ সনের শেষ লগ্নে আরব বিশ্বের পূর্বের সীমানার দেশ ইরানের রাজধানী তেহরান ক্রমেই বিস্ফোরণমুখি হয়ে উঠছিল। মারমুখি জনতা মাত্র কিছুদিন পূর্বের জালাহ্ চত্বরের গণহত্যার প্রতিবাদে ইরানের দোর্দন্ড প্রতাপশালী এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট মিত্র রেজা শাহ্ পাহলভীকে মসনদচ্যুত করবার প্রত্যয়ে রাজপথ সরগম করে তুলেছিল। গত ছয় মাসেই পশ্চিমা সভ্যতার আদলের ইরানের শহুরে জনগণ পশ্চিমা সংস্কৃতি বর্জন করতে শুরু করছিল। এর পেছনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্যারিসে নির্বাসিত ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী, শিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রণী ধর্মীয় গুরু। অন্যদিকে তেহরানের খায়াবান রাজপ্রাসাদে মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পেহলভী, শাহেন শাহ্, আরিয়া মেহের (রাজার রাজা) তখনও ততটা বিচলিত নন। রেজা শাহের শেষ ভরসা ছিল তার অনুগত 'সাভাক' (Savak) এবং ৪০ বছরের পরীক্ষিত বন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তখনও হয়তো তিনি ভাবতে পারেন নি যে, পশ্চিমা শিক্ষিত তরুণ তরুণীরাও ধর্মীও গুরুদের সূচিত

www.pathagar.com

গণজাগরণের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। শাহেন শাহ্ আরিয়া মেহের কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তাঁর প্রয়াত পিতা রেজা শাহ্ পেহলভী গঠিত ইরানের পেহলভী বংশ প্রায় পঞ্চান্ন বছরের মাথাতেই ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। বুঝতেও পারেন নি প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পরীক্ষিত বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের গোপন সংস্থা মোসাদ (Mossad) এ যাত্রায় তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না।

রেজা খান ইরানের শাহ্ এর পিতা ১৮৭৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন রাজকীয় পারস্য বাহিনীর কর্নেল আক্কাস আলী খান, ইরানের পেহ্লোয়ান গোত্রের সর্দারের ভাগ্যাহত পুত্র বাপের পরিচয়ে তৎকালীন রাজকীয় বাহিনীতে সামান্য সৈনিক পদে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে অফিসার পদে উন্নীত হন। ১৯১৯ সনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে এতদঅঞ্চলে বৃটিশ এবং রাশিয়ার উপস্থিতি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি ইরানকে অস্থির করে তুলেছিল। সে সাথে পারস্য অঞ্চলে তেলের ব্যাপক সন্ধান এবং এর ভবিষ্যৎ সব মিলিয়ে বৃটিশদের নিকট তরুণ অযোগ্য কাজার বংশের শেষ নৃপতি আহমেদ শাহের গ্রহণযোগ্যতা কমে আসতে থাকে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণদের মধ্যে বাদশাহের অযোগ্যতা বৃটিশ এবং রাশিয়ার উপস্থিতি, সম্পদের লুণ্ঠন ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। ১৯২৫ সনের দিকে ইরানের বাদশাহ গুরুতর অসুস্থতায় চিকিৎসা করাবার জন্য বহুদিন বিদেশে কাটানোর মধ্যেই জাতীয়তাবাদী গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। ঐ বছরই ইরানের মজলিস বাদশাহের অবর্তমানে তাঁকে গদিচ্যুত করে জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্ব দানকারী কর্নেল রেজা খানকে শাহ্ উপাধি দিয়ে ইরানের বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, রেজা খানের এ উত্থানের পেছনে পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে বৃটিশ শক্তির হাতে ছিল। এর দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি তেলের নিরঝঞ্ঝাট অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা। দ্বিতীয়তঃ ভলসেভিক আন্দোলনের পর লেনিনবাদী রাশিয়ার দক্ষিণমুখি সম্প্রসারণ তথা প্রভাব বিস্তারকে রোধ করা। রেজা খান পেহলভীর সময়েই ইরানের তেল শিল্প ক্রমেই প্রধান অর্থকরী রপ্তানিতে রূপান্তরিত হয়। ঐ একই সময়ে ১৯২৮-৩২ এর মধ্যে ইরানের অনুরূপ মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে তৎকালীন মেসোপটেমিয়া বর্তমানের ইরাকে উত্তরে কিরকুক (Kirkuk) অঞ্চলে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ইরানের তেল উত্তোলন

www.pathagar.com

এবং বিতরণের জন্য পশ্চিমা, বিশেষ করে বৃটিশ কোম্পানিগুলো তেহরানে ভিড় করতে থাকে। ইরানে ১৯০৮ সনে প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইরানের তেল সম্পদের প্রাপ্তি সম্প্রসারিত হলে বহুজাতিক কোম্পানির প্রাধান্য থাকায় এর অর্থনৈতিক সাফল্য জনগণ পর্যন্ত পৌছাতে প্রচুর সময় লেগে যায়। ইরান একমাত্র শিয়া প্রধান দেশ হলেও ঐতিহাসিক কারণেই তৎকালীন প্যালেস্টাইন (বর্তমানে একাংশ ইসরায়েল) এর পরেই ইহুদিদের বৃহৎ বাসস্থান বলে পরিচিত ছিল। ইরানের সম্পদ এবং ব্যবসার সাথে জড়িত এসব বনেদি ইহুদিদের বিরুদ্ধে ১৯৮০ এর দশকে জনরোষ বাড়তে দেখা যায়।

২৬ মার্চ ১৯৪৪ সনে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির একবছর পূর্বেই রেজা খান মারা যান। পিতার মৃত্যুর পরপরই রেজা শাহ পেহলভী ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রেজা শাহের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের অসন্তোষের প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সনে প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখল করেন। ঐ সময়ে শাহ্ দেশের বাইরে। ক্ষণস্থায়ী এ অভ্যুত্থানে শংকিত হয়ে ওঠে পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশিত পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অভ্যুত্থানের পরপরই মোসাদ্দেক যে কাজটি প্রথমেই করেন সেটি ছিল ইরানের তেল সম্পদকে জাতীয়করণ করা। মোসাদ্দেকের বামঘেঁষা রাজনীতিতে শংকিত পশ্চিমা শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ (CIA) আর ইসরায়েলের মোসাদ'এর সহযোগিতায় মোসাদ্দেককে উৎখাত করে। মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের উৎখাতের পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য আর ইসরায়েল শাহের হাতকে শক্ত করার জন্য 'সাভাক' (Savak) কে সংগঠিত করে। শুধু এখানেই থেমে থাকে নি, পূর্বে ইরান আর উত্তরে তুরস্কের মধ্যে ইসরায়েল আরব বিরুদ্ধাচারণের বীজ বপন করতে থাকে। ১৯৫৮ সনে ইরাকের পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্র ইরাকে কর্নেল করিম কাশেম এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। করিম কাশেম বাগদাদ থেকে বৃটিশ উপস্থিতির অবসান ঘটান।

ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান এবং পরবর্তী পর্যায়ের রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য শাহ যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা নিপীড়নের পর্যায়ে চলে যায়। দানা বাঁধতে থাকে রাজতন্ত্র তথা ইসরায়েল–আরব বিরোধী তৎপরতা। আর এসব তৎপরতার পুরাধায় চলে আসেন ইরানের ধর্ম গুরুরা। এমনি একজনের নাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ্ খোমেনী।

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ্ খোমেনী সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯০২ সনে ইরানের ধর্মীয়

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ শহর কুম এ জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্ম নেয়া খোমেনী বংশগত সূত্রে শিয়া সম্প্রদায়ের সপ্তম ইমাম মুসা-আল-কাজমীর বংশধর। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ্ খোমেনী বংশগত সূত্রে ভারতের অধিবাসী। তাঁর দাদা সৈয়দ আহমেদ ভারতের কাশ্মীর অঞ্চল হতে ইরাকের নজফে হযরত আলী (রাঃ) এর মাজার জিয়ারতে এলে খোমেনের ইউসুফ খানের দুহিতার পানি গ্রহণ করে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে থেকে যান। খোমেনীর পিতা মোস্তফা হিন্দিও একজন ধর্মীয় গুরু ছিলেন। ১৯২৩ সনে খোমেনী কুম শহরে চলে আসেন এবং সেখানেই তাঁর ধর্মীও পড়াশুনা শেষ করেন। প্রথমদিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে রুচি না রাখলেও পরবর্তী পর্যায়ে ইরানের শাহের অত্যধিক পশ্চিমাপ্রীতি এবং ইসলামের আদর্শের অবক্ষয়ের বিরোধিতার মধ্যদিয়ে পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯৫৫ সনে বাহাইদের বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাহ বুরুজদারির সাথে যোগ দেন। আয়াতুল্লাহ বুরুজদারির মৃত্যুর পর খোমেনী সর্বপ্রথমে ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত হতে থাকেন। ১৯৬২ সনে মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পেহলভী এক ফরমানের মাধ্যমে ইরানি মজলিশে পবিত্র কোরানের উপর শপথ নেয়ার প্রচলিত রেওয়াজ নিষিদ্ধ ঘোষণা দিলে খোমেনী এর বিরোধিতা করে শাহের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। ইমাম খোমেনীর এ প্রেরিত পত্র মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পেহলভীকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে বিমুখ করতে পারে নি। এরই প্রেক্ষিতে ইরানে ধর্মীয় গুরুদের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে।

জানুয়ারি ১৯৬৩ সনে শাহ তাঁর সংস্কারসূচি নিয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে যান। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে 'হোয়াইট রেভ্যুলিউশন' নামে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন যার মধ্যে শাহের ভাবমূর্তিকে পশ্চিমের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্য সামাজিক উদার নীতি গ্রহণ করেন। এ ধরনের নীতিকে ইরানের গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় গুরুরা ইসলাম বিরোধী ব্যবস্থা বলে রুখে দাঁড়াবার প্রয়াস করেন। এরই প্রেক্ষিতে ইরানে ক্ষমতাসীন রাজতন্ত্র আর ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে প্রচন্ড টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়। আয়তুল্লাহ্ খোমেনী শাহ এবং তাঁর পরিবারকে ইরানিদের নৈতিক স্খলনের জন্য দায়ী করে রাজতন্ত্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইসরায়েলের হাতের পুতুল বলে আখ্যায়িত করে রাজতন্ত্র উৎখাতের আহ্বান জানান। ১৯৬৩ সনের ৩ জুন মহরম মাসের দশ তারিখে খোমেনীকে প্রথমবারের মত গ্রেফতার করা হয়। প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে ১৯৬৪ সনে খোমেনীকে মুক্ত করা হয়। তবুও খোমেনী শাহ বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেন

www.pathagar.com

নি। ১৯৬৪ সনে খোমেনীকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হলে প্রথমে তিনি তুরস্কে চলে যান। ১৯৬৫ সনে খোমেনী তুরস্ক ত্যাগ করে ইরাকের নজফে চলে আসেন। তখন ইরাকের হাসান আল বাকের আর বাথ পার্টি ক্ষমতায়। পরবর্তী ১৩ বছর খোমেনী নজফে থাকলেও তাঁর বাণী ইরানের ঘরে ঘরে সুপরিচিত হতে থাকে। ঐ সময়ে খোমেনীর ইসলামিক শাসন পদ্ধতি নজফে প্রকাশ পায় এবং এর টেপ ইরানের সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌছাতে থাকে। ১৯৭০-৭৮ ইরানে ক্রমেই শাহের বিরুদ্ধে জনরোষ প্রবল আকার ধারণ করলে শাহ ইরাক থেকে খোমেনীকে বিতাড়িত করবার অনুরোধ জানান। বাগদাদে বাকের সরকার খোমেনীকে শাহের বিরুদ্ধাচারণ বন্ধ করতে অন্যথায় ইরাক ত্যাগ করবার পরামর্শ দিলে খোমেনী প্যারিসে চলে যান।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী পরবর্তী একবছর শাহ বিরোধী অভ্যুত্থান প্যারিস থেকেই পরিচালনা করেন। ১৯৭৯ সনের জানুয়ারির ১৬ তারিখে ইরানের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পেহলভী আবার ফিরে আসবার আশায় সপরিবারে দেশ ত্যাগ করেন। ইরানে সংগঠিত হয় সমসাময়িক কালের অভূতপূর্ব ধর্মীয়পন্থীদের অভ্যুত্থান। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ সনে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী তেহরানে পৌছলে সমসাময়িক ইতিহাসের সর্ববৃহৎ গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে ইসলামি অভ্যুত্থানের সফল সমাপ্তি টানেন।[১]

১৯৭৮ সনের সেদিনের শেষ লগ্নে খায়াবান রাজপ্রাসাদের অধিকারী মোহাম্মদ রেজা শাহ পেহলভী জানতেও চেষ্টা করেন নি তাঁর প্রতিপক্ষ আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী জনগণের শক্তিতে কত বলীয়ান হয়ে উঠছেন। সেদিন হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল দূতাবাস, সিআইএ স্টেশন অফিসার অথবা মোসাদের কর্তা ব্যক্তিরা ধারণা করতে পারেন নি যে, ১৯৭৯ সনের ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থানই একমাত্র বড় ঘটনা হয়ে থাকবে না। এ অভ্যুত্থান শিহরিত করবে ইসরায়েল সহ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রকে। কম্পিত করবে মধ্যপ্রাচ্যের শাসক গোষ্ঠিকে, চিন্তিত করবে ইসরায়েলকে আর অপমান ললাটে নিয়ে বিতাড়িত হবে মার্কিন দূতাবাস আর উপদেষ্টা দল। ইসলামিক অভ্যুত্থানকারীদের হাতে জিম্মি থাকতে হবে তেহরানের মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রায় এক বছর। এ লাঞ্ছনা মার্কিন প্রশাসন আজও ভুলতে পারে নি।

১৯৭৯ সনে আরও দুটি ঘটনা এতদঅঞ্চল, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য তথা সমগ্র

১। ইরান বার্তা, ১৯৭৯।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিণাম বয়ে আনবে। এর একটি ইরাকে হাসান আল বাকেরকে হটিয়ে সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতা দখল আর আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদার বাহিনী প্রেরণ এবং আফগান জেহাদের সূচনা।[২]

আমি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পটভূমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করলাম বর্তমান ইরাক তথা মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রেক্ষিত রচনার জন্য। ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থান বর্ধিত প্যালেস্টাইন ইসরায়েলি সংঘাত, আফগানিস্তানের যুদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইরাক বিরোধী যুদ্ধ একই সূত্রে বাঁধা। এর মূলে রয়েছে প্রধানতঃ এতদঅঞ্চলের বিশাল জ্বালানি ভাণ্ডার।

যেমনটা প্রথমেই বলেছি যে, ইরানের ইসলামিক তথা শিয়া ধর্মীয় গুরুদের রাজনীতিতে আবির্ভাব ছিল বিংশ শতাব্দীর এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এ অভ্যুত্থান ঐ অঞ্চলের শিয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এর প্রাথমিক প্রভাব পড়ে ইরাক তথা কুয়েতের মত ধনাঢ্য উপসাগরীয় দেশগুলোতে। বাগদাদে সুন্নি শাসক থাকলেও দেশটির দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে রয়েছে সংখ্যা গরিষ্ঠ শিয়া মতাবলম্বী জনগোষ্ঠি। স্মরণযোগ্য যে, নজফে হযরত আলী (রাঃ) রওজা আর কারবালায় ইমাম হোসেন (রাঃ) এর শাহাদাত, এ দু'স্থানই শিয়া মতালম্বীদের জন্য মহাপূণ্যস্থান। তা ছাড়াও ইসলামি অভ্যুত্থান পরোক্ষভাবে হলে প্রভাবিত করে অন্যান্য আরব দেশগুলো, যে সব দেশ সম্পদে বলীয়ান হয়েও তথাকথিত পশ্চিমের রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। এক কথায় ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলিউশন ভলসেভিক বা সোসালিস্ট আন্দোলনের মত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা নিয়ে শুধু মুসলিম দেশগুলোই নয়, পশ্চিমা দেশসহ সোভিয়েত রাশিয়াও শংকিত হয়ে ওঠে। পশ্চিমা বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষ করে সৌদি আরব, ইরাক সহ উপসাগরীয় দেশসমূহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এ বিপ্লবের প্রভাব ঠেকাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

খোদ ইরানের অভ্যন্তরে শাহের পতনের পর এ বিশৃঙ্খল অবস্থার অবতারণা হয়। শাহ পন্থী রাজনীতিবিদ সাভাকের সদস্য এবং সশস্ত্রবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিচার এবং হত্যা ইত্যাদিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

ইরানের সুশৃঙ্খল সশস্ত্রবাহিনী ভেঙ্গে তার বদলে গড়ে তোলা হয় রেভ্যুলিউশনারী গার্ড। এদের প্রধান কাজ দেয়া হয় ইরানের অভ্যন্তরে

২। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা ঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা', পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

www.pathagar.com

রেভ্যুলিউশনকে সুসংহত করা। শাহের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি যুদ্ধাপোকরণগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ইসরায়েলি তথা আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা তেহরান ত্যাগ করলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সাথে পশ্চিমা বিশ্ব ইরানকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে অস্বীকার করে শাহের সময়ের চুক্তিগুলোও নাকচ করে দিলে ইরানের ইসলামি সরকারকে বিভিন্ন পথে যাবতীয় কারিগরি সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হয়। এরই সাথে ইউরোপ তথা যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের গচ্ছিত যাবতীয় সম্পদ এবং আমানত সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। সব মিলিয়ে একদিকে ইসলামিক ইরান প্রায় এক ঘরে হয়ে কোণঠাসা হতে থাকে অন্যদিকে ইরানের ইসলামি রেভ্যুলিউশনের প্রভাবে প্রতিবেশী দেশগুলো শংকিত হতে থাকে।

ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলিউশনের ফলে যে দুটি দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সে দুটি দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েল। আর এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে বর্তমানের প্রেক্ষাপট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে নভেম্বর ৪, ১৯৭৯ সনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম এবচ সুলিভান সহ প্রায় ১৫০ জনকে জিম্মি করা হয়। ঐ সময়ে এ সমস্যা একটি বিরাট আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়। জিম্মিকারীদের প্রধান পরিচয় ছিল খোমেনীর সমর্থক। তাদের দাবিগুলো ছিল শাহকে ইরানে ফিরিয়ে দেয়া, পেহলভী পরিবার কর্তৃক লুণ্ঠিত সম্পদ প্রত্যাবর্তন আর যুক্তরাষ্ট্রের বাজেয়াপ্তকৃত ইরানের সম্পদ বিমুক্তকরণ। এ জিম্মি অবস্থা চলে ৪৪৪ দিন। যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানের শপথ অনুষ্ঠান জানুয়ারি ২১, ১৯৮১ পর্যন্ত।[৩] এ জিম্মি সংকট একদিকে যেমন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বিশেষ করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটায় তেমনি যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের বিরুদ্ধে দাঁড় করে। সেই সাথে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে বড় সিআইএ এর মাঠ পর্যায়ের ঘাঁটি বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই ইরানের উত্তরে সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতা এবং উত্তর পূর্বে আফগানিস্তানে সোভিয়েত গতিবিধি পর্যবেক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ে। এরই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান হয়ে উঠে ইরানের বিকল্প। ইসলামাবাদে তখন জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতায়। ইরান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেলেও তেহরানের ইসলামিক সরকারের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতায় ভাটা পড়ে নি। যদিও এ বিষয়টি পুস্তকের মুখ্য বিষয় নয়, তবে পরবর্তী ঘটনাগুলোর সাথে একই সূত্রে বাঁধা। এককথায়

৩। Pierre Salinges,"America Held Hostage : The Secret Negotiations London W.Id. Allen.

www.pathagar.com

শাহের সময় তেহরানের মার্কিন দূতাবাস ছিল মধ্যপ্রাচ্যে তথা সোভিয়েত মধ্যএশিয়ার উপর নজরদারির প্রধান কেন্দ্র। তেহরানের এ সুযোগ হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন সংস্থাগুলো প্রায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের উপরে উপস্থিতি আর সিআইএ'র কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে যে ধরনের কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যায় পড়ে সে পরিস্থিতি থেকে উৎরাবার জন্য পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগান জেহাদের সূচনা করে।

ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলিউশনের ফলশ্রুতিতে ইসরায়েলকেও হারাতে হয় একটি পরীক্ষিত মুসলিম দেশে তার গোয়েন্দা সংস্থা তথা সহযোগী অংশীদার। ইসরায়েলের সাথে পারস্য বর্তমান ইরানের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। এ সম্পর্কের সূত্র হচ্ছে ইরানে এতদঅঞ্চলের সবচেয়ে বৃহৎ ইহুদি জনগোষ্ঠির বসত। এদের মধ্যে বেশির ভাগই রাজকীয় ইরানের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তেল শিল্প থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের অবদানের সূত্র ছিল ঐতিহাসিক। প্রসঙ্গত ইসরায়েল নামক রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই ইরান ইসরায়েলে তেলের চাহিদা মিটিয়ে আসছিল। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ রেজা শাহের বক্তব্য ছিল ব্যবসায়িক আঙ্গিকের। ইরানের তেলের বাজারজাতকরণের দায়িত্বে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো থাকায় তেহরানের রাজকীয় শাসকগণ ইসরায়েলের সাথে এ ধরনের ব্যবসার দায়দায়িত্ব ঐসব কোম্পানিগুলোর ঘাড়েই চাপাত। অন্যদিকে ইরানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ইসরায়েলের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

ইরানে ইহুদিদের ভূমিকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বচ্ছ থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই ছিল অস্বচ্ছ। এদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল বিশ্ব ইহুদি পরিষদ বা ওয়ার্ল্ড জিওনিজ কাউন্সিল এর সাথে। এ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এ সম্পর্ক ঐতিহাসিক হলেও খোমেনীর বিপ্লবের পর ইরানের ইহুদিদের নিয়ে একদিকে ইসরায়েল অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র দু'মুখি উদ্দেশ্য ব্যবহারের প্রয়াসে রত ছিল। তৎকালীন পারস্যে ইহুদিদের উপস্থিতি প্রাচীন টেস্টাম্যানের মতে শুরু হয়েছিল ৫৯৭-৯৮ খৃস্টপূর্ব বছরের মধ্যে যখন নেবুচাদনেজার (Nebuchadnezzar) ব্যাবিলন সহ পারস্য জয় করেন।[৪] ইরানের ইহুদি উপস্থিতি এদের নিয়ে ইরান ইসরায়েল আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপড়েন

৪। The New Oxford Annotated Bible, with the Apocrypha; revised standard ed. (New York; Oxford University Press 1973).

www.pathagar.com

ইরান-ইরাক সম্পর্কে প্রচন্ড প্রভাব ফেলে। এ বিষয়ে পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

ইরান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান তেল এবং গ্যাস উৎপাদক দেশ। ইরানেই প্রথম এতদঅঞ্চলের তেলের আবিষ্কার হয় মে ২৬, ১৯০৮ সনে, পারস্যের নাফতনি অঞ্চলের মসজেদ সোলায়মান নামক স্থানে। তেল প্রাপ্তির পর এ অঞ্চলেই আরও মজুদ ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়। এ আবিষ্কারের কৃতিত্বে থাকে ফরাসি ভূ-তত্ত্ববিদরা আর ডি আর্চি নামক ভূ-তত্ত্ব তথা খনি বিশারদ। এই ডি আর্চিই ১৯২৮ সনে ইরাকের কিরকুকে ঐ অঞ্চলের প্রথম তেল ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। ইরান তথা তৎকালীন পারস্যের এসব ক্ষেত্র আবিষ্কারের পরেই ১৯১২-১৯১৩ সনে মসজেদ সোলায়মান হতে আবাদান তেল শোধনাগার পর্যন্ত প্রথম পাইপলাইন প্রস্তুত করা হয়। ঐ সময়ে এ পাইপলাইনের ধারণ ক্ষমতা ছিল দিনপ্রতি ২৪০০ ব্যারেল।[৫] ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে বৃটিশ রাজকীয় নৌবাহিনী ইরান বৃটেন তেল কোম্পানিগুলোর ৫১ শতাংশ কিনে নেয়। ডি আর্চিকে তেল অনুসন্ধানের ছাড়, বৃটিশ অংশিদারীত্ব ইত্যাদি ক্রমেই তেহরানের শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। ঐ সময় হতে শুরু করে বিদেশীদের উপস্থিতি এবং ইরানের তেলের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলে প্রায় তিন দশক। এরই প্রেক্ষিতে মার্চ ২০, ১৯৫১ সনে জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক ইরানের তেল জাতীয়করণ করলে ইরানের সাথে পশ্চিমের এবং শাহের সাশে মজলিস তথা প্রধানমন্ত্রীর সাথে টানাপড়েন শুরু হয়। মোসাদ্দেক ইরানের তেল জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে শুধু ইরান-বৃটিশ তেল কোম্পানিকেই নয়, সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের রোষাণলে পতিত হন। যুক্তরাষ্ট্র মোসাদ্দেকের জাতীয়করণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা প্ররোচিত উদ্যোগ এবং ইরানে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি তথা সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশংকা প্রকাশ করে। শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, মোসাদ্দেককে উৎখাত করে শাহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসে সিআইএকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আদেশ দেয়া হয়। সিআইএ শাহের অনুগতদের দিয়ে এক পাল্টাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৫৩ সনে মোসাদ্দেককে উৎখাত করে রোমে নির্বাসিত মোহাম্মদ রেজা শাহকে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসে। সিআইএ ইরানের ঐ কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কারজিত

৫। ডিপার্টমেন্ট অব ইউএস এনার্জি।

www.pathagar.com

রুজভেল্ট আর মাইলস্ কোপল্যান্ড নামক দুই কর্মকর্তা।[৬] সিআইএ'র এ প্রতি অভ্যুত্থান তৃতীয় বিশ্বের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপ হিসেবে আজও উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মোসাদ্দেকের উৎখাতের পরেই আমেরিকা ইরান নিয়ন্ত্রণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, ষাট এবং সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিহত করার তাই সোভিয়েত পন্থী মুভমেন্ট, আর কোনো কিছুতেই তেমন নজর দেয় নি। মধ্যপ্রাচ্যের নীতিও ছিল অসংলগ্ন। মধ্যপ্রাচ্য ব্যবহৃত হচ্ছিল নিঝঞ্ঝাট তেলের প্রবাহকে নিশ্চিত করবার মধ্যে।

বর্তমানে ইরানের পরীক্ষিত তেলের মজুদের পরিমাণ ৯০ বিলিয়ন ব্যারেল যা পৃথিবীর মোট মজুদের নয় শতাংশ। ইরানের বৃহত্তর তেল ক্ষেত্রগুলো রয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমের ইরাকের সীমান্ত নিকটবর্তী অঞ্চল খোজেস্তানে এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে। বর্তমানে ইরানে যে সব ক্ষেত্র থেকে প্রধানত তেল উৎপাদন হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে আওয়াজ-বাঙ্গেস্তান (বর্তমান উৎপাদন দিনপ্রতি ২৫০,০০০ ব্যারেল যা দিনপ্রতি ৬০০,০০০ ব্যারেলে উন্নীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, খরচ আনুমানিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে মারুন, গাচসারান, আগাজারি এবং বিবি হেকমা।[৭] ইরানের তেলে সালফার (sulfur) এর পরিমাণ কম বলে উন্নতমানের। ২০০১ সনে ইরান ৩.৮ মিলিয়ন দিনপ্রতি উৎপাদন করছিল। ইরান বর্তমানে দিনপ্রতি ৩.৮৫ মিলিয়ন ব্যারেল উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। OPEC (Organization of Petrolium Exporting Countries) অনুমোদিত ইরানের কোটা দিনপ্রতি ৩.১৮৬ মিলিয়ন ব্যারেল তবে ইরানের বর্তমানে OPEC এর নির্ধারিত কোটার বাইরে উৎপাদনের অভিযোগ রয়েছে যা অবশ্য তেহরান অস্বীকার করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বর্তমানে ইরান দিনপ্রতি ৪.১ মিলিয়ন ব্যারেল উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে।

৬। John K. Cooley "Pay Back. America's Long war in the Middle East" Bressey's US Inc.
৭। ডিপার্টমেন্ট অব ইউএস এনার্জি-opcit

www.pathagar.com

বার

ইরাক–ইরান যুদ্ধ এবং বর্তমান পরিস্থিতি

ইরানে শাহের শাসন থেকেই ইসরায়েল তথা যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজসে বাগদাদকে আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে জর্জরিত রাখার কারণেই ইরাকি কুর্দিদের বাগদাদের রিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে সাহায্য শুরু করে। তখন বাগদাদে বাথ পার্টি নেতা জেনারেল হাসান আল বাকের ক্ষমতায়। তাঁকে অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়ন পন্থী বলে বিবেচনা করা হতো। অন্যদিকে শাহের বিরুদ্ধে ইরাকে রাজনৈতিক অসন্তোষে সাহায্য যোগাবার অভিযোগে মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পেহলভী কুর্দিদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

এ তৎপরতা যুক্তরাষ্ট্রে রিচার্ড নিক্সনের সময়ে বৃদ্ধি পায় বহুগুণে। ইরাকের 'প্যান এরাব' ধ্যান-ধারণা এবং এর মূলে ইসরায়েল বিরোধিতা ইত্যাদি কারণে যুক্তরাষ্ট্র মোসাদ এবং সিআইএকে সমন্বয় করে কুর্দি ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং এর বর্ষিয়ান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ বারজানীকে, বর্তমান নেতা মাসুদ বারজানীর পিতা, প্রায় ১৬ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিল। সময়টি ছিল ১৯৭৩ সন।[১] যেমনটা উপরেই বলেছি শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয় ইসরায়েলও ইরাকের উত্তরে কুর্দিদের বাগদাদের বিরুদ্ধাচারণে সহায়তা করে আসছে যা আজও চলমান রয়েছে। শাহের সম্পূর্ণ রাজত্বের সময়ে এ ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলিউশনের পর ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সনে ইসলামিক ইরান ইসরায়েলের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পিএলও (PLO) এর নেতা ইয়াসির আরফাতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এর পরে পরেই ইসরায়েলের সাথে ইরানের সকল বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় তেলের চালান। ১৯৭৭ সনের মাপকাঠিতে ইসরায়েল হতে ইরানে আমদানি

১। Bill "The Eagle and the Lion" P. 204

www.pathagar.com

হয়েছিল ২৩০ মিলিয়ন ডলারের সামগ্রী। অন্যদিকে এর দ্বিগুণ অর্থ দিয়ে ইসরায়েল ইরান থেকে তেল আমদানি করত। তেহরান ইসরায়েলি মিশন বন্ধ করে দেয়াতে ইসরায়েলের সাথে ইরানি ইহুদিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়।

এসব কারণেই মার্চ ১৯৭৯ সনে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির সময়ে ইসরায়েল আমেরিকার নিকট পরবর্তী পনের বছরের তেল সরবরাহের নিশ্চয়তা চেয়েছিল। ইসরায়েলকে তেল সরবরাহের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র নিলেও তুরস্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় ওয়াশিংটনের নিকট সহজে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। অন্যদিকে খোমেনী ন্যাশনাল ইরানিয়ান ওয়েল কোম্পানিকে (NIOC) ইরাকের সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত, ইসরায়েল সরবরাহ করবে এমন কোনো আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন না চালাবার ফরমান জারি করেন। শুধু ইসরায়েলই নয়, বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকাকেও তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়া হয়।[২]

ইরানের অভ্যুত্থানের সরাসরি প্রভাব পড়েছিল আমেরিকার বহুজাতিক তেল এবং বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর উপরে। এ কোম্পানিগুলো আমেরিকার সরকারের উপর ইরান থেকে গুটিয়ে নেবার পর তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি জোরদার করছিল। অপরদিকে ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চাপ পড়ছিল ইসরায়েল আর তার নব্য মিত্র মিশরের উপরে। এসব ক্ষতিপূরণের দাবি ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস ইত্যাদি জনিত চাপ সরাসরি বহন করতে হয়েছিল আমেরিকার প্রশাসন, কংগ্রেস আর সাধারণ করদাতাদের উপর। এখানে উল্লেখ্য, হঠাৎ করে মিশরের ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তিতে সম্মত হবার পর প্রায় বেশিরভাগ আরব দেশ মিশরে সাহায্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা আর লগ্নি স্থগিত করেছিল। ইরানের তৎকালীন শাহের সরকার এগিয়ে এসেছিল মিশরকে সাহায্যের জন্য। ঐ সময়ে ইরানের শাহ্ মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতকে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিতে অঙ্গীকার করেছিলেন। সে অঙ্গীকারের আওতায় মিশরকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার দিলেও পরে খোমেনী সরকার বাকি প্রদেয় অর্থ দিতে অস্বীকার করে। অগ্যতা মিশরের ভঙ্গুর অর্থনীতি সচল রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হতে হয়। আরও উল্লেখ্যনীয় যে, আরব বয়কটের পর মার্কিন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর একমাত্র

২। John K. Cooley "Iran. the Palastinians and the gulf" Foreign Affairs Quarterly. Summer 1979.

www.pathagar.com

ভরসা ছিল শাহের ইরান, তাও ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের পর বন্ধ হয়ে যায়। এককথায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ইরানের বিপ্লবে যে ক্ষতির সম্মুখিন হয় তা এসব কোম্পানিকে বিপুল লোকসানের পথে ঠেলে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে ইরানে বিপ্লবের পরপরই তেহরান ইয়াসির আরাফাতের ইসরায়েল বিরোধিতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলে ইতিপূর্বের ইসরায়েল–ইরান গোপন অস্ত্র ব্যবসাও স্থগিত হয়ে যায়। এসব কারণে ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত আরও চরম আকার ধারণ করে।

সেপ্টেম্বর ২, ১৯৮০ ইরাক যখন ইরানকে পুরাদস্তুর আক্রমণ করে বসে তখন ইরানের সমগ্র সামরিক বাহিনীর অবস্থা ছিল তথৈবচ। ১৯৭৯ এর বিপ্লবের পরপরই পশ্চিমা ধাঁচের সামরিক বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। কাজেই যুদ্ধ শুরু হবার পুনঃসংগঠন ছিল একটি দুঃস্বপ্নের মত। শাহের শাসনের সমাপ্তিলগ্নে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনা বাবদ ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অগ্রিম দেয়া হয়েছিল। বিপ্লবের পরপরেই যুক্তরাষ্ট্র কৌশলে তেহরানকে এ চুক্তি বাতিল করাতে সক্ষম হয়। এর পরেই যুক্তরাষ্ট্র অর্থও বাজেয়াপ্ত করে।[৩] এসব বাজেয়াপ্ত আর ইরানে অস্ত্র বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞার সুফল ভোগ করে ইসরায়েল। যে সব অত্যাধুনিক অস্ত্র ইরানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল তা ইসরায়েলের নিকট বিক্রি করা হয়। এর মধ্যে ছিল এফ-১৪, এফ-১৬ এর মত অত্যাধুনিক বিমান বহর। অন্যদিকে ইরাকের আক্রমণের ১৮ মাস পূর্ব থেকেই ইরানের নতুন আঙ্গিকে গঠিত সামরিক বাহিনী কুর্দি, তুর্কমেন, বেলুচি আর আজারবাইজানী বিদ্রোহ দমনে জড়িয়ে ছিল।

ইরাক–ইরান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ডিসেম্বর ২২, ১৯৮০ সনে যখন বাগদাদ ইরানের সীমানা সংলগ্ন কুজিস্তান অঞ্চলের সাত-এল-আরবের মোহনার কিছু চরাঞ্চল এবং দ্বীপ বিশেষ করে তেল সমৃদ্ধ মজনুন দ্বীপ আক্রমণ করে বসে। ইরাকি সামরিক বাহিনী ত্বড়িৎগতিতে ডিসেম্বর ১৯৮০ এর মধ্যেই খুররমশহের নামক শহরটি দখল করলে গুরুত্বপূর্ণ তেল ক্ষেত্র আবাদান এর আশেপাশে আক্রমণ স্থবির হয়ে পড়ে। ইরাক এ স্থবিরতায় গতি সঞ্চার করবার জন্য আরও ব্যাপক এলাকা ধরে আক্রমণ চালায়। এ যুদ্ধের মধ্যেও চলতে থাকে তেহরানে যুক্তরাষ্ট্রের পণ বন্দি সংকট। অন্যদিকে ইরানের সামরিক বাহিনীর যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণে দেখা দেয় দারুণ সংকট। এসব সংকট প্রকট হতে প্রকটতর হতে থাকে খুচরা যন্ত্রপাতির অভাবে। এরই সুযোগ নেয় ইসরায়েল।

৩। Green, "Living by the Sword"

www.pathagar.com

ইরানের ইহুদিদের নিরাপত্তা এবং সাদ্দামের সরাসরি হুমকির মোকাবেলায় ইসরায়েল ইরানকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সামরিক উপকরণের খুচরা যন্ত্রাংশ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তেহরান অতি গোপনে ইসরায়েলের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল। এসব প্রস্তাব সমগ্র আরব বিশ্ব তথা সিরিয়া থেকে গোপন রাখা হয়। এ প্রস্তাবের পেছনে ওয়াশিংটনের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ওয়াশিংটন তখন জিম্মিদের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত অন্যদিকে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল রোনাল্ড রেগানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে।[৪] অবশেষে রেগানের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের আগেই তেহরান যুক্তরাষ্টের দূতাবাসে আটক কর্মকর্তা কর্মচারীদের ছেড়ে দেয়। তবে এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রকে গোপনে ইরানে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে তৃতীয় দেশের মধ্য দিয়ে অস্ত্র বিক্রয় করতে হয়। আরও পরে হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ কর্নেল অলিভার নর্থ আর ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারী ফাঁস হয়ে রেগানকে বেকায়দা অবস্থায় ফেলে।[৫]

যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করতে বাধ্য হলে পরোক্ষ সমর্থন বাগদাদের দিকেই থেকে যায়। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবে প্রদেয় AWACS (Advance Warning Air Communication System) এর এবং উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইরানের সামরিক অবস্থান এবং তথ্য ইরাককে যোগাতে থাকে।

যদিও ইরাক-ইরান যুদ্ধ এ অধ্যায়ের মূল বিষয় নয় তবুও এ সংক্ষেপ বর্ণনা পাঠকের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী রচিত ইরাকের বিরুদ্ধে ২০ মার্চ, ২০০৩ যুদ্ধের প্রেক্ষিত জানতে সহায়তা করবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডাব্লিউ বুশ (জুনিয়র) সাদ্দামকে রাসায়নিক অস্ত্রের ভান্ডার মজুদ করবার এবং এর ভয়াবহতার পরিণতিকে সামনে রেখেই ইরাকের যুদ্ধের সূচনা করেছেন। বাগদাদকে এসব রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধে ব্যবহার করবার নেপথ্যেও ছিল পশ্চিমা শক্তি তথা ওয়াশিংটনের অপ্রচ্ছন্ন সম্মতি। এর প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৮৪ সনে যখন ইরাকি বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে মাস্টার্ড (mustard) অথবা নার্ভ (nerve) গ্যাস ব্যবহার করে। মধ্যপ্রাচ্যে এসব গ্যাস প্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯৬৭ সনে যখন ইয়ামেনি গৃহযুদ্ধে মিশর সমর্থিত 'রিপাবলিকান' রা সানার ইমান

৪। John K. Cooley "Payback: America's Long war in the Middle East. Ibid.

৫। পড়ুন এ লেখকের 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা: আফগানিস্তান হতে আমেরিকা', পালক পাবলিশার্স, ঢাকা।

www.pathagar.com

আহমেদের বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান সূচনা করেছিল। তখন বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছিলেন, ১৯৫০ সনে বৃটিশ বাহিনী সুয়েজ ত্যাগ করবার সময় এসব রাসায়নিক অস্ত্র ফেলে গিয়েছিল যা পরবর্তীতে মিশরের হাতে পড়ে। এরপরেও মিশর ১৯৬৭ সনে আরব ইসরায়েল যুদ্ধে এসব ব্যবহার করেছিল বলে প্রকাশ। এসব অস্ত্রের ব্যবহার যুক্তরাষ্ট্রের গোচরীভূত থাকলেও নাসেরের বিরুদ্ধাচারণ করা থেকে বিরত থেকেছিল।[৬] প্যালেস্টিনিয়ানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারের বিষয়ে ইসরায়েলও অভিযুক্ত।

ইরানের সাথে যুদ্ধের সূচনালগ্ন থেকেই ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র প্রস্তুতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ প্রযুক্তি তথা কাঁচামালের কোম্পানিগুলোর দ্বারস্থ হয়েছিল। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের রচেস্টার (rochester) নামক কোম্পানিকে প্রস্তাব দিলে এ প্রস্তাব নাকচ করে ঐ কোম্পানি এ বিষয়টি সরাসরি ওয়াশিংটনকে জানায়। এর পরে অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জার্মানি সহ ইউরোপের অনেক দেশই এ রাসায়নিক অস্ত্র প্রস্তুত প্রকল্পের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল।[৭] ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনে শুধু জার্মানি নয় অনেক সমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রও সাহায্য করেছে।

১৯৮৩ সনে সর্বপ্রথম ইরাক যুদ্ধে 'পয়জন গ্যাস' ব্যবহার করে বলে খবর পাওয়া যায়। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে ইরান বাগদাদ কর্তৃক কুর্দিদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ নাইট্রোজেন মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করেছিল।[৮] নভেম্বর ৮, ১৯৮৩ ইরান জাতিসংঘের শান্তি পরিষদে ইরাকের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করলে ইরাককে ১৯২৫ সনের জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে বলে ভর্ৎসনা করার মধ্যেই সীমিত থাকে। ইরাকের বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগের কোনো বাস্তব তদন্তও হয় নি। ডিসেম্বর ২১, ১৯৮৩ সনে বৃটিশ ডিফেন্স সেলস্ অরগানাইজেশন ইরানের নিকট রাসায়নিক আক্রমণ থেকে রক্ষার পোশাক বিক্রি করে। তবুও সে সময় কোনো বৃহৎ শক্তিই ইরাকের বিরুদ্ধাচারণ করে নি।

সাদ্দাম হোসেনের রাসায়নিক অস্ত্রের ভান্ডার ইরাক–ইরান যুদ্ধ অবসানের পরে থেকে যায়। পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের টনক তখনই নড়ে যখন

৬। John K. Cooley Payback : Ibid
৭। Ibid
৮। O Ballauce "Gulf War"

www.pathagar.com

এপ্রিল ১৯৯০ সনে সাদ্দাম 'ইসরায়েলকে পুড়িয়ে' মারবার হুমকি দেয়।

ইরাকের এহেন কার্যকলাপ পশ্চিমা বিশ্ব ততক্ষণ কর্ণপাত করে নি যতদিন সাদ্দাম তাদের হয়ে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উপর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপের কারণে ১৯৮৮ সনের দিকে ডেমোক্রেট সেনেটর ক্লেইবরন পেল প্রিভেনশন অব জেনোসাইড এ্যাক্ট নামক বিল সিনেটে পাশ করায় কিন্তু এর পরেও ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামকে নিবৃত করতে আগ্রহী হয় নি। এর পেছনে ছিল ইরাকের তেলের ক্ষমতা। সেনেটর পেল এর বিলের বিরোধিতায় যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুধুমাত্র বর্তমান প্রেক্ষিতই প্রস্তুত করে নি, জন্ম দিয়েছিল বহু আঘোষিত আন্তর্জাতিক গোপন চক্রান্তের। এ যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহকে প্রায় অনিশ্চিত করে ফেলেছিল। যুদ্ধের কারণেই ইরাক এবং ইরান উভয় দেশ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কুয়েত এবং সৌদি আরব তথা অন্যান্য উপসাগরীয় দেশকে উৎপাদন বাড়িয়ে তেলের চাহিদা মেটাতে হয়। উপসাগরীয় অঞ্চল অশান্ত থাকার কারণে ইউরোপ সহ প্রাচ্যের যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর আবাধ তেল প্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়। অপরদিকে ইসলামিক ইরান উপসাগরীয় ইরাককে সমর্থনকারী দেশ সমূহের বিরুদ্ধে হুমকি অব্যাহত রাখলে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। এদের মধ্যে যে দেশটি সবচেয়ে বেশি হুমকির মধ্যে থাকে সেটি ছিল কুয়েত। পূর্ব কুয়েত শিয়া প্রধান অঞ্চল। কুয়েত ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তেহরান কুয়েতি শিয়াদের মধ্যে আল-সাবাহ্ পরিবারকে উৎখাত করে ইসলামিক বিপ্লব ঘটাবার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। যদিও কুয়েতের শিয়ারা কখনই তেহরানের এ হাতিয়ারে পরিণত হয় নি তবুও কুয়েতের শাসক গোষ্ঠি শংকিত হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্র এযুদ্ধে অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে, উপসাগরীয় অঞ্চলে নৌবহর মোতায়েন করে তেল নির্বিঘ্নে সরবরাহ নিশ্চিত করবার নিমিত্তে। এর মধ্যেই ডিসেম্বর ১৯৮৩ সনে ইরান সমর্থিতরা নাশকতামূলক কর্মকান্ডের সূচনা করে। এ সবের প্রেক্ষিতে কুয়েতের সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠরা শিয়াদের সরকারি দফতরের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য কুয়েত সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছিল।

কুয়েতের উপর ইরানের হুমকি এবং উপসাগরে কুয়েতের তেলবাহী জাহাজের উপরে হামলার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে সরকার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়েছিল।

www.pathagar.com

কুয়েত সরকার তেলবাহী সুপার ট্যাংকারগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় চলাচল করবার ব্যবস্থার অনুরোধ জানালে ওয়াশিংটন প্রথমে রাজি না হলেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ ওয়াশিংটনকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। ১৯৮৭ সনে যুক্তরাষ্ট্র কুয়েতি তেলবাহী ১১টি জাহাজকে নিজস্ব পতাকাবাহী জাহাজে রূপান্তরীত করতে সম্মত হলে যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাবাহী সুপার ট্যাংকারগুলোকে পাহাড়া দেবার জন্য নৌবাহিনীর একটি ফ্লিট মোতায়েন করেছিল।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ প্রায় আটবছর স্থায়ী ছিল। এ যুদ্ধে দু'পক্ষের অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও রাজনৈতিক সংকটেরও জন্ম দেয়। একদিকে যখন তেল উৎপাদনকারী আরব রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে সৌদি আরব এবং আমিরাতের দেশগুলো ইরাককে ইরানের বিরুদ্ধে জড়াতে উৎসাহিত করে তেমনি সাদ্দাম হোসেনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকাতেও তৎপর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ইসরায়েলের প্রতি সাদ্দামের হুমকির কারণে যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামের ক্রমবর্ধমান শক্তি তথা প্যালেসটিনিয়ানদের প্রতি প্রকাশ্যে ইসরায়েল বিরোধী সমর্থন ইত্যাদিতে ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। ওয়াশিংটন স্পষ্টতই বুঝতে পারে যে, এ মুহূর্তে সাদ্দামকে ঠেকাতে না পারলে ভবিষ্যতে ইরাক এতদঅঞ্চলের জন্য প্রচণ্ড এক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের সমাপ্তি হয় আগস্ট ১৯৮৮ সনে। এ যুদ্ধে কোনো পক্ষই বিরাট ধরনের বিজয়ের দাবি করতে পারে নি। অন্যদিকে আগস্ট ১, ১৯৯০ সনে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের সাথে ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেনের মধুর সম্পর্ক ছিল বলে প্রতীয়মান। ইরানের ইসলামিক বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বার ভয়ে জর্জরিত আরব দেশগুলো ইরাককে ইরানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত একমাত্র শক্তি হিসেবে ইরাকের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সাহায্যও জুটিয়ে আসছিল। ইরানের বিপ্লবের প্রভাবে ভীত সৌদি আরব ছিল এসব সমর্থনকারী দেশের শীর্ষে বিশেষ করে ১৯৭৯ সনে পবিত্র মক্কা শরিফে ইরান সমর্থিত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর থেকেই। অন্যদিকে সাদ্দাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য তেল উৎপাদনকারী আরব দেশগুলো বিশেষ করে সৌদি আরব আর কুয়েতের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে এবং এ দু'দেশ থেকে কোনো সদিচ্ছার আভাস না পাওয়ার কারণে সাদ্দাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এ যুদ্ধে ইরাকের ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রায়

www.pathagar.com

দশ বছর ইরাকের তেলের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছিল।

ইরাক আগস্ট ১, ১৯৯০ সনে ঐতিহাসিকভাবে ইরাকের অংশ বলে পরিচিত কুয়েত আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং সে এলকাকে ইরাকের প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। ইতিহাসের পাতায় ইরাকের কুয়েত দখল এবং পরবর্তী সংঘাতকেই বর্তমানের ইরাক সংকটের প্রেক্ষাপট বলে চিহ্নিত করবে। অনেক বিশেষজ্ঞও মনে করেন, ১৯৯০-৯১ এর কুয়েত সংকট যুক্তরাষ্ট্র আর কুয়েতের যৌথ প্ররোচনার ফাঁদে সাদ্দামের পা দেবার ফলেই সৃষ্ট।[৯] এ তত্ত্ব মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আরও দুটি দেশ সাদ্দামকে এ ফাঁদে পা দিতে প্ররোচিত করে তাদের মধ্যে সৌদি আরব আর কুয়েতই প্রধান। কুয়েতের সাথে ইরাকের বিরোধ তেলক্ষেত্র আর অমীমাংসিত সীমানা নিয়েই নয়; বরং ঐতিহাসিক কারণেও। ঐতিহাসিক কারণ পরে আলোচনা করব। এ বিরোধ প্রায় সত্তর বছরের ইরাকের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই। এ বিরোধ আরব রাষ্ট্রগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বহিঃবিশ্ব মাথা ঘামায় নি।

ইরাক-ইরান যুদ্ধের পরপরই এ বিরোধ আর একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। প্রায় আট বছর যুদ্ধের পর ইরাক তেলের বাজার হারিয়ে ফেলে। সমগ্র যুদ্ধের সময়টাতে ইরাক-ইরানের তেল উৎপাদনের ঘাটতি হওয়ায় সৌদি আরব আর কুয়েত সে ঘাটতি পূরণ করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করেছিল। ১৯৮৮ সনে যুদ্ধ শেষ হবার পরেও এ অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি। অন্যদিকে হঠাৎ করে কুয়েত ওপেক নির্ধারিত কোটার অনেক বেশি তেল উৎপাদন শুরু করলে তেলের বাজারে মূল্য সর্বনিম্নে চলে আসে। এ কারণেই ঐ সময়ে ইরাকের তেলের পুনঃ উৎপাদন শুরু হলেও চাহিদার অভাবে ইরাক আরও ক্ষতির সম্মুখিন হয়। ইরাক কুয়েতকে বিতর্কিত সীমান্ত সংলগ্ন তেলক্ষেত্র সেখান থেকে অতিরিক্ত তেল উৎপাদনের জন্য সরাসরি দায়ী করে রুমালিয়া থেকে উৎপাদন বন্ধ করতে অনুরোধ করলে কুয়েত তাতে কর্ণপাত করে নি।

১৯৯০ এর প্রথম থেকেই ইরাক আর কুয়েতের সম্পর্কের টানাপড়েন চরমে উঠে। সাদ্দাম কুয়েতকে চরম হুঁশিয়ারী দিয়ে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকে। অনেক বিশেষজ্ঞও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, ইরাকের কুয়েত বিরোধ এবং সম্ভাব্য সামরিক হামলা সম্বন্ধে ওয়াশিংটন সাদ্দামকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেছে।[১০] এখানে উল্লেখ্য যে,

৯। John k. Cooley : Payback. Ibid.

১০। John K. Cooley Payback: America's Long war in the Middle East. P. 184.

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৯০ সনে ইরাক কুয়েত টানাপড়েনের সূচনালগ্নে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন এ্যাসিসটেন্ট স্টেট সেক্রেটারি জন কেলী বাগদাদ সফর করে সাদ্দামের সাথে বৈঠক করেন। সূত্রমতে, জন কেলী সাদ্দামকে আরব বিশ্বে একজন প্রগতিবাদী শক্তি বলেও আশান্বিত করে ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথাও বলেন। একথা সাদ্দাম জর্দানের তৎকালীন শাসক প্রয়াত বাদশাহ হোসেনকেও জ্ঞাত করেন।[১১] এতসবের মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের দুমুখো নীতির অবসান হয় নি। ফেব্রুয়ারি ১২ তারিখে ভয়েজ অব আমেরিকা সাদ্দাম বিরোধী সম্পাদকীয় প্রচার করে। এর পরেই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইরাক কর্তৃক কুর্দিদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন করবার প্রায় ১২ পৃষ্ঠা রিপোর্ট প্রকাশ করে।

আগস্ট ১, ১৯৯০ সনে ইরাক অবশেষে কুয়েত আক্রমণ করে দখল করবার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী এর প্রতিবাদ এবং নিন্দার ঝড় শুরু হয়। এ দিন সন্ধ্যায় তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচ বুশের (বর্তমান বুশের পিতা) সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন, ঐ দিনই বিকেল ৪:৩০ মিনিটে জাতিসংঘের শান্তি পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে রেজ্যুলিউশন ৬৬০ অনুমোদন করে। তৎকালীন ইরাকি জাতিসংঘের দূত এ রিজ্যুলিউশনের বিপরীতে বলেন যে, কুয়েতের 'ইয়ং রেভ্যুলিউশনারী কুয়েতিদের' ডাকে ইরাক কুয়েত থেকে আল সাবাহ্ পরিবারের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। কাউন্সিল রেজ্যুলিউশন ৬৬০ এ ইরাককে বিনা শর্তে কুয়েত ত্যাগের কথা বলে বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মেটাবার কথাও বলা হয়। এ রেজ্যুলিউশন জাতিসংঘের চ্যাপ্টার ৭ এর আওতায় আনীত হয়। এতে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে প্রথমে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ এবং অবরোধে কার্যকর না হলে সম্পূর্ণ অবরোধ আরোপের প্রবিধানও রয়েছে। ইরাক–কুয়েত সংকট নিরসনের বহু কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার পর ১৯৯১ সনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জাতিসংঘের অনুমতিক্রমে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ইরাকি দখল থেকে কুয়েতকে মুক্ত করা হয়।

ঐ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কর্মকর্তা আজ বুশ জুনিয়রের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। 'গালফ ওয়ার এবং ডেজার্ট স্টর্ম' নামক ঐ অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (সিনিয়র) এর সাথে ছিলেন তৎকালীন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি (মন্ত্রী) ডিক চেনী বর্তমানে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ কলিন

১১ John K. Cooley Payback: America's Long war in the Middle East. P. 184.

www.pathagar.com

পাওয়েল, বর্তমানে পররাষ্ট্র সেক্রেটারি (মন্ত্রী) আর জেমস বেকার সেক্রেটারি অব স্টেট। সেই থেকে আজ অব্দি (১৯ মার্চ ২০০৩) ইরাক এখন মার্কিন আগ্রাসনের মুখে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞায় রয়েছে।

ইরাকের সাম্প্রতিক ইতিহাস রক্তক্ষয়ের ইতিহাস। তেমনি ইরাকের তেল নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই রয়েছে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উত্থান-পতন আর বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতার অন্যতম কারণ। যোগ হতে যাচ্ছে সাদ্দাম উত্তর বাগদাদের অনিশ্চিত পরিস্থিতি।

ইরাকের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষমতার পরিবর্তন রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ছাড়া হয় নি, এ ধারার সূচনা হয় ইরাকের ১৯২০ সনের স্বাধীনতার পর থেকেই।

www.pathagar.com

উপসংহার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পুরাতন বিশ্ব মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাজকীয় রাশিয়ায় প্রথমে অভ্যুত্থান হয় ১৯১৭ সনের ২৪–২৮ ফেব্রুয়ারি যখন জ্বার (Czar) দের উৎখাত করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করার জন্য সংগঠিত হয়। তবে এ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বলসেভিকদের পাল্টা অভ্যুত্থানে সমগ্র রাশিয়াতে ট্রট্রস্কি পন্থীরা সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। অন্যদিকে ১৯১৬ সনে সম্পাদিত হয় এক গোপনচুক্তি যা ইতিহাসে সাইক-পিকট চুক্তি নামে পরিচিত। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্স এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় ছোট ছোট আরব রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটানো হয়। ১৯২০ সনে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হবার পর ককেসাস অঞ্চলে রাশিয়ার কর্তৃত্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যে নতুন রাষ্ট্রগুলোর অভ্যুদয় হয়। ঐ সময় পশ্চিমা প্রযুক্তির সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ বিশ্ব চাহিদা মেটাবার নিমিত্তে আন্তর্জাতিক বিশেষ করে বৃটিশ এবং যুক্তরাষ্টের কোম্পানিগুলো নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। আরও পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ তত্ত্বাবধানে শাসিত প্যালেস্টাইন ভাগ করে ১৯৪৮ সনে ইসরায়েল নামক ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। বদলে যায় বিশ্ব রাজনীতি। ইউরোপ ভাগ হবার মধ্যদিয়ে পৃথিবী দু'বলয়ে চলে আসে। এর একটি ধনতন্ত্রবাদ অন্যটি রাশিয়ার ছায়ায় লালিত সমাজতন্ত্র। বিশ্বের অর্থনীতি আর রাজনীতিতে এ দু'বলয়ে যে শীতল যুদ্ধ সূচিত হয় তার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রধানত ছিল মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ।

পৃথিবীর উৎপাদিত জ্বালানি তেলের সবচেয়ে বেশি ভোক্তাদেশ হিসেবে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ১০ ভাগ প্রয়োজনীয় তেল আমদানি করে থাকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের বড় ভোক্তা দেশগুলো ইউরোপের এবং জাপানের মত বৃহৎ শিল্পোন্নত দেশগুলো। জাপানের প্রায় পঁচাশি ভাগ তেলই

www.pathagar.com

আমদানি হয়ে থাকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এ কারণেই সমগ্র ইউরোপ এবং পূর্বএশিয়ার দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের উপরেই নির্ভরশীল। ১০ শতাংশ হলে যুক্তরাষ্ট্রের এ নির্ভরশীলতা ইউরোপের অনেক দেশ থেকে বেশি। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সঞ্চিত তেলের ভাণ্ডার। যার মধ্যে আনুমানিক ১,৬৭০,০০০,০০০ ব্যারেল বর্তমানে উত্তোলন উপযোগী রয়েছে আর মোট মজুদের পরিমাণ ধরা হয়েছে আনুমানিক ৬,২৬,০০০,০০০,০০০ ব্যারেল যেখানে এ পর্যন্ত বিশ্বের মোট মজুদ ধরা হয়েছে ১,০৬৭,০০০,০০০,০০০ ব্যারেল (১৯৯১ পর্যন্ত)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরপরই মধ্যপ্রাচ্য থেকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো পুরাতন অঞ্চলগুলো ভাগ করে অনেক ক্ষুদ্র দেশের জন্ম দিয়ে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করলেও তাদের প্রভাব রেখে যায়। এ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সম্পদকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বলয় থেকে মুক্ত রাখবার জন্য নিজেদের প্রভাব পাকাপোক্ত রাখবার ব্যবস্থা হিসেবে পছন্দনীয় শাসক গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এসব শাসকদের সাথে সাধারণ আবর জনগণের দূরত্ব বাড়তে থাকলে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম হতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া আর ইরাকের মত দেশে ক্রমেই জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানে পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্ব শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সমগ্র ষাটের দশকে অস্থিরতা বিরাজমান থাকে আর সে সাথে চলতে থাকে চলমান আরব ইসরায়েল সংঘর্ষ। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত সন্তর্পণে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিহত করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আত্মপ্রকাশে ঐসব দেশের জাতীয় সম্পদের সরাসরি কর্তৃত্ব গ্রহণ করলে পশ্চিমের সাথে টানাপড়েন আরও বেড়ে যায়। মিশরের তৎকালীর রাষ্ট্রপতি নাসের কর্তৃক সুয়েজখাল, লিবিয়া এবং ইরাকের তেল সম্পদ জাতীয়করণ এমনই কিছু উদাহরণ। অন্যদিকে সত্তরের দশকে ইরানে ইসলামি অভ্যুত্থান। রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্তান দখল, ইরানের ইসলামি সরকারের ইসরাইলকে তেল রপ্তানি বন্ধকরণ ইত্যাদি এতদঅঞ্চলকে শুধু উত্তপ্তই করে নি বরং পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থে দারুণ আঘাত হানে।

সত্তরের দশকে এসব অস্থিরতা বিশ্বের অর্থনীতিতে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। পশ্চিমের জন্য তখন দুটি বিষয় মুখ্য হয়ে উঠে। একটি সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, অন্যটি 'ইসলামিক শক্তিকে প্রতিহত করণ'। বিশেষ করে ইরানের

www.pathagar.com

অনুকরণে মধ্যপ্রাচ্যে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোকে নিজের বলয়ে রাখার প্রয়াস। পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থ রক্ষার অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যুক্তরাষ্ট্র। ঐ সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে ইসরায়েলের স্বাধীনতা আর সৌদি আরবের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকে প্রভাবিত রাখার জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইরানের ইসলামিক অভ্যুত্থানকে ঠেকানো অথবা কোণঠাসা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে ইরাককে ইরানের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে ৮ বছর ইরাক–ইরান যুদ্ধকে জিইয়ে রাখে। ঐ যুদ্ধে ইরাককে যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষ সমর্থ যোগায় এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্র ইরাককে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমর্থন যুগিয়ে যায়। অন্যদিকে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলে প্রায় দশ বছরের গেরিলা যুদ্ধ যার মূলমন্ত্র ছিল ইসলামি জিহাদ আর সমর্থক হলো যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো।

১৯৯১ সনে পৃথিবী আর একবার বদলে যায় সোভিয়েত রাশিয়া খণ্ডবিখণ্ড হয়ে সোভিয়েত শক্তি পতনের মধ্য দিয়ে। এরই মধ্য দিয়ে পৃথিবী চলে আসে একক পরাশক্তির বলয়ের মধ্যে। একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতিকে ঢেলে সাজিয়ে বিশ্বের মুরুব্বি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শুরু হয় অর্থনৈতিক অভিযান। মধ্যপ্রাচ্যের নতুন অঘোষিত শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যাকে পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামিক কট্টরবাদ নামে অভিহিত করে শঙ্কিত হয়ে উঠে। আরব–ইসরায়েল সংঘর্ষে মধ্যপ্রাচ্য আরও উত্তপ্ত হতে থাকে। এরই মধ্যে রাশিয়ায় পূর্বতন এবং বর্তমানে স্বাধীন দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর জ্বালানি সম্পদের বিরাট মজুদের এবং আহরণের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের তেল কোম্পানিগুলো রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে। পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের বিকল্প হিসেবে কাস্পিয়ান অঞ্চলসহ সমগ্র মধ্যএশিয়ায় ইসলামিক কট্টরবাদী দমনের নাম করে নিজেদের উপস্থিতি জায়েজ করে নেয়। এরই সাথে এশিয়ার অন্যান্য দেশেও জ্বালানি ক্ষেত্রে ব্যাপক লগ্নি আসতে থাকে। সে সাথে মধ্যপ্রাচ্যকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর ঘটনার পর থেকে আরও সক্রিয় হয়ে উঠে। রাষ্ট্রপ্রতি বুশের 'শয়তানের অক্ষ' বা Exis of Evil এর দুটি দেশ ইরাক আর ইরান জ্বালানিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং এখনও ওই দেশ দুটি যুক্তরাষ্ট্র তথা ইসরায়েলকে রক্তচক্ষু দেখাতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরকি দখলের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য নিমজ্জিত হতে পারে অত্যন্ত অবিশৃঙ্খল অবস্থায়। সূত্রপাত হতে পারে পৃথিবীতে আর একবার ঔপনিবেশিবাদ। তবে এটি

www.pathagar.com

হবে পরোক্ষ এবং এর কেন্দ্রে থাকবে জ্বালানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ। এর প্রভাব পড়বে ইন্দোনেশিয়া হতে মরক্কো পর্যন্ত। উত্তরে চেচনিয়া হতে দক্ষিণে ভারত পর্যন্ত। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় পুনর্নির্ধারিত হবে আন্তদেশীয় সম্পর্ক। জ্বালানি সম্পদই নির্ধারণ করবে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব কূটনীতি।

www.pathagar.com

দৈনিক সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-ইরাক

(যদিও এ পুস্তক ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসন ভিত্তিক নয় তবে যেহেতু এ আগ্রাসনের সাথে তেলের সম্পর্ক রয়েছে তাই বিভিন্ন পত্রিকায় আমার লেখাগুলো সংলগ্নীকরণ করলাম। আশা করি এসব লেখা পাঠকদের ঐ আগ্রাসন সম্বন্ধে কিছু সম্যক ধারণা দেবে)।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ বিশ্বের ৬০০ শহরে ইরাকের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন সম্ভাব্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইতিহাসে নজিরবিহীন সমাবেশ হয়েছিল। নজিরবিহীন এ কারণে যে, ইতিপূর্বের প্রাক-যুদ্ধ এতবড় যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশ দেখা যায় নি। এসব সমাবেশ লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন সহ ইউরোপ তথা আমেরিকার বড় শহরগুলোতে যে পরিমাণ জনসমাগম হয় তা ঐসব দেশে ইতিপূর্বে হয় নি। খোদ লন্ডনে প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাগম হয় যুদ্ধের বিরুদ্ধাচারণে। বৃটিশ ইতিহাসে এতবড় সমাবেশের নজির নেই। সমাগমে বিভিন্ন ধরনের প্লাকার্ডের একটিতে লেখা ছিল 'DROP BUSH NOT BOMB' (বুশকে ফেল বোমা নয়)। এ ধরনের প্লাকার্ডের মধ্য দিয়ে বৃটিশ নাগরিকরা তাদের প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ারের বুশ তোষণের বিরোধ প্রদর্শন করবার প্রয়াস পান। অন্যদিকে নিউইয়র্কে অনুরূপ সমাবেশে বুশের ইরাক নীতির বিরোধিতা প্রকাশ পায়। এ সব প্রদর্শনে বিশেষ করে লন্ডনের সমাবেশ কিঞ্চিত হলেও টনি ব্লেয়ার এবং লেবার পার্টির তাবদ নেতাদের চিন্তিত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমাবেশে এবং ক্রমবর্ধমান জনরোষ তথা ইউরোপের বিভাজন ইত্যাদি টনি ব্লেয়ারের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত বলে মনে হলেও যুদ্ধের প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি, বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশের নেতা জর্জ বুশ তার প্রতিক্রিয়ায় সম্মানপূর্বকভাবে এসব জনমতকে নাকচ করে দিয়ে যুদ্ধের প্রত্যয়ে অটল রয়েছেন। তবে বুশ চেষ্টা করেছেন জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধের অনুমোদন

www.pathagar.com

প্রাপ্তির। লন্ডন এবং ওয়াশিংটন চেষ্টা করবে জাতিসংঘের অনুমোদনের। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে যুদ্ধ শুরু করবে। এতে বৃটেন যে যোগ দেবে তাতে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এ দু'দেশের নেতাগণ ইরাকের চারপাশে যে ভাবে সৈন্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের সমাবেশ করেছেন তা সম্ভাব্য যুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ হবে কি হবেনা তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা ইদানিং বেড়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ বিরোধী সমাবেশের পর। তবে ইরাকের যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সাদ্দাম হোসেন তথা ইরাকি বাথ-পার্টির উপরে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যূনতম চাহিদা সাদ্দামকে তথা বাথ পার্টিকে ইরাক ছাড়তে হবে এবং পরবর্তীতে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তানের আদলে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার কায়েম করা হবে। এর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ন্যূনতম পক্ষে দু'বছর সময় লাগবে। আর এ দু'বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করবার দায়িত্বে থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্ট্রাল কমান্ড' প্রধান জেনারেল টমিফ্যাংক আর সাদ্দাম উৎখাত যদি যুদ্ধের মাধ্যমে হয় সেক্ষেত্রে এ সময়সীমা নির্ভর করবে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। তবে সাদ্দাম বা বাথ পার্টি ইঙ্গ-মার্কিন ইচ্ছানুযায়ী ইরাকের ক্ষমতা ছেড়ে দেবে এমনটার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যায় নি। উভয় পরিস্থিতিতেই বাগদাদ পুনরায় রক্তে রঞ্জিত হবে। সাদ্দামের পতন, যেভাবেই হোকনা কেন, বাগদাদের ইতিহাসকে নতুনভাবে রঞ্জিত করবে। প্রায় চল্লিশ বছরের শাসকগোষ্ঠি ইরাকের বাথ নেতা এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে জনরোষ লেলিয়ে দেয়া হবে তার পরিণতি নব্বইয়ের দশকের ইরানের চেয়ে ভয়াবহ হবে।

ইরাকের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষমতার পরিবর্তন রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ছাড়া হয় নি। অবশ্য ১৯৬৩ সনে হাসান-আল-বাকের কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর ১৯৭৯ সনে বাকেরকে অপসারণ করে সাদ্দামের ক্ষমতায়নকে কোনো রক্তপাত ছাড়াই হয়েছিল। ফয়সাল-১ হতে কর্নেল আবদেল রহমান পর্যন্ত অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করা হয়েছিল ফয়সাল-২ এর স্বপরিবারে হত্যার মধ্যদিয়ে। ১৯৫৮ সনে কর্নেল করিম কাশেমের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতে বাগদাদে বৃটিশ সামরিক উপস্থিতির সমাপ্তি করেন। ইরাকের রক্তাক্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে হাসান আল বাকেরই একমাত্র রাষ্ট্রপতি যিনি প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হন নি।

www.pathagar.com

ইরাকের (পুরাতন মেসোপটেমিয়া) রাজনৈতিক ইতিহাস যেমনি রক্তে রঞ্জিত তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন সময়ের বৃহৎ তথা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সূচিত চক্রান্ত আন্ত-শক্তির শীতল যুদ্ধে ভরা। এসব চক্রান্ত শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি ১৯১৬ সনে বৃটিশ আর ফরাসি সাইক-পিকট চুক্তি নামক সমঝোতার মধ্য দিয়ে। এ চুক্তি করা হয়েছিল তৎকালীন ইউরোপের দুই পরাশক্তির মধ্যে যুদ্ধোত্তর আহকের মধ্যপ্রাচ্যের ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের ভাগ করবার নিমিত্তে। আর ঐ বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে সামরিক রণকৌশলে গতির (Speed) এর সন্নিবেশ হলে জ্বালানি তেলের চাহিদার অপ্রতুলতা এসব ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোকে নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কারে উৎসাহিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ট্যাংকের ব্যবহার এবং জ্বালানি চালিত গাড়ির সংযোজন তেলের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। সে সাথে বিমান এবং নৌবাহিনীর অধিক প্রয়োগ ইত্যাদি জ্বালানি তেলকে সামরিক সম্ভারের (logistics) অন্যতম উপাদানে পরিণত করে, যার গুরুত্ব আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। শুধু সামরিক ব্যবহারের জন্যই নয়; বরং যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে ইউরোপের সামরিক এবং বেসামরিক দ্রুত শিল্প বিকাশের জন্য কয়লার পরিবর্তে জ্বালানি তেলের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ইউরোপে ঐ সময় তেলের প্রাপ্যতা এসব চাহিদা পূরণের জন্য ছিল অপ্রতুল। ফ্রান্সের নিজস্ব তেলের কোনো উৎসই ছিল না। স্মরণযোগ্য যে, সাইক-পিকট চুক্তির সময়ে মধ্যপ্রাচ্যেও তেলের উৎস পাওয়া যায় নি তবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছিল। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ছিল ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে আর ওসমানিয়া তুরস্ক-জার্মানির সাথে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে বৃটিশ বাহিনী আগেভাগে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তর ভূ-খণ্ডে ঢুকে পড়লে যেসব অঞ্চল ফ্রান্সের হাতে আসার কথা ছিল সেগুলোতেই বৃটিশ বাহিনী তাদের আধিপত্য অর্জন করলে ১৯১৬ সনের চুক্তি লঙ্ঘনে ফ্রান্স আর বৃটিশ শক্তি দানা বাঁধে। ফ্রান্সের আপত্তিকে নাকচ করে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯১৮ সন) বেলফোর বলেন 'তেল হচ্ছে মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাকের বহুলাংশ) প্রধান চালিকা শক্তি' ('Oil is the guiding principal in Mesopotamia')। তিনি আরও বলেন 'কোন উপায়ে আমরা তেলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করি সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করি না। আমি মনে করি জ্বালানি তেল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ জ্বালানি তেল আমাদের পেতে হবে' ('I do not care under what system we keep the oil. But I am quite clear it is all

www.pathagar.com

important for us that this oil should be available')। আর এ লক্ষ্য কে সামনে রেখেই যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও বৃটিশ বাহিনী উত্তর মেসোপটেমিয়ার মসুল সহ সম্ভাব্য তেল অঞ্চল দখল করে নেয়। এ দখলের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকার ফ্রান্সকে একপ্রকার কোণঠাসা করে ফেলে। এ হটকারিতায় ফ্রান্স এতই তিক্ত হয়ে উঠে যে ভার্ষাই চুক্তির বৈঠকে তৎকালীন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্ল্যাসুস্য আর বৃটিশ প্রতিপক্ষ ডেভিড লয়েড জর্জের মধ্য উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রু উইলসনের মধ্যস্থতায় এ বিপদের মীমাংসা হয়।

ইঙ্গ-ফরাসি বিবাদের নিষ্পত্তি হলেও তেলের অংশীদারিত্ব নিয়ে পুনরায় ইতালির সান রেমোসে ১৯২০ সনে 'সান রেমোসে' নামক আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে সমান অংশীদারিত্বে ফ্রান্সকে প্রাপ্য তেল উত্তোলনের ভাগ দেয়ার প্রস্তাবনা রাখা হয়।

১৯২১ সনের বেভার চুক্তির মধ্যদিয়ে পরাজিত ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি হলে মেসোপটেমিয়ার উত্তর অংশ (বর্তমানে সিরিয়া এবং লেবানন) ফরাসি তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। কুর্দি অঞ্চলকে বর্তমানে তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া, ইরান আর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য বিভাজন করে সংযোজন করা হয়। বাগদাদের কর্তৃত্ব থাকে আরব অধ্যুষিত দক্ষিণের অঞ্চল, বর্তমানের কুয়েতকে আলাদা করে সরাসরি বৃটিশ তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

গত শতাব্দীর বিশের দশকে তৎকালীন পারস্য বর্তমান ইরানের পশ্চিমাংশে বৃটিশ ভূতাত্ত্বিক প্রথম তেল ক্ষেত্রের সন্ধান পাবার পর থেকেই ইরাকে তেলের অনুসন্ধান আরও জোরদার করা হয়। ১৯২৮ সনে উত্তর ইরাকের কিরকুক নামক স্থানে প্রথম তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার হয় বৃটিশ বাহিনীর মেসোপটেমিয়া দখলের পর থেকে ইরাক অঞ্চলে এ দখলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হয়। ১৯২০-৪১ পর্যন্ত ইরাক বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। এরই প্রেক্ষিত ফয়সাল -১ কে শাসক বানিয়ে বাগদাদে বসানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃশ্যপটে আসার পর ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নুরী আস সাঈদকে দিয়ে সোভিয়েত বিরোধী বাগদাদ চুক্তি সম্পন্ন করিয়ে ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়। ১৯৭২ সনে বাথ পার্টি ইরাকে তেল রাষ্ট্রীয়করণ করলে পশ্চিমা কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ইরাকের তেল রাষ্ট্রীয় করণের নেপথ্যে ছিলেন পার্টির উদীয়মান নেতা সাদ্দাম হোসেন। ইরাক বিশ্বের দ্বিতীয় পরীক্ষিত

www.pathagar.com

তেল মজুদ এবং উৎপাদনকারি দেশ। প্রায় ১১০ বিলিয়ন ব্যারেল মজুদ এবং সমপরিমাণ তেল সম্ভাব্য মজুদ রয়েছে ইরাকে। গুণগত মানের মাপকাঠিতে ইরাকের তেল সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত। ইরাকের তেল উত্তোলনের খরচ পড়ে প্রতি ব্যারেলে ১ মার্কিন ডলার মাত্র। অতি সহজে পরিশোধন যোগ্য বিধায় বিশ্বব্যাপি এ তেলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর বৃহৎ ভোক্তা দেশগুলোর অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণই সাদ্দামের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপরে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিগত পঞ্চাশ বছরের সমস্যা ইসরায়েল। বিগত চল্লিশ বছরে ইরাকের বাথ সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ থাকলেও ইরাককে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শিল্পোন্নত এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার দাবিদার। ইরাকে রয়েছে আবরবিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানী এবং আর শিক্ষাব্যবস্থাও অত্যাধুনিক। তবে একদলীয় দেশ হিসাবে ইরাকের ক্ষমতা কুক্ষিগত করবার জন্য বাথ সরকার তথা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে উৎপীড়ন আর নিপীড়নের অভিযোগ অখন্ডনীয় তথাপি মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা ইরাকের প্রভূত উন্নতির জন্য বাথ পার্টিকে কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন।

সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রধান অভিযোগের মধ্য একটি হলো উত্তরের কুর্দিদের উপর নির্যাতন। এ কথা সত্য যে, ইরাকের স্বাধীনতার পূর্ব হতেই প্রথমে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এবং আরও পরে বাগদাদ ইরাকি কুর্দিদের অনবরত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। কুর্দি ইতিহাস আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই বিদ্রোহ আর সংগ্রামের। এক সময়কার মুসলমানদের হয়ে ক্রুসেডারদের হাত হতে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারকারি কিংবদন্তির নায়ক সালাউদ্দিন আইয়ুবী যে সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন তার ব্যাপ্তি ছিল মিশর হতে মক্কা, মদিনা এবং জেরুজালেম সহ আরমেনিয়া পর্যন্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্বে শিয়া মুসলিম সাফাভীদ সাম্রাজ্য এবং উত্তর পশ্চিমে ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রসারের যেমনি আইয়ুবাইড সাম্রাজ্য সংকীর্ণ হতে থাকে তেমনি কুর্দি অঞ্চল এ দুই সাম্রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। এ বিভাজনকেই পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরও ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো অব্যাহত রাখে। পশ্চিমা সভ্যতা বিশেষ করে ইউরোপীয় সভ্যতা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কুর্দিদের হাতে পরাজয় এবং জেরুজালেম ও দামেস্ক হতে বিতাড়িত হবার ইতিহাস ভুলতে পারে নি। এর যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসেই নিবন্ধিত। প্রধানত ঐ কারণেই ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৯২১ সনের সাভরস (Sevres Treaty) চুক্তিতে স্বাধীন

www.pathagar.com

কুর্দিস্তানের আশ্বাস দেয়া থাকলেও তৎকালীন ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ শক্তি ওসমানিয় কুর্দিস্তানকে ইরাক, তুরস্ক আর সিরিয়ার মধ্যে ভাগ করে দেয়। এ বিভাজনকে ১৯২৩ সনে সম্পাদিত লওসান (Lausanne) চুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পর থেকেই কুর্দিদের বিদ্রোহ শুরু হয় এবং তা আজও চলমান। শুধু ইরাকেই নয় তুরস্ক আর ইরানও এ বিদ্রোহ দমনে দমন নীতি ব্যবহার করছে। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় বাগদাদের বিরুদ্ধে কুর্দি বিদ্রোহ চরম পর্যায়ে পৌঁছলে হালফজা নামক কুর্দি শহরে সাদ্দাম কর্তৃক রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারের অভিযোগ ঐ সময় পশ্চিমা বিশ্ব নাকচ করে দেয়। পুনরায় কুর্দি বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে ১৯৯১ সনে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়। ঐ সময়ে বাগদাদের বিরুদ্ধে উত্তর দিক হতে চাপ সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন কুর্দিদের ব্যবহার করে। বর্তমানে নো-ফ্লাই জোনের আওতায় রয়েছে উত্তর ইরাকের কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চল। তুরস্ক বিগত ষাট বছর ধরে কুর্দি বিদ্রোহকে কঠিন হাতে দমন করে আসছে। তুরস্কের সামরিক বাহিনী বর্তমানে কুর্দি বিদ্রোহ নিয়ে ব্যস্ত অন্যদিকে মানবাধিকার আরও যত্নবান হবার পরামর্শ দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তুরস্কের সদস্যপদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে। বর্তমানের প্রেক্ষিত ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনায় কুর্দি অঞ্চল তথা কুর্দিদের বাগদাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। পেন্টাগনের সামরিক পরিকল্পনায় ইরাকের বাথ সরকারকে দ্রুত পরাজিত করতে হলে উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে একযোগে হামলা চালাবার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বিষয়। উত্তর-দক্ষিণের হামলার মুখে বাগদাদ প্রতিরোধের ভারসাম্য হারিয়ে অল্প সময়ে পরাজিত হবে আর এতে মার্কিন হতাহতের সংখ্যা সীমিত করা যাবে। উত্তরের এ যুদ্ধ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন তুরস্কের ভূ-খন্ড দিয়ে কুর্দি এলাকায় প্রবেশ। গত দু সপ্তাহ ধরে চলেছিল আঙ্কারা আর ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রচন্ড দরকষাকষি। আঙ্কারা বিশেষ করে তুরস্কের সামরিক বাহিনী তথাকথিত ভবিষ্যৎ তুর্কিস্তান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্ট মনোভাব জানতে চায়। তুরস্ক ইরাকের কুর্দি অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র অথবা অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্ভাবনায় শংকিত। এ ধরনের যে কোনো পরিকল্পনা ভবিষ্যতে বৃহৎ কুর্দিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ নিলে তুরস্কের ভৌগোলিক অখন্ডতার প্রতি হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদিও তুরস্ক ওয়াশিংটনের চাপের মুখে এবং বড় ধরনের অর্থিক অনুদান আর সাহয্যের আশ্বাসে ভূ-খন্ড ব্যবহারের কথা বিবেচনা করছে (এ লেখা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত) তবুও ভবিষ্যৎ নিয়ে

www.pathagar.com

শংকিত। এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে অন্যান্য যে কোনো মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় তুরস্কের উদ্বেগ বেশি থাকলেও বিভিন্ন কারণে আব্দুল্লাহ গুল সরকার যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারছেনা। তুরস্ক ন্যাটোর আওতায় রয়েছে কয়েকটি বৃহৎ মার্কিন বিমান ঘাঁটি। জনমত জরিপে প্রায় ৮০ শতাংশ তুর্কিরা এ যুদ্ধ বিরোধী। তুরস্কের বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতি আর অর্থনৈতিক অব্যবস্থার প্রেক্ষিতে ইরাকের যুদ্ধ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অন্যদিকে পূর্বে পার্শ্ববর্তী দেশ ইসলামপন্থী ইরান সরকারও কুর্দিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত। এ কারণেই ইরান ২০০১ সনে আনসার আল-ইসলামের মত ধর্মীয় কট্টরবাদী সংগঠন দাভকবাতে উত্তর ইরাকের আরবদের সাহায্য করেছে। বিগত দু বছর ধরে আনসার আল-ইসলাম আর ধর্মনিরপেক্ষ বলে পরিচিত কুর্দি রাজনৈতিক সংগঠন প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তান (PUK) এর সাথে সংঘর্ষে রত। উল্লেখ্য যে, মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েল ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ এ নিরাপত্তা পরিষদে আনসার আল-ইসলামের সাথে ওসামা বিন লাদেনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

ইরাক যুদ্ধ আর মার্কিন উপস্থিতি নিয়ে শংকিত বুশ কর্তৃক 'অশুভ চক্র' (Axis of Evil) বলে কথিত আরেক দেশ ইরান। ইরাকের পরে ইরান পরবর্তী টার্গেটে পরিণত হতে পারে, তেহরান এ আশংকায় রয়েছে। সূত্রে প্রকাশ ইতিমধ্যেই ইরান প্রায় পাঁচ হাজার রিপাবলিকান গার্ড দ্বারা গঠিত বিশেষ বাহিনী উত্তর ইরাকের অভ্যন্তরে সীমান্ত রক্ষায় প্রেরণ করেছে।

সাদ্দামের অবশ্যম্ভাবী পতন এবং বাথ সরকারের উৎখাতের পর প্রায় দু'বছর ঈঙ্গ-মার্কিন উপস্থিতির পরিকল্পনা রয়েছে। ঐ সময়ে কুর্দিস্তানে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কুর্দি অঞ্চলেই নয়, প্রায় ৪০ বছর পর বাথ পার্টি উৎখাত হলে সমগ্র ইরাকেই গৃহযুদ্ধের আশংকা করছে পাশ্ববর্তী আরব দেশগুলো। এ সম্ভাবনা এবং আঞ্চলিক অস্থিরতার কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন সউদ। এমনি আশংকা করছে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলো।

ইতিহাসের নিরিখে সম্ভাব্য ইঙ্গ-মার্কিন হামলা এবং ইরাক দখল অথবা বাগদাদে অস্বাভাবিক উপায়ে বাথপার্টির উৎখাত মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির অবস্থাকে আরও সংকটময় করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের পরিস্থিতির। ইরাকের যুদ্ধে বিশ্বশান্তির সহায়ক হবেনা।

সংবাদ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

www.pathagar.com

বুশের পররাষ্ট্রনীতির সামরিকায়ন, টার্গেট বাগদাদ

সমগ্র বিশ্ব এখন এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ ইরাক আক্রমণ করার দিনক্ষণ গুণছেন। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে জলে এবং স্থলে মার্কিন সামরিক শক্তি প্রতিদিনই বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ জন্য সমাবেশ ক্রমেই ১৯৯১ সনের উপসাগরীয় যুদ্ধে নিয়োজিত মার্কিন সামরিক শক্তিকেও ছাড়িয়ে যাবে। পেন্টাগন প্রতিনিয়তই ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনার বিভিন্ন কৌশলগত দিকগুলো খতিয়ে দেখছে। সে সঙ্গে পরিকল্পিত হচ্ছে দীর্ঘ সময়ের জন্য ইরাকে মার্কিন প্রভাবিত শাসনব্যবস্থা অথবা সরাসরি মার্কিন তত্ত্বাবধানে সাদ্দাম-উত্তর ইরাকে শাসন করা। এক সময় ইরাক দখল এবং প্রয়োজনে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক প্রশাসক নিয়োগ। এ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে এখন পর্যন্ত মার্কিনীদের সহযোগী হিসেবে যুক্তরাজ্য তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়াসরত। ইরাকে মার্কিন হামলার সম্ভাব্যতা কতখানি সেটা এখন আর বিবেচ্য বিষয় নয়। বিষয়টি হলো এ হামলা কত তাড়াতাড়ি হতে যাচ্ছে। সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি ও সময়ের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় 'ভূমি বিন্যাস ও আবহাওয়া' (ground and weather)। ইরাকে ভূমি বিন্যাসের সঙ্গে জনবল এবং সামরিক সম্ভারগুলোকে মানিয়ে নেয়ার জন্য গত ছয় মাস ধরে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী গালফ এলাকায় মহড়ার মধ্য দিয়ে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আর অভিযানের জন্য অনুকূল বর্তমান আবহাওয়ার সময়সীমাও প্রায় শেষের পথে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের পরই মরুভূমি উত্তপ্ত হতে থাকবে আর ওই আবহাওয়া ক্রমেই ইঙ্গ-মার্কিন উচ্চ কারিগরি সম্পন্ন যুদ্ধ উপকরণ ব্যবহারে সমস্যার সৃষ্টি করবে।

এ যুদ্ধ হবে অত্যন্ত দ্রুতগতির আর অল্প সময় স্থায়ী। এবারে ইরাক বিরোধী যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর সামনে রাখা হচ্ছে দু'টি প্রধান লক্ষ্য। প্রথমতঃ সাদ্দামের তথা শাসক বাথ পার্টির সমূলে উৎপাটন, দ্বিতীয়তঃ ইরাকের তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রগুলোকে অক্ষত অবস্থায় দখলকরণ। আর এ কারণেই

www.pathagar.com

স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার, বিমান এবং মিসাইল হামলাই হবে যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। খবরে প্রকাশ যুদ্ধের প্রথম পর্বে বাগদাদে হানা হবে ক্রুজ মিসাইল। সে সঙ্গে সাদ্দামকে হত্যার জন্য স্পেশাল ফোর্স এবং বিমান থেকে নিক্ষেপিত হবে অত্যন্ত কার্যকরী স্মার্ট লেসার গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র। লক্ষ্যবস্তু সাদ্দামের অবস্থান। স্মরণযোগ্য, রাশিয়া এ ধরনের বিমান নিক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে নব্বইয়ের দশকে চেচনিয়ার বিচ্ছিন্নবাদী নেতা জোখার দুদায়েভকে হত্যা করেছিল।

দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলোকে অক্ষত অবস্থায় দখল করা। এ লক্ষ্য অর্জনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী স্পেশাল ফোর্স ব্যবহারের পরিকল্পনা করলে প্রয়োজন হবে সাদ্দাম বিরোধী ইরাকি কুর্দি এবং দক্ষিণের শিয়া সমর্থন, যা জোটাতে বুশ প্রশাসন প্রায় এক বছর ধরে চেষ্টায় রত। উত্তর এবং দক্ষিণের নো ফ্লাই জোনে তাই ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বাহিনীর টহল অব্যাহত। ইরাকের বেশিরভাগ তেলক্ষেত্রগুলো উত্তরে কুর্দি এলাকার সন্নিকটে, বিশেষ করে মসুল অঞ্চলে। আরও কিছু বৃহৎ ক্ষেত্র রয়েছে দক্ষিণ ইরান সংলগ্ন বসরা অঞ্চলে। বসরা অঞ্চলেই বিশ্বের বৃহত্তম তেল ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ইরাকের তেল এবং এর উৎপাদন ও সঞ্চালনকে কুক্ষিগত করাই হচ্ছে সাদ্দাম বিরোধী যুদ্ধ অথবা চাপের মুখে সাদ্দাম তথা বাথ পার্টিকে ক্ষমতা থেকে হটানো। এ কারণেই ওয়াশিংটন কূটনীতির আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেছে। ইতিমধ্যে তুরস্কের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুলের একক প্রচেষ্টায় ইস্তাম্বুলে ইরাকের প্রতিবেশী ছয়টি দেশের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এ বৈঠকে এ অঞ্চলে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে কথা হলেও পর্দার আড়ালে সাদ্দামকে দেশত্যাগ করে যুদ্ধ এড়ানোর বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। তবে এ ধরনের খবরকে স্রেফ গুজব বলে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী নাকচ করেছেন।

এ যুদ্ধে তুরস্কের এবং জর্ডানের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তুরস্ক আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে ইরাকের সস্তা তেলের উপর যেমন নির্ভরশীল তেমনি ইরাকের পাইপলাইনগুলোর রয়ালিটি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে যদিও এর পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এখানে আরও উল্লেখনীয় যে, তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েলিদের যে নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান তা এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

যদিও ইরাকের তেল সরাসরি ইসরায়েলে রপ্তানি করা হয় না। তবে মার্কিন কোম্পানিগুলো তেলআবিবকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহ করে আসছে।

ইরাক বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল মজুদকারী দেশ হিসেবে পরিচিত। বাগদাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৯৭ ভাগই তেল এবং এর অন্যান্য উপাদানের রপ্তানি থেকে আসে। গত ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় তেল উৎপাদন প্রায় এক-তৃতীয়াংশে কমে আসে এবং ওই যুদ্ধে ইরাকের তেল খাতেই ক্ষতি হয় প্রায় ১শ' বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তারপরও ইরাক বিশ্ববাজারে সৌদি আরব আর কুয়েত ঐ সময়ে অধিক উৎপাদনের জন্য হারানো বাজার পুনরুদ্ধার করতে পারে নি। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, সৌদি আরব আর কুয়েতের এহেন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ ও দখল করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্টে জানা যায়, ইরাক-ইরান যুদ্ধে অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার জন্য ইরাক সৌদি আরব আর কুয়েতকে যুদ্ধের খরচ বহন করতেও বলেছিল। অবশ্য ইরাক মনে করে যে, ইরানের উগ্রপন্থী ইসলামিক রেভ্যুলিউশন সম্প্রসারিত হওয়ার প্রয়াসকে বাগদাদ প্রতিহত করেছিল যার কারণে সৌদি আবরসহ উপসাগরীয় তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো এ যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার জন্য নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ। বস্তুত বাগদাদের এ দাবি প্রত্যাহার করে কুয়েত এবং সৌদি আরব উভয়ে ওপেকের নির্ধারিত কোটার বেশি তেল উত্তোলন করে বিশ্ববাজারকে অস্থিতিশীল করে ইরাকের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিতে আরও ধ্বস নামায় বলে ইরাক ওপেক এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনুযোগ করেও কোনো সাড়া পায় নি। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় কুয়েত ইরাক-কুয়েত সীমান্তের বিতর্কিত তেলক্ষেত্র 'রুমালিয়া' থেকেই সবচেয়ে বেশি তেল উৎপাদন করেছিল এবং যুদ্ধ সমাপ্তির পরও এ উৎপাদন অব্যাহত রাখার কারণে ইরাকের আন্তর্জাতিক ঋণের পরিশোধিত প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক প্রথমে কুয়েতের বিতর্কিত তেলক্ষেত্র 'রুমালিয়া' এবং পরে সমগ্র কুয়েত দখল করে বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। ওই সময় ১৯৯০ সনে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলকে কোনো সার্বভৌম দেশ গ্রহণ করতে পারে নি। আর এ কারণেই জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মিত্র দেশগুলো কুয়েতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে কুয়েত মুক্ত করে। স্মরণযোগ্য যে, ওই যুদ্ধে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম-এ যোগ দিয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৯১ সনে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে প্রায় এক যুগের ওপর ইরাক জাতিসংঘের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে। শুধু তাই নয়, উত্তর এবং দক্ষিণে নো ফ্লাই জোন সৃষ্টি করে ইরাককে মোটামুটি ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অন্যদিকে ইরাককে শুধুমাত্র খাদ্য ও প্রয়োজনীয় ওষুধ আমদানির জন্য জাতিসংঘের অনুমোদিত পরিমাণ তেল রপ্তানির প্রক্রিয়া বলবৎ রয়েছে। এর মধ্যে রপ্তানিকৃত তেলের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা আটাশ ভাগ জাতিসংঘ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিক খরচের জন্য কর্তিত হচ্ছে। ২০০১ সনের প্রাপ্ত অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান মোতাবেক বহির্বিশ্বের কাছে ইরাকের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত একবছরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত বার বছরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রপ্তানিকৃত তেলের প্রধান আমদানিকারক দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে পয়লা নম্বরে। এ সময় ইরাকের তেলের ৪৬.২% যুক্তরাষ্ট্র, ১২.২% ইতালি, ৯.৬% ফ্রান্স এবং ৮.৬% আমদানিকারক দেশ হিসেবে প্রথম সারিতে রয়েছে (পরিসংখ্যান ২০০০ সন পর্যন্ত)। মাত্র এক সপ্তাহ আগের (২০শে জানুয়ারি, ২০০৩) খবরে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২৭ বছরের চাহিদার বৃহদাংশ মেটানোর নিমিত্তে দিনপ্রতি ০.৫ থেকে ১ মিলিয়ন ব্যারেলে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো পক্ষ থেকেই এ খবরের সপক্ষে বা বিপক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায় নি। তবে বর্তমানে এ আমদানি হবে জাতিসংঘের অনুমোদিত ইরাকি তেল রপ্তানির আওতার মধ্যে।

গত বার বছর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকের মতো একটি সমৃদ্ধ ও বিত্তশালী মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের দেশ করুণ পরিস্থিতিতে রয়েছে। গত এক দশকে এ দেশটির প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে–৫.৭%-এ (বিয়োগ পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ) দাঁড়িয়েছে এবং এ মাথাপিছু বাৎসরিক ক্রয়ক্ষমতার সমতা ২ হাজার ৫শ' মার্কিন ডলার ঠেকেছে। একই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য আমদানির খাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় সমগ্র দেশের ক্রয়ক্ষমতার সমতা দাঁড়িয়েছে ৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ইরাকের স্বাস্থ্যসেবা অতি প্রয়োজনীয় ঔষধাদি এবং উন্নয়নের অভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। এ ধরনের সামাজিক আর অর্থনৈতিক অবস্থায় ইরাকের ওপর আরও একটি যুদ্ধ চাপানোর ফলাফল ইরাকের জনগণের ওপর মারাত্মকভাবে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানে ইরাকের আবালবৃদ্ধবণিতা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর ভয়াবহ যুদ্ধাতঙ্কের মধ্যে কাল যাপন করছে।

www.pathagar.com

যেমনটা আগেই বলেছি, বহু অন্তর্নিহিত কারণেই ইরাকে মার্কিন হামলা অবশ্যম্ভাবী, যদি না সাদ্দাম নিজে থেকেই ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে ইরাককে মার্কিন ইচ্ছার কাছে সমর্পণ না করেন। এরই মধ্যে প্রায় দু'মাস ব্যাপকভাবে তল্লাশি আর বহু রকমের জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত রাতে (বাংলাদেশ সময় রাত ৯-৩০ মি. ২৭শে জানুয়ারি ২০০৩) প্রধান আন্তর্জাতিক অস্ত্র পরিদর্শক হান্স ব্লিক্স এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সির প্রধান মোহাম্মদ বারাদি তাদের আভ্যন্তরীণ রিপোর্ট স্বস্তি পরিষদে উত্থাপন করেছেন। মোহাম্মদ বারাদি আরও সময়ের প্রয়োজন বলে জানান। ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ বা তৈরির প্রয়াসের প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি বলে জানালেও পরিদর্শন অব্যাহত রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে এরমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র এসব পরিদর্শন অর্থহীন বলে মতামত দিয়ে পূর্বের সামরিক শক্তি প্রয়োগ থেকে সরে আসে নি। জর্জ বুশ তাঁর 'স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন' ভাষণেই সামরিক শক্তি প্রয়োগের ওপর জোর দিয়ে জাতিসংঘকে মার্কিন মতামতের ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে বলে আগেই অনুমান করা হয়েছিল। কার্যত হয়েছেও তাই। বুশের মতে ইরাকের তথা সাদ্দাম হোসেনের জন্য সময় দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে এবং আগামী সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই সাদ্দামের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। সাদ্দামের হাতে জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে বলে ঘোষণা এবং জর্জ বুশের সিনেটে বক্তব্যের পর স্বস্তি পরিষদ ও বিশ্বজনমত কোনদিকে যাবে তা লক্ষণীয় হবে। একথা সহজেই অনুমেয় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক হান্স ব্লিক্সের কাঁধে অস্ত্র রেখেই সামরিক অভিযান সূত্রপাতের জন্য ইউরোপীয় তথা রাশিয়ার নেতৃবৃন্দকে এবং জাতিসংঘের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সামরিক শক্তি ব্যবহারের অনুমোদনের প্রচেষ্টা জোরদার করবেন।

সাদ্দামের বিরুদ্ধে বুশের গাত্রদাহ একরকম ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এসেছে। আর তাই ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগে প্রয়োজনে যে কোনো অজুহাত খাড়া করে মার্কিন জনসমর্থন আদায় করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ওয়াশিংটন সাদ্দামকে আল-কায়দার সঙ্গে যুক্ত করে আর এ কারণেই খোদ আমেরিকার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে জনগণের মতামত যুদ্ধের অনুকূলে আনার প্রয়াসে রত সাদ্দামের সঙ্গে আল-কায়দার যোগাযোগের অতীতের ইতিহাস বা বর্তমানের প্রমাণ যেমন নেই তেমনি সাদ্দামের পক্ষে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনাও অমূলক-তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

বুশ প্রশাসনের কাছে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি হবে 'এক্সিস অব ইভল' এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সদ্য প্রণীত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সামরিকায়নের প্রথম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় নির্দ্বিধায় উন্নীত হতে পারলে পররাষ্ট্রনীতি আরও মারমুখো হতে বাধ্য। এ নীতির ভবিষ্যৎ প্রয়োগ হবে বিশ্বের জ্বালানি তথা কৌশলগত সম্পদকে ওয়াশিংটনের একচ্ছত্র আয়ত্তে রাখা, যাতে ভবিষ্যতে বিগত শতাব্দীর মতো যুক্তরাষ্ট্রকে মস্কোর অনুরূপ সম্ভাব্য দ্বিতীয় শক্তির মোকাবিলা করতে না হয়।

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে উপসাগরে সৈন্য ও রণতরীর সমাহার করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো অজুহাতে যুদ্ধ বাধাতে প্রস্তুত। তিনটি বিমানবাহী রণতরি ছাড়াও ৭ হাজার মেরিন এবং প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার সদস্যের সামরিক শক্তি যুদ্ধ শুরু করার আদেশের অপেক্ষমাণ। সে সঙ্গে যোগ দিচ্ছে বৃটিশ বাহিনী। ওয়াশিংটন এ যুদ্ধের জয় এবং ইরাক দখলের জন্য এতই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, প্রয়োজনে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিতেও পিছপা হয় নি।

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যগুলোর সম্বন্ধে এখন আর কোনো রাখঢাক নেই। ইরাকের তেলের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ওই ভূখণ্ডকে ন্যূনতম পক্ষে তিনটি স্বায়ত্তশাসিত কররাজ্যে পরিণত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে প্রকাশ। উত্তরে স্বাধীনতাকামী কুর্দিদের এবং দক্ষিণে ইরাকি শিয়াদের জন্য দু'টি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ সমাপ্তির পথে। অন্যদিকে এসব অঞ্চলের ওপর বাগদাদের ক্ষমতা খর্ব করে মার্কিন প্রভাবিত সরকার গঠন করা হবে। ইতিমধ্যেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী (সেক্রেটারি অফ স্টেট) কলিন পাওয়েল ইরাকের তেল নিয়ন্ত্রণের জন্য এ স্টেট গঠনের প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। ইরাককে আয়ত্তে আনার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের নিরাপত্তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করাও এর আরেক উদ্দেশ্য। সে সঙ্গে রয়েছে ইসরায়েলের প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা। বাগদাদের পতনের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার অবশিষ্ট প্রভাবও খর্ব করবে। ইসরায়েল বিরোধী ইরাকের প্রতিবেশী দেশদ্বয় সিরিয়া আর ইরানকে বাগে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের বেগ পেতে হবে না।

জর্জ বুশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে জোরদার করার জন্য ইরাকে যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আফগানিস্তানের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অঙ্গনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এর অবস্থা থেকে বের হতে হলে ইরাকের তেলের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তদুপরি আফগানিস্তানে মার্কিন উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

এখনও অর্জিন হয় নি। সে ব্যর্থতা পুষিয়ে নিতেও জর্জ বুশ ব্যতিব্যস্ত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভাল করেই জানেন যে, তাঁর দেশের জনগণ সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ আর ত্বরিত বিজয় উভয়কেই সমর্থন যোগাবে যদিও সে দেশে প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে।

যুদ্ধবাজ পারিষদ আর সামরিক চক্রদ্বারা প্রভাবিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ ২০০৩-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি অস্ত্র পরিদর্শকদের আরও সময় চেয়ে এবং ইরাকের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র রাখার অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন না করার পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। তারপর ইরাকের বিরুদ্ধে যে কোনো অজুহাতে যুদ্ধ সূচনা প্রস্তুতির পথ পরিহার করার ইঙ্গিতও দেয় নি। ইরাকে সামরিক অভিযান আর বিশাল এক ভয়ের ওপর নির্ভর করছে মার্কিন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। ওয়াশিংটন সামরিক প্রস্তুতিসহ ইরাকের কথিত অশুভ উদ্দেশ্য নিয়ে যে পরিমাণ বিষোদগার ছড়িয়েছে, সে অবস্থান থেকে সরে আসতে হলে বুশকে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে হবে। একই রকম বেকায়দায় রয়েছেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার।

সাদ্দাম হোসেনের মতো একনায়কত্বকে বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রহণ করা যে যায় না একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে একটি দেশের সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা করে সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রশাসন পরিবর্তনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। গত বিশ বছরে সাদ্দামের মতো একনায়কের শাসনে ইরাকের মতো সম্পদশালী দেশকে বিশ্বের দরবারে ভিলেন হিসেবে দাঁড় করানো এবং আভ্যন্তরীণ দুঃশাসনের কারণেই আজ ইরাকের এ করুণ অবস্থা। এ ধরনের শাসনব্যবস্থা কোনো দেশেই যেমন কাম্য নয়, তেমনি বিশ্বের একক বৃহৎশক্তি কর্তৃক বলপূর্বক নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াসও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যদি সামান্য অজুহাতে বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে অথবা জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে ইরাকে সামরিক অভিযান চালায়, তা একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যৎ বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য সুখকর হবে না। এ ধরনের যুদ্ধ শুধু মধ্যপ্রাচ্যকেই নয়, সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র এবং দুর্বল দেশগুলোকে প্রভাবিত করবে। পালটে দেবে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ভিত আর সে সঙ্গে অপূরণীয় ক্ষতি হবে জাতিসংঘ নামক বিশ্ব সংস্থার।

দৈনিক সংবাদ ঃ ফেব্রুয়ারি ০৩, ২০০৩।

www.pathagar.com

কলিন পাওয়েলের বক্তব্যঃ
ঐতিহাসিক নিরিখে ইরাক সংকট

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের স্টেট অব দি ইউনিয়নের ভাষণের জের ধরে ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ এ যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য প্রাক্তন জেনারেল বর্তমানের সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েল জাতিসংঘের শান্তি পরিষদে প্রায় ৭০ মিনিট দীর্ঘ ভাষণ উপস্থাপন করলেন। স্যাটালাইট ছবি আর টেলিফোনে কথোপকথন ইত্যাদি সহ এ ভাষণের প্রতিপাদ্য ছিল ইরাক। এ উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে কলিন পাওয়েল প্রমাণ করতে চাইলেন কিভাবে সাদ্দাম হোসেন জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের ফাঁকি দিয়ে শান্তি পরিষদ প্রণোদিত ইরাক নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব ১৪৪১ এর নির্লজ্জ উলঙ্ঘন করে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, স্যাটালাইটে প্রাপ্ত ছবির মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইলেন যে সাদ্দাম হোসেন কিভাবে মানব বিধ্বংসকারি রাসায়নিক অস্ত্র লুকিয়েছেন আর এ সব অস্ত্র ব্যবহারের জন্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দূরপাল্লার মিসাইল তৈরি করবার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। আড়ি পেতে শোনা ইরাকি সামরিক অফিসারদের কথোপকথনের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কলিন পাওয়েল বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সাদ্দাম হোসেন বর্তমান বিশ্ব শান্তির কতবড় হুমকি, মানব সভ্যতার ঘোরতর শত্রু। কলিন পাওয়েল তার উপস্থাপনার শেষ পর্যায়ে শেষ অস্ত্রের প্রয়োগ করতে চাইলেন সাদ্দামের সাথে বিশ্ব সন্ত্রাসের যোগাযোগ আল-কায়দার সাথে বাগদাদের ঘনিষ্ঠতা যে কথা উপস্থাপন করতে গিয়ে এ সম্মানিত প্রাক্তন সৈনিক নিজেও বিব্রতবোধ করছিলেন যা তার অভিব্যক্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সাদ্দামের প্রতিরোধের জন্য সামরিক অভিযান সিদ্ধ করবার মানসে যে বক্তব্য রেখেছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্যের একটি ছিল শান্তি পরিষদের বাকি চার স্থায়ী সদস্যদের প্রভাবিত করা এবং বিশ্বব্যাপী জনমতে পরিবর্তন আনা। পাওয়েলের ভাষণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইরাক এক পাল্টা বিবৃতিও দিয়েছে।

www.pathagar.com

কলিন পাওয়েলের বক্তব্যের বিষয় নিয়ে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে প্রচুর জল্পনা কল্পনা অব্যাহত ছিল। ধারণা করা হয়েছিল তিনি এমন কিছু অকাট্য প্রমাণ হাজির করবেন যাতে সাদ্দামের মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্রের সম্ভার মজুদ ইত্যাদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে। আরও প্রমাণিত হবে এসব মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে যে কোনো সময়ে সাদ্দাম বাহিনী শুধু ইরাকের অভ্যন্তরেই নয়; বরং ইরাকি সীমানার বাইরে খোদ ইউরোপেও আক্রমণ করতে সক্ষম হবে। কলিন পাওয়েল রাসায়নিক অস্ত্র মজুদের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তাতে তিনি উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য আর স্পেন ছাড়া আর কারও নিকট হতে তেমন মারমুখি সাড়া পান নি।

কলিন পাওয়েল তার বক্তব্য অত্যন্ত নিখুঁত সামরিক কায়দায় উপস্থাপন করলেও ইরাক যে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে তেমন কোনো প্রমাণই দিতে পারেন নি। সে সাথে আল কায়দার সাথে সাদ্দাম তথা ইরাকের সম্পর্কের ব্যাপারটিও যুক্তিযুক্তভাবে গ্রহণীয় হয় নি। পাওয়েলের অভিব্যক্তি থেকেই প্রতীয়মান ছিল যে, এ বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজেও নিশ্চিত হতে পারেন নি। যতটুকু তিনি বলেছেন তাতে কোনোভাবেই সাদ্দাম তথা ইরাক সরকারকে আল কায়দা জাতীয় সন্ত্রাসের সাথে চিহ্নিত করা যায় না। বস্তুতপক্ষে আল কায়দার মত কট্টরবাদী ইসলামি গোষ্ঠি ইরাকের সেকুলার জাতের বাথ সরকারের বিরোধিতা করে আসছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী জ্যাক স্ট্র কলিন পাওয়েলের সুরে সুর মিলিয়ে সামরিক অভিযানের পক্ষ নিলেও চীন, ফ্রান্স আর জার্মানির মত দেশগুলোর কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পাওয়া যায় নি। চীন যুদ্ধের হুমকির বদলে কূটনীতির আশ্রয়ে এ সমস্যা সমাধানের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। অন্যদিকে ফ্রান্স এসব তথ্য অস্ত্র পরিদর্শকদের মাধ্যমে তদন্ত করার পক্ষে মত রেখে আরও বলে যে, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা বাড়িয়ে আরও সময় দেয়া প্রয়োজন।

কলিন পাওয়েলের এ উপস্থাপনার উপর বিশ্বের প্রতিক্রিয়া জানতে হয়ত আরও কিছু সময় লাগতে পারে তবে এর মধ্যেই ইরাকের সীমানার বাইরে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এ মাসের ১৪ তারিখে অস্ত্র পরিদর্শকদের রিপোর্ট জাতিসংঘে উপস্থাপন করার কথা রয়েছে। আর ঐ রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে জাতিসংঘের পরবর্তী পদক্ষেপ, সামরিক অভিযানের আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কিনা তার উপর মতামত। এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রী

www.pathagar.com

জ্যাক স্ট্র সাদ্দামকে ঐ তারিখ পর্যন্তই সময় দিয়ে এক বক্তব্যও দিয়েছিলেন।

জাতিসংঘের এসব বিচার বিবেচনাকে ওয়াশিংটন সময়ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই মনে করছে না। আর কলিন পাওয়েলের উপস্থাপনা ছিল যুদ্ধ বিরোধী মার্কিন এবং যুক্তরাজ্যের জনগণের সমর্থন আদায়ের প্রয়াস মাত্র। জাতিসংঘের শান্তি পরিষদের আর তিন ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইউরোপের প্রধান দেশ ফ্রান্সের মনোভাব নিয়েই ওয়াশিংটনের একমাত্র উৎকণ্ঠা যদিও রাশিয়া ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বিরোধী।

ইতিমধ্যেই মার্কিন এবং বৃটিশ প্রশাসন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রত্যয় করে ফেলেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এখন তাঁর নিজের দেশের জনগণের সমর্থন তথা অন্যান্য ইউরোপীয়দের সমর্থন জোটাতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই ইউরোপের আটটি দেশ ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের পক্ষে রায় দিয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইটালি এবং হল্যান্ড। এ যুদ্ধের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য সাদ্দাম তথা বাথ পার্টির উৎখাত আর ইরাকে তেল সম্পদের দখল। এরই মধ্যে সাদ্দাম বিরোধী গোষ্ঠি তৎপর হয়ে উঠেছে। এ গোষ্ঠির এক প্রবক্তা সাদ্দাম উত্তর ইরাকে তেল শিল্পে আন্তর্জাতিক লগ্নির আবেদনও জানিয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলো ইরাকে তাদের পুনঃ উপস্থিতি এবং সম্ভাব্য লগ্নির প্রকল্পও হাতে নিয়েছে। এর আলামত নিউইয়র্ক আর লন্ডনের শেয়ার বাজারের সূচকের ঊর্ধ্বমুখি গতি থেকে প্রতীয়মান।

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ তথা সাদ্দামকে অপসারণ করবার প্রধান উদ্দেশ্য যে তেল সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে ফিরিয়ে দেয়া তা নিয়ে এখন বিশ্বে কোনো দ্বিমত নেই। স্মরণযোগ্য যে, ১৯৭২ এ ইরাকের বাথ সরকার সে দেশের তেল শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো থেকে তেল উত্তোলন এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি সরকারি খাতে নিয়েছিল। ঐ সময়ে এ রাষ্ট্রায়ণের দায়িত্বে ছিলেন বাথ পার্টির উদীয়মান নেতা সাদ্দাম হোসেন।

ইরাকের বিপুল তেল সম্পদই এ দেশের তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২৭-২৮ সনে ডি আর্চি নামক ভূ-তত্ত্ববিদের পরিচালনায় উত্তর ইরাকের কিরকুক নামক স্থানে তেল প্রাপ্তির পর থেকেই তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) ভাগ্যে দুর্দশা নেমে আসে। রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে ইরাকের ইতিহাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে ১৯১৬ সনে সাইক-পিটক সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তৎকালীন দুই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

শক্তি বৃটেন আর ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যে ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের (Ottoman Empire) পতনের পরের ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিল। তারপরেও ১৯২০ সনে ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতনের পর এ দুই ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে তৎকালীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সম্ভাব্য প্রাপ্ত তেলের অংশীদারিত্ব আর কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ আর তার ফরাসি প্রতিপক্ষ জর্জ ক্লেমেনস্যু'র মধ্য উত্তপ্ত বাকবিতন্ডতা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলে তৎকালীর মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের মধ্যস্থতায় এ উত্তপ্ত পরিস্থিতির অবসান হয়। অবশেষে বহু কূটনৈতিক দেন দরবারের পর ১৯২০ সনে ইতালির সমুদ্র নিকটবর্তী অবকাশের শহর সান রেমোয়ের গুপ্ত বৈঠকের মধ্য দিয়ে ফরাসি সরকার বৃটিশ সরকারকে মেসোপটেমিয়ায় প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে। ঐ চুক্তির আওতায় যুদ্ধপূর্ব জার্মানি এবং তুরস্কের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে জার্মানির অংশীদারিত্ব ফ্রান্সকে দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় ফ্রান্স সরকার সন্তুষ্ট হতে পারে নি; বরং ফ্রান্স বৃটেন কর্তৃক প্রতারিত হবার বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারে নি।

অপরদিকে বৃটিশ-ফ্রান্স এ গোপন চুক্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো কর্তৃক কুক্ষিগত করবার প্রয়াসকে যুক্তরাষ্ট্র সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। এ চুক্তিকে পুরাতন ঔপনিবেশবাদ আখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার যন্ত্রগুলো সোচ্চার হয়ে উঠে। এর সাথে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানিগুলো সরকারকে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে ক্রমাগত চাপ অব্যাহত রাখে। পর্যায়ক্রমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে বৃটেন ওয়াশিংটনকে মেসোপটেমিয়ার তেলের অংশীদার করতে রাজি হয়। এর পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম তেল কোম্পানি, তৎকালীন জার্সি স্ট্যান্ডার্ড (বর্তমানে এক্সন : Exxon) এক কনসোরসিয়াম গড়ে মেসোপটেমিয়ার তেল উত্তোলনে অংশগ্রহণ করে। এর পর থেকেই শুরু হয় মেসোপটেমিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আর যুক্তরাষ্ট্রের ঐ অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন আর প্রভাব বিস্তারের নিমিত্তে সংঘাত। ঐ সময়ে যে তেল কোম্পানিগুলো ঐ অঞ্চলে অংশীদারিত্ব ব্যবসায় রত ছিল তার মধ্যে বৃটিশ পেট্রোলিয়াম ২৩.৭৫%, রয়েল ডাচ্ শেল কোম্পানি ২৩.৭৫%, ফ্রাসোইস পেট্রোলিয়াম (ফ্রান্স) ২৩.৭৫%, যুক্তরাষ্ট্রের কনসোরসিয়াম ২৩.৭৫%।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে ওসমানিয়া সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও এদের চালিকা শক্তির পেছনে থাকে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো। মেসোপটেমিয়ার বৃহত্তর অঞ্চল নিয়ে, যার মধ্যে উত্তরে মসুল সহ কুর্দি অঞ্চল আর দক্ষিণে এককালের পারস্য সংলগ্ন আরব শিয়া মুসলমান অঞ্চলের সাথে বাগদাদ সহ মধ্যাঞ্চল একত্র করে বৃটিশ তত্ত্বাবধানে ১৯২১ সনে ফয়সাল ১- কে বাদশাহ করে মেসোপটেমিয়া হতে বর্তমানের কুয়েতকে বাদ দিয়ে ইরাকের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাগদাদে বৃটিশ বাহিনী থেকে যায় আর সে সাথে কুয়েত সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর পরের ইতিহাস ইরাকের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে রঞ্জিত করেছে। ফয়সাল-১ হতে ফয়সাল-২ এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী নুর এস সাদের হত্যার মধ্য দিয়ে কর্নেল করিম কাশেম ১৯৫৮ সনে রাজতন্ত্রের সমাপ্তির পর রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। করিম কাশেম বৃটিশ সৈনিকদের বাগদাদ থেকে বের করে তৎকালীন বাগদাদ চুক্তি বাতিল করে বৃটিশ কর্তৃত্ব খর্ব করেন। ১৯৬৩ সনে কর্নেল আরেফ, করিম কাশেমকে অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন। আব্দুস সালাম আরেফের এ অভ্যুত্থানের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ এবং বৃটেনের এমআই-৬ (MI-6) এর পরোক্ষ সমর্থনের কথা শোনা যায়। এরই তিন বছরের মাথায় এক গুপ্ত বোমা হামলায় আরেফের মৃত্যু হলে তার ভ্রাতা কর্ণেল আব্দুর রহমান বাগদাদে ক্ষমতা দখল করেন তবে তিনিও ইরাকি বাথ পার্টির অভ্যুত্থানে নিহত হলে ১৭ জুলাই ১৯৬৮ সনে জেনারেল আহমেদ হাসান আল বাকেরের রাষ্ট্রপতি পদ দখলের মধ্যদিয়ে ইরাকে বাথ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। যদিও বাথ পার্টি ১৯৬৩ সনেই ক্ষমতায় আসে তবে পার্টির অন্তরদ্বন্দ্বের কারণে ক্ষমতা সংহত করতে পারে নি।

১৯৭৯ সনে বাথ পার্টির চালিকাশক্তি বলে কথিত সাদ্দাম হোসেন বাকেরকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ইরাকের ইতিহাসে বাকেরই একমাত্র নেতা যিনি প্রতিপক্ষ দ্বারা নিহত হন নি। সাদ্দাম বাথ পার্টির অন্যতম নেতা থাকাকালীন সময়ে সিআইএ এবং এমআই-৬ সমর্থন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে ইরাকের তেল রাষ্ট্রায়াত্তকরণ, ১৯৬৭ সনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতার কারণে ঐ গুপ্ত সংগঠনগুলো সমর্থন প্রত্যাহার করে। পরবর্তী পর্যায়ে সাদ্দামের সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে নৈকট্যের কারণে পশ্চিমাশক্তি সাদ্দাম বিরোধী হয়ে উঠে। তবে সাদ্দাম ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রায় সময়েই পশ্চিমের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষি হয়েছে।

www.pathagar.com

এসব কারণেই সোভিয়েত রাশিয়াও সাদ্দামের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এরপরের ইতিহাস অত্যন্ত সাম্প্রতিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর দৃশ্যত পতন হলে এর মধ্যদিয়ে জন্ম নেয় নতুন আঙ্গিকের সাম্রাজ্যবাদ। আর এসব নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের থাবায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিশেষ করে সম্পদে সমৃদ্ধ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো। মধ্যপ্রাচ্য এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। মধ্যপ্রাচ্য আর তার সম্পদকে ঘিরেই এ নব্য সাম্রাজ্যবাদের উত্থান আর সংঘাতকে বজায় রাখার প্রয়াস। এদের প্ররোচনায় বিভিন্ন কারণে ব্যবহৃত হয় সাদ্দাম হোসেনের মত একনায়করা যেমনটা আশির দশকে ইরাককে ব্যবহার করা হয়েছিল ইরানের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে সাদ্দাম হোসেনকে বাগে রাখবার জন্য কুয়েত আক্রমণের প্ররোচনার ফাঁদে ফালানো হয়। সাদ্দামের কুয়েত দখলের পরেই এ সব সাম্রাজ্যবাদের গোপন অভিসন্ধিগুলো আরও নগ্নভাবে বেরিয়ে আসে। সেই অব্দি সাদ্দাম হয়ে উঠেন মধ্যপ্রাচ্যের অবাধ্য নেতা এবং দুষ্ট গ্রহ।

কুয়েত দখলের মধ্যদিয়ে সাদ্দাম হোসেন ইতিহাসের চাকাকে বিপরীতমুখি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নি; বরং নিজের এবং দেশের জনগণের জন্য বিপর্যয় বয়ে এনেছেন। ইরাকের এ বহুল আলোচিত নেতা আজ ব্যক্তিগতভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছেন আর সে সাথে ইরাক তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য রয়েছে বিস্ফোরণমুখি হয়ে। সাদ্দামের সময় ফুরিয়ে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উন্মুক্ত হচ্ছে নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি পুরাতনের ধ্বংসাবশেষ থেকে।

ইরাকে যুদ্ধের বাহ্যিক সূচনা না হলেও উত্তরে কুর্দি অঞ্চলে বিদ্রোহের দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তথ্যে প্রকাশ, সাদ্দাম তথা বাথ পার্টির বিরুদ্ধে তথাকথিত জনরোষের সূচনা হতে পারে। এর পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ মদদ যোগাবে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী। ইরাকের উত্তর এবং দক্ষিণে যে ধরনের সামরিক সমাবেশ আর মহড়া চলছে সে প্রেক্ষিতে একথা আনস্বীকার্য যে, ঔপনিবেশবাদের পুনঃরুত্থানের পাঁয়তারা চলছে। এ অস্থিরতার মূলে রয়েছে ইরাকের তথা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ। মধ্যপ্রাচ্যের তেলকে ঘিরে বিংশ শতাব্দীতে যে রক্তাক্ত ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে একবিংশ শতাব্দীতে। সাইক-পিটকরা দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। ইরাক ঘিরে সংঘাতের সূচনামাত্র। এসংঘাত ইরাকের সামরিক পরাজয়ের মধ্যে শেষ হবেনা বরং তেল নিয়ে সংঘাত শুরু হবে মাত্র।

প্রথম আলো ঃ ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০০৩।

www.pathagar.com

ইরাকের যুদ্ধ-মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এখন একটিই চর্চার বিষয়, তা হলো ইরাকের উপর সম্ভাব্য ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক হামলা। ইরাকের আসন্ন যুদ্ধ প্রশ্নে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে মত পার্থক্য বেড়ে চলেছে। ইউরোপ দু'বলয়ে বিভক্তির পথে। ইরাকের সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ এ বিশ্বব্যাপী যে জনসমাগম হয়েছে তা মানব ইতিহাসে এক নজির বিহীন ঘটনা। ইতিপূর্বে যুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে একই সাথে বিশ্বের ৬০০ শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হতে শোনা যায় নি। খোদ টনি ব্লেয়ারের দেশের রাজধানী লন্ডনের হাইড পার্কে জমায়েত দশ হতে পনের লক্ষ লোক তাঁকে এ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে আহবান জনিয়েছে। আহবান জানিয়েছে বুশের সামরিকায়ন পররাষ্ট্রনীতির অন্ধ সমর্থন না দেবার জন্য। ইউরোপের অন্যান্য শহর, রোম, প্যারিস, মাদ্রিদ, বার্লিনসহ অন্যান্য শহরের বৃহৎ আকারের সমাবেশগুলো থেকে প্রশ্ন তোলা হয় এ যুদ্ধের নৈতিক বৈধতা নিয়ে। এতে যোগ দিয়েছেন 'চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের' প্রধান ধর্ম যাজক সহ আরও অন্যান্য ধর্মগুরুরা। ভ্যাটিকানে পোপ জন পল-২ একই ভাবে প্রশ্ন তুলেছেন। জনরোষ আর এসব নৈতিকতার প্রশ্ন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছে। ব্লেয়ার প্রশ্নবাণের সম্মুখিন হচ্ছেন তাঁর নিজস্ব দলের সদস্যদের। এত সবের মধ্যেও টনি ব্লেয়ার মার্কিন সৈনিক সমাবেশের পাশাপাশি বৃটিশ বাহিনীর শক্তিও বাড়িয়ে চলেছেন।

বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ খ্যাত 'ডেজার্ট রেট ব্যাটালিয়ন' গুলোকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনমত উপেক্ষা করে চতুর্থ ইনফেনটি ডিভিশন সহ প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য ইরাকের উত্তর হতে দক্ষিণের সাথে যুগোপৎ আক্রমণের জন্য তুরস্কের দিকে পাঠিয়েছেন। উত্তর এবং দক্ষিণে সমর সম্ভারের বিপুলতা আর প্রস্তুতি সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য ও অন্যান্য রণসম্ভার ইরাককে ঘিরে বুশের সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছে। যুদ্ধ হবে কি হবেনা

www.pathagar.com

এ ধরনের প্রশ্ন মনে হওয়া অবান্তর। অতি সম্প্রতি ড. হেনরি কিসিঞ্জার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যুদ্ধ না করে মার্কিন সেনা ফেরৎ আনার জন্য প্রেরণ করা হয় নি। এ সামরিক প্রস্তুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের ইরাক তথা সাদ্দাম বিরোধিতা হঠাৎ করে শুরু করেন নি বরং রাষ্ট্রপতি হবার পর থেকেই ওসামা-বিন-লাদেন আর ইরাকের শাসক গোষ্ঠিকে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। আর এর পেছনে ছিলেন বুশ প্রশাসনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফিল্ড, প্রতিমন্ত্রী ওলফভিটজ, নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা কণ্ডালিজা রাইস্ আর সি আই এ প্রধান জর্জ টেনেট। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিন-লাদেন সহ ইরাক আক্রমণের জন্য প্রত্যয় ব্যক্ত করলে কলিন পাওয়েলের যুক্তি তর্কের কারণে ইরাককে ঐ সন্ত্রাসের সাথে জড়ানো সম্ভব হয় নি। কলিন পাওয়েল যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসের সাথে ইরাকের সম্পৃক্ত থাকার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া বিশ্ব জনমত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে টানা সম্ভব হবেনা। কলিন পাওয়েলের মতে অকাট্য প্রমাণ ছাড়া ইরাককে জড়িয়ে সামরিক আক্রমণ মার্কিনপন্থী আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অস্থিরতা বাড়াবে, ঐ পরিস্থিতিতে বিশ্বজনমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে চলে যাবে। সে যাত্রায় ইরাক তথা সাদ্দাম হোসেন রক্ষা পেলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে পাবে বলে মনে হয়না।

যেমনটা শুরুতেই বলেছি, ইরাকের বিরুদ্ধে হামলা অবশ্যম্ভাবী তবে যুদ্ধ পূর্ব পরিস্থিতি যেমন রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক দৃষ্টি থেকে জটিল আকার ধারণ করছে তেমনি যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। যুদ্ধোত্তর জটিল পরিস্থিতির শিকার হবে ইরাক সংলগ্ন দেশগুলো বিশেষ করে তুরস্ক আর ইরান। এখনই পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোলাটে হতে শুরু করেছে বিশেষ করে উত্তর ইরাকের কুর্দি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যুদ্ধ শুরু হলেই এ অঞ্চলে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ সূচনার আশংকা রয়েছে। গৃহযুদ্ধের আশংকা রয়েছে ইরাকের সুন্নি অধ্যুষিত বাগদাদ সহ মধ্যাঞ্চলেও। প্রায় চল্লিশ বছরের ক্ষমতাসীন বার্থ পার্টি উৎখাত প্রচুর রক্ত ক্ষরণ ছাড়া হবেনা। তা ছাড়াও ইরাকের পারমাণবিক বিজ্ঞানী হতে শুরু করে বুদ্ধিজীবি এবং নেতৃবৃন্দের অবস্থান হবে আশংকাজনক। বাগদাদ তথা সাদ্দামের পতনের পর যে পরিস্থিতি হবে তা ১৯৭৯ সনে ইরানের শাহের উৎখাতের পরের পরিস্থিতি থেকে আরও ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যুদ্ধোত্তর বাগদাদের অশান্ত

www.pathagar.com

পরিস্থিতি প্রভাবিত করবে পার্শ্ববর্তী দেশ সৌদি আরবকে। সৌদি আরবের শাসক গোষ্ঠি বাগদাদের পতনের পরবর্তী পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদি মার্কিন সামরিক শাসক আর ইরাকে সম্ভ্যাব্য গৃহযুদ্ধের সুদূর প্রসারী পরিণতি আর এতদঅঞ্চলে নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।

পরিস্থিতির অনিশ্চিয়তায় ভুগছে ইরাকের উত্তরের দেশ তুরস্ক। তুরস্ক এমন এক পরিস্থিতিতে রয়েছে যা বর্তমানে আঙ্কারার জন্য এক রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তুরস্ক সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত এবং পার্লামেন্ট দ্বারা পরিচালিত হলেও সে দেশের সংবিধানের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়া রয়েছে। বর্তমান আব্দুল্লাহ গুল সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও জনমত রয়েছে এ যুদ্ধের বিপক্ষে। অন্যদিকে তুরস্কের সামরিক বাহিনী বিশেষ করে উত্তর ইরাকে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা নিয়ে চিন্তিত। রণকৌশলের দিক থেকে পেন্টাগনের জন্য তুরস্কের ভূখণ্ড ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তুরস্কের সক্রিয় সহযোগিতা এবং ভূখণ্ডের ব্যবহার ইরাকে ত্বরিত বিজয় পাবার জন্য ওয়াশিংটনের যুদ্ধ বিশারদদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। তুরস্কের ভূ-খণ্ডের যে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ইরাকে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করবে আর পেন্টাগনের রণনীতিতে ইরাকে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ফলাফল নির্ধারণ করার বিষয়টিই প্রধান। এ কারণেই বিগত সপ্তাহগুলো ব্যাপি আঙ্কারা আর ওয়াশিংটনের মধ্যে চলেছে দরকষাকষি। এ দরকষাকষির মধ্যে বিপুল পরিমাণের অর্থ অনুদানের বিষয়টি প্রচার পেলেও অন্তরনিহিত রয়েছে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে ইরাকের কুর্দি অঞ্চলের ভবিষ্যৎ কাঠামো। এ বিষয়টি শুধু রাজনৈতিকই নয়, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বিষয়ও। তাই তুরস্কের সামরিক বাহিনী সরকারকে এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট হতে বলছে। তুরস্ক সরকার ওয়াশিংটনের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে অনুরোধ জানালেও এর স্পষ্ট জবাব আঙ্কারা এখনও পায় নি। বিশেষজ্ঞদের মতে পেন্টাগন যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে আগ্রহী নয়।

কুর্দি অঞ্চল নিয়ে বিবাদ এতদঅঞ্চলে রাজনৈতিক, সামরিক বিলুপ্তির পর থেকেই। ষোড়শ শতাব্দীতে কুর্দি আইয়ুবাইড সাম্রাজ্যের পতন আর বৃহৎ কুর্দি অঞ্চল শিয়াপন্থী সাফাভিদ (Safavid) এবং ওসমানিয়া (Ottoman) সাম্রাজ্যের বিভাজনের পর থেকেই শাসকগোষ্ঠিদের বিরুদ্ধে কুর্দি অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য

www.pathagar.com

বিদ্রোহ চলে আসছে যা আজও অব্যাহত। ইতিহাস বিখ্যাত কুর্দি নেতা সালাউদ্দিন আইয়ুবীর ক্রুসেডারদের হাত থেকে জেরুজালেম, দামেস্ক এবং সমগ্র আরব ভূমি জয় এবং আইয়ুবীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পর থেকেই কুর্দিরা এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ওসমানিয়া এবং পারস্যের সাফাভিডদের হাতে পরাজিত হবার পর থেকেই কুর্দি অঞ্চলের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। সেই হতে কুর্দিদের একাংশ ইরানের অধীনে রয়ে গেছে এবং আরও কিছু অংশ আরমেনিয়ানদের হাতে চলে যায়। ওসমানীয় কুর্দি অঞ্চল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তৎকালীন মেসোপটেমিয়া (বর্তমানের ইরাক) তুরস্ক আর সিরিয়ার মধ্য তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটিশ আর ফরাসি চুক্তির আওতায় বিভাজিত হয়। ইরাকের কুর্দি অঞ্চল মসুল আর কিরকুকে রয়েছে ইরাকের বৃহৎ তেলক্ষেত্রগুলো। কিরকুকেই ১৯২৮ সনে প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরও পরে বৃটিশবাহিনী বাগদাদ ছাড়লেও কুর্দিদের বিদ্রোহ প্রশমিত হয় নি। বিদ্রোহ আরও প্রসারিত হয় তুরস্ক, সিরিয়া আর ইরাক সরকারের বিরুদ্ধে।

নব্বইয়ের দশকে, বিশেষ করে উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে পরেই তুরস্কের কুর্দি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও সক্রিয় হয়। স্মরণযোগ্য যে, ঐ যুদ্ধের পর থেকে ইরাকের উত্তর অঞ্চল বাগদাদের আওতার বাইরে চলে যায়। প্রতিষ্ঠিত করা হয় উত্তরের নো ফ্লাই জোন। এ অঞ্চলের সীমা প্রহরারত রয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বাহিনী। প্রায় একদশক ধরে তুরস্কের সামরিক বাহিনী কুর্দিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে আজ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার কুর্দি নিহত হয়। ঐ অঞ্চলের কুর্দি নেতা আব্দুল্লাহ্ ওরচালান এখন তুরস্কের জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বর্তমানে ইরাকের উত্তরাঞ্চল সহ তুরস্কের কুর্দি অঞ্চলে সামরিক বাহিনী কুর্দি বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইরাকে যুদ্ধের জন্য যেমন তুরস্কের প্রয়োজন তেমনি উত্তরাঞ্চলের তেল ক্ষেত্রসহ কুর্দি সমর্থনও। বিরোধটা এখানেই। ইরাকি কুর্দি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন 'প্যাট্রিওটিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তান' (PUK) এতদঅঞ্চলে তুরস্কের উপস্থিতির ঘোরতর বিরোধী। এ বিরোধের কারণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। এ সংগঠনের নেতা তালেবানি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, কোনোভাবে তুরস্কের উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমঝোতায় তুরস্ক চাইছে কোনোভাবেই ইরাককে ভাগ করে কুর্দিদের অধিক স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতা গ্রহণযোগ্য হবে না। তুরস্কের সবচেয়ে

www.pathagar.com

উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল সাদ্দাম উত্তর ইরাকের শাসনব্যবস্থা আর সে ব্যবস্থায় কুর্দিদের অবস্থান। বাগদাদের যে কোনো নতুন সরকারকে অস্থিরতা কাটাতে যে সময় প্রয়োজন হবে তাতে কুর্দিস্তানের পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হবে। ঐ অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ তথা ব্যাপক বিদ্রোহ দমন করতে যুক্তরাষ্ট্র অথবা বৃটেন আগ্রহী হবে না। এ দুই শক্তিই চাইবে না গৃহযুদ্ধ আর পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে। আর এ কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হলে উত্তর ইরাকে কুর্দি অঞ্চল মসুল আর কিরকুক সহ তেল ক্ষেত্রগুলো তুরস্কের হাতে তুলে দিতে। তুরস্কের দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক উপস্থিতিতে সমগ্র কুর্দি অঞ্চলের পরিস্থিতি কি পরিমাণ জটিল হতে পারে তুরস্ক সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেও মধ্যবর্তী অবস্থান নিতে পারছে না। ওয়াশিংটনের চাপের মুখে রয়েছে তুরস্ক। ওয়াশিংটন আঙ্কারাকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে তুরস্ক সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা না করলে বহুদিনের মিত্রতায় ফাটল ধরবে। ইসলামপন্থী বলে পরিচিত ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের বর্তমান আব্দুল্লাহ গুল সরকার এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখিন। নির্ভরযোগ্য তথ্যে প্রকাশ যে, উত্তর ইরাকে ইসরায়েলি তথা মার্কিন স্পেশাল ফোর্স সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় মাত্র।

ইরাকের পূর্বদিকের প্রতিবেশী দেশ ইরানও তার নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত। ইরানের কুর্দি অঞ্চল নিয়েও তেহরান চিন্তিত। এতদিন সাদ্দাম বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে কুর্দিরা তেহরানের জন্য তেমন সংকট সৃষ্টি করে নি। তবে সাদ্দাম উত্তর পরিস্থিতিতে কি হতে পারে তা অনিশ্চিত। এসব কারণ সম্ভাব্য অস্থিরতা এবং ইরান সন্নিকটে মার্কিন উপস্থিতি ইরানকে ভাবিয়ে তুলছে। উল্লেখ্য যে, 'অশুভ অক্ষ' (Exis of Evil) এর তৃতীয় সদস্য দেশ ইরান। প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, ইরানের কুর্দি সীমান্ত সংলগ্ন ইরাকি কুর্দি অঞ্চলে প্রায় পাঁচ হাজার ইরানি রিপাবলিকান গার্ড অবস্থান নিয়েছে। এদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। ইরানের এ উপস্থিতি পেন্টাগনকে ভাবিয়ে তুলছে।

ইরাকে হামলা বাগদাদের পতন আর পরবর্তী বেশকিছু বছর মার্কিন সামরিক শাসন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে বিস্ফোরণমুখি করে তুলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নতুন করে পুরাতন ঔপনিবেশবাদের বলি হতে হবে ঐ অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকদের। ইরাকে বাথ সরকার থাকবে কি উৎখাত হবে সেটি মুখ্য নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে এ যুদ্ধের নৈতিকতা নিয়ে। ব্লেয়ার ইদানিং WMD

www.pathagar.com

(Weapons of Mass Destruction) এর ধুয়ো বাদ দিয়ে যুদ্ধের নৈতিকতার যুক্তি তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। তিনি সাদ্দামের অত্যাচার থেকে ইরাকিদের মুক্তির কথা বলেছেন, বলেছেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা। ব্লেয়ারের সাথে নৈতিকতার কথা পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ফলাও করে বলছেন। ব্লেয়ার রোমে পোপের সাথে ইরাক নিয়ে আলোচনা করেছেন নৈতিকতার প্রশ্ন উঠার পর হতেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই সাদ্দাম নিষ্ঠুর হস্তে শাসন করছেন কিন্তু বিগত ১২ বছর ইঙ্গ-মার্কিন চাপে পড়ে অর্থনৈতিক অবরোধে ইরাকের জনগণ কি পরিস্থিতিতে রয়েছে সে কথা ব্লেয়ার একবারও বলেন নি।

বর্তমানে লন্ডন আর ওয়াশিংটনে যুদ্ধবিরোধী আর সচেতন নাগরিকদের মধ্যে যত উৎকণ্ঠাই থাকুক না কেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের 'বুশ তত্ত্ব' ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দেবার প্রয়াসে রত। এ তত্ত্ব নব্য সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিচ্ছে আর এতে পুরাতনরা নতুন ইতিহাস রচনা করবার প্রয়াসে রত। এখানে মানবতা আর নৈতিকতার প্রশ্ন অবান্তর। মধ্যপ্রাচ্যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির যে সূচনা হতে যাচ্ছে তাতে এ অঞ্চলের তথা তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলোর ললাটে কি লেখা হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রদর্শন ইরাকের একনায়ক সাদ্দামকে সমর্থন করা নয়, এ যুদ্ধের বিরোধিতা নৈতিকতার প্রশ্ন, প্রশ্ন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মর্যাদা বজায় রাখার, প্রশ্ন মানবতার, আর তাই আমাদের বিরোধ।

সংবাদ ঃ মার্চ ২০০৩ এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

সাদ্দাম বনাম দুই বুশ

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ তম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াকার বুশ, ৪১ তম রাষ্ট্রপতি জর্জ হাবার্ড বুশের পুত্র, হঠাৎ করেই সাদ্দাম বিরোধী হয়ে উঠেন নি। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ ঘটনার জন্মদানকারী নির্বাচনে বুশের জয় লাভের পর থেকেই বুশ ইরাক থেকে সাদ্দাম হটাও পরিকল্পনা নিয়ে মত্ত ছিলেন। ২০০০ সনে নির্বাচিত হবার পূর্বে তাঁর মনোনীত জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার হবু প্রধান মিস্ কমডালিজা রাইসের সাথে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ইরাক তার এক অন্যতম বিষয়। বুশ তখন মিস্ রাইসকে বলেছিলেন, যারা ১৯৯১ সনে ডেজার্ট স্টম এর সময় ইরাকের পক্ষ করছেন তিনি ঐ সব নিন্দুকদের সাথে একমত নন। ঐ সময়ে বুশের (বড়) উপদেষ্টারা জাতিসংঘের অনুমোদনের মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন যার মধ্যে তৎকালীন জয়েন্ট চিফ বর্তমানের সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েলও ছিলেন। তখন বলা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদে প্রবেশ করলে প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক আইনের উলঙ্ঘন হতো এবং পিছু হটা ইরাকি সামরিক বাহিনীর প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হতো। দ্বিতীয়তঃ এসব উপদেষ্টাদের মতে, ঐ সময়ে বাগদাদে প্রবেশ করলে হয়ত এর প্রতিক্রিয়া হতো বিপরীত বিশেষ করে আরব বিশ্বে। তবে তৎকালীন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা বলেছিলেন সাদ্দাম বাহিনীর এ লজ্জাজনক পরাজয়ের পর বাগদাদে সাদ্দামের শাসনের বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়তে পারে যার প্রেক্ষিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানও হয়ে যেতে পারে। বস্তুত তেমনটা হয় নি; বরং এর পরেও সাদ্দাম হোসেন বার বছর ক্ষমতায় থেকে গিয়েছেন। যদিও এর মধ্য উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে সাদ্দামের প্রভাব অনেকটা কমে এসেছে। এ সময়ে (মার্চ ২০০৩) উত্তরে কুর্দি এলাকায় এবং দক্ষিণে শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল সাদ্দাম বিরোধী তৎপরতা ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক উপস্থিতির কারেণে আরও তীব্রতর হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ।

www.pathagar.com

সাদ্দাম সে যাত্রায় পরিত্রাণ পেলেও বুশ (বড়) দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতি হতে পারেন নি। ১৯৯৮ সনে সাদ্দাম গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের বের করে দেন যদিও ঐ সময়ের মধ্যে বাগদাদের রাসায়নিক অস্ত্র ভান্ডার সহ বহু কারখানা ধ্বংস এবং বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৯৮ সনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন অপারেশন ডেজার্ট পকু নামে এক অভিযানে ৬৫০টি বোম্বার ব্যবহার করে ইরাকে বহু সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করেন।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সনে সন্ত্রাসী হামলার পরে পরেই আল কায়দার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে আফগানিস্তানের সাথে ইরাকে হামলার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে বুশকে কলিন পাওয়েল যুক্তি তর্ক দিয়ে নিবৃত করেন। কলিন পাওয়েল ইরাকের সাথে আল কায়দার সম্পর্কের সন্দেহাতীত কোনো প্রমাণ হাতে না থাকায় বিশ্ব জনমতের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে বুশকে পরামর্শ দিয়ে সে যাত্রা ইরাকের উপর হামলা স্থগিত করান। এর পরে জানুয়ারি ২৯, ২০০২ সনে স্টেট অব দি ইউনিয়ন ভাষণে বুশ উত্তর কোরিয়া, ইরান সহ ইরাককে এক্সিস অব ইভিল (Exis of Evil) বা দুষ্টচক্র হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের স্পষ্ট আভাস দেন। ঐ ভাষণে বুশ বলেছিলেন 'আমি ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় থাকব না'। তাঁর ঐ উক্তির মধ্যদিয়ে সূচিত হয়েছিল বুশ তত্ত্ব যার মূলমন্ত্র হলো আগবাড়িয়ে হামলা (Preemaptive strike)।

সাদ্দামের বিরুদ্ধে জর্জ বুশের প্রথম পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সি আই এ'র গোপন তৎপরতা বাড়াবার আদেশে দস্তখত করেন। এ আদেশ বলে সি আই এ-কে সাদ্দাম অপসারণের ক্ষমতা দেয়া হয়। এ কাজের জন্য সি আই এ'র গোপন তৎপরতার বাজেট ১০০ মিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করেন।[১] সে সাথে সাদ্দাম বিরোধী ইরাকিদের তৎপরতায় সহায়তা আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। এসবের প্রেক্ষিতে সি আই এ'র পরিচালক বুশকে বলেন, ইরাক আর আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এক নয়। ইরাকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত দুর্বল এবং দেশত্যাগী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ইরাকের অভ্যন্তরে তেমন জনপ্রিয়তাও নেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে গোপন অভিযানের সফলতার মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ সম্ভাবনার আশা করা যায় মাত্র। এত সবের প্রেক্ষিতে ইরাকের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত আর আমেরিকানদের সাদ্দাম বিরোধে সমর্থন জোটাবার জন্য এপ্রিল ২০০২ থেকে বুশ প্রকাশ্যে বাগদাদে

১। Bob Woodward : 'Bush at war' Simon & Sehuster, New York, USA.

www.pathagar.com

সাদ্দামকে উৎখাত করে পট পরিবর্তনের (Regime Change) কথা সর্বত্র বলতে থাকেন। সূত্রে প্রকাশ, সাদ্দাম বিরোধী তৎপরতায় গতি সঞ্চারের পেছনের চালিকাশক্তি হচ্ছে বুশের কট্টরপন্থী উপদেষ্টা বলে পরিচিত কন্ডালিজা রাইস্, রোনাল্ড রামসফিল্ড, উলফোভিটস, কার্ড এবং অন্যরা। জর্জ বুশ তাঁর 'আগবাড়িয়ে হামলা' নীতি প্রণয়নের পর তাঁর এ তত্ত্ব ইরাকের উপর প্রয়োগ করেছেন। যদিও এ তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন তবে এ তত্ত্ব যে শুধুমাত্র ইরাকেই থেমে থাকবে তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। অনেকেই মনে করেন ইরাকের পর পরিবর্তনের হুমকি আসবে সিরিয়া আর ইরানের উপর প্রত্যক্ষভাবে আর পাকিস্তানের উপর পরোক্ষভাবে।

বাগদাদ দখল করা হয়তো সহজ হয়েছে কিন্তু এ দখলে বিশ্বের কতটুকু ক্ষতি বা লাভ হবে তা প্রতীয়মান হতে হয়তো আরও সময় লাগবে। সাদ্দামের যে পরিণতি তার জন্য তাঁকে দায়ী করা যেতে পারে। সাদ্দাম নিজের আসন পাকাপোক্ত করতে গিয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর হাতে দাবার গুঁটির কাজ করে নিজের তথা ইরাকের মত প্রগতিশীল এবং বিত্তবান দেশকে বিধ্বস্ত করেছেন। ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন হাজার হাজার বছরের ব্যাবিলন আর মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা সে সাথে ১২০০ বছরের বাগদাদের ইসলামিক ঐতিহ্য। কে এই সাদ্দাম হোসেন? জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়।

এপ্রিল ২৮, ১৯৩৭ সনে বাগদাদ থেকে ১০০ মাইল উত্তরে আল তিকরিতি নামক ছোট এক শহরে এক কৃষক পরিবারে সাদ্দাম হোসেনের জন্ম। ঐ সময়ে ইরাকের অর্থনৈতিক অবস্থার চেহারা আজকের মত ছিল না। সাদ্দাম হোসেন তারই শহরের হাসান আল বাকের পরে জেনারেল এবং বাথ পার্টির প্রধান এর সাথে যোগ দেন। অনেকটা নাসেরের আরব সোসালিস্ট দ্বারা প্রভাবিত বাথ পার্টি ১৯৫৯ সনে ইরাকের প্রথম সামরিক শাসক করিম আব্দুল কাশেমের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। ঐ অভ্যুত্থান প্রতিহত হলে তৎকালীন তরুণ সাদ্দাম হোসেন গুরুতরভাবে আহত হয়ে প্রথমে সিরিয়া পরে মিশরে আশ্রয় নেন। মিশরে অবস্থানকালে ১৯৬২-৬৩ এর মধ্যে কায়রোর ল'কলেজে অধ্যায়ন শুরু করলেও শেষ করতে পারেন নি। পরে ১৯৬৩ সনে ইরাকে বাথ পার্টি ক্ষমতা দখলের পর বাগদাদ ল কলেজে অধ্যায়ন অব্যাহত রাখেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৩ সনে বাথ পার্টির অভ্যুত্থানে সাদ্দামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে অতি দ্রুত পার্টির উচ্চ পর্যায়ে আসীন হন। ১৯৬৮ সনে বাথ পার্টির মধ্যেই পুনরায় অভ্যুত্থান হলে

www.pathagar.com

অবশেষে হাসান আল বাকেরকে ক্ষমতায় আনা হয়। সাদ্দাম তখন হাসান আল বাকেরের নেতৃত্বে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। হাসান আল বাকের তথা বাথ পার্টির পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭২ সনে ইরাকের তেল সম্পদকে জাতীয়করণ করা হয়। এ জাতীয়করণের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন সাদ্দাম হোসেন।

১৯৭৯ সনে বাকেরকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে সাদ্দাম হোসেন একাধারে রেভ্যুলিউশনারি কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেন। মিশরের প্রয়াত নেতা গামাল আব্দুল নাসেরের গুণগ্রাহী সাদ্দাম ইরাককে আরব সোসালিস্ট এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। যদিও সাদ্দামের শাসন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক তথাপি অনস্বীকার্য যে, তাঁর বাথ পার্টির শাসনকালে ইরাকের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরাকিরা এদিক থেকে অনেক অগ্রগামী।

সাদ্দামের দুই যুগ শাসনামলে প্রায় আটবছর ইরানের সাথে যুদ্ধ, ১৯৯১ সনে গালফ ওয়ার এবং পরবর্তী এক যুগ জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অতিবাহিত হবার কারণে ইরাকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.৭ শতাংশে নেমে আসে। ইরাকের তেল উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসে দিন প্রতি ৩ মিলিয়ন ব্যারেলে ঠেকে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্যালেস্টিনিয়ানদের সংগ্রামের অকুণ্ঠ সমর্থনকারী হিসেবে পরিচিত সাদ্দাম হোসেন ১৯৬৭ সনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইরাকি বাহিনীর সাথে সক্রিয় থেকে ছিলেন। ঐ যুদ্ধের পরিণতিতেই বাথ পার্টির আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দান করেন। ইরাকের যুদ্ধকে সাদ্দাম তাঁর ভাষায় শেষ যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশ্বজুড়ে সাদ্দাম বহু কারণে নিন্দিত এবং সাদ্দাম বিরোধীদের কাছে এক উৎপীড়ক একনায়ক হলেও সাদ্দাম আরব বিশ্বের একমাত্র নেতা যিনি প্রবল শক্তির সম্মুখীন হতে পেরেছিলেন। ইরাক এখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দখলে। বাগদাদে এখন বিজাতীয় শাসনব্যবস্থা এর ভবিষ্যৎ অনির্ধারিত। সাদ্দামের উত্থান হয়েছে প্রচুর রক্তক্ষরণের মধ্যদিয়ে আর সমাপ্তিও হয়েছে রক্তক্ষরণের মধ্যদিয়ে। সাদ্দাম নেই তবে ইরাক নামক একটি দেশ রয়েছে। এখন বিজাতীয় সৈনিক শাসকের তত্ত্বাবধানে এ যুদ্ধই কি ইরাকের মাটিতে বা আরব বিশ্বে শেষ যুদ্ধ, না শুরু মাত্র তা নিশ্চিত করে বলবার সময় এখনও আসে নি।

প্রথম আলো ঃ মার্চ ২০০৩।

www.pathagar.com

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বুশের ভাষণ

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন সূচিত যুদ্ধ হবে কি হবে না এ নিয়ে অনেকের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে দুটি লেখায় আমি বলেছিলাম, যুদ্ধ হবে কি হবে না সেটি প্রধান বিষয় নয়। এ যুদ্ধ কত তাড়াতাড়ি এবং কবে শুরু হবে সেটাই প্রধান বিষয়। এ সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ গত মার্চ ১৭, ২০০৩ বাংলাদেশ সময় সকাল ৮ টায় আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বকে তাঁর প্রত্যয় জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পনের মিনিটের এ ভাষণ ছিল ইরাক তথা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে রাষ্ট্রপতির এ ঘোষণাকে বিশ্ব যে চোখেই দেখুক না কেন ইরাকে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ঔপনিবেশ। বাগদাদ থাকবে ঔপনিবেশিক শক্তির দখলে। বাগদাদ কতদিন ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শাসনের আওতায় থাকবে তা খোদ পেন্টাগনও বলতে রাজি নয়।

রাষ্ট্রপতি বুশের ভাষণের কয়েকটি দিক কিছু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তিনি সাদ্দামকে ৪৮ ঘন্টার (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সকাল ৮ টা) মধ্যে তাঁর দুই পুত্র এবং সিনিয়র বাথ নেতৃবৃন্দ সহ বাগদাদ ত্যাগ করতে বলেছেন। আর এ সময়ের মধ্যে তাঁর এ আদেশ পালিত না হলে ইরাকে হামলা হবে। এ হামলা হবে প্রথম ৪৮ ঘন্টায় ২৫০০/৩০০০ প্রিসিসন গাইডেড ক্রুজ মিসাইল ক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। সাদ্দাম বাগদাদ ছেড়ে গেলে যুদ্ধের সূচনার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু তিনি বলেন নি যে, সাদ্দাম স্বেচ্ছায় বাগদাদ ছেড়ে কোথায় যাবেন বা বাগদাদ ছাড়লে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা। তাঁর এ আল্টিমেটাম থেকে যে বিষয়গুলো পরিষ্কার তার প্রথমটি হলো প্রথম থেকেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ইরাকে সাদ্দাম তথা বাথ পার্টি উৎখাত করাকেই প্রথম লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গত এক বছর ইরাকের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে প্রয়াস নিয়েছিলেন যার মধ্যে

www.pathagar.com

একটি ছিল ইরাককে জাতিসংঘের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণকে ব্যর্থ আখ্যা দিয়ে বল প্রয়োগ করা। কিন্তু এ পরিকল্পনায় বাধ সাধল একাধারে অস্ত্র পরিদর্শকদের ইতিবাচক রিপোর্ট অন্যদিকে বল প্রয়োগ প্রশ্নে বিভক্ত ন্যাটো জোট তথা চীন ও রাশিয়া। বিশ্ব জনমতও জর্জ বুশের জাতিসংঘকে ব্যবহার করবার পরিকল্পনায় বাধ সাধে। আর এ কারণেই জাতিসংঘের মাধ্যম ছাড়াই ইরাকে সাদ্দাম হটাও অভিযান, এখানে এখন নিরস্ত্রীকরণ কোনো বিষয় নয়। সাদ্দামকে আল্টিমেটাম দেবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, সাদ্দাম স্বেচ্ছায় বাগদাদ ছাড়লে অথবা এ সময়ের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটলে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদে প্রবেশ করবে আর তাতে মার্কিন বাহিনীর ক্ষয় -ক্ষতি হয়তো মোটেও হবে না। বুশ তাঁর ভাষণে আল্টিমেটাম ছাড়াও আরও কয়েককটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন যা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তিনি ইরাকি বাহিনীর উদ্দেশে সাদ্দাম হোসেন নিয়োজিত কমান্ডারদের হুকুম তামিল না করতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, নিজস্ব জাতীয় প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ' এনে বিচার করা হবে। নিজের দেশের প্রতিরক্ষা বা বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করবার প্রয়াস যুদ্ধাপরাধ হলে তৃতীয় বিশ্বের সামরিক বাহিনীগুলোর উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে হবে। তিনি অবশ্য বলেছেন, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করলে তার পরিণাম হবে মারাত্মক। সাথে আরও বলেছেন যে, মৃত্যুমুখে পতিত সরকারের সমর্থনে যুদ্ধে আত্মাহুতি দেবার কোনো ফায়দা নেই। এ ধরনের আহ্বান শুধু নীতি বিবর্জিতই নয় বরং ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিতও করবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইরাকের বাথ কর্মকর্তা তথা সামরিক বাহিনীর প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আরও বলেন যে, যুদ্ধ শুরু হলে ইরাক কর্তৃক তেল ক্ষেত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় অথবা ক্ষতিসাধন করবার কোনো প্রয়াসকে যুক্তরাষ্ট্র সহ্য করবে না। তিনি বিশ্বকে তথা ইরাকিদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তেল সম্পদ ইরাকি জনগণের, তাই এর মালিকানার দাবিদার তারাই। তেল ক্ষেত্রগুলোকে অক্ষত অবস্থায় দখল করা যে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর প্রধান লক্ষ্যের একটি তা এখন আর অন্তর্নিহিত নয়। বুশের এ হুঁশিয়ারির সাথে সাথেই বিশ্বে তেলের বাজার দর নিম্নমুখি হয়। ইরাকের তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা তিনি তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যুদ্ধের পরবর্তী প্রস্তুতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের পুনর্গঠন তথা তেল ক্ষেত্র সংস্করণ ও সম্প্রসারণের জন্য ইতিমধ্যে পাঁচটি বৃহৎ

www.pathagar.com

কোম্পানিকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করেছেন। পাঁচটির মধ্যে প্রধান কোম্পানি হচ্ছে 'হেলিবার্টন' যার একসময়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি ডিক চেনী। এ পুনর্গঠন এবং সংস্কারের জন্য প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অর্থ আপাতত আসবে যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল থেকে। বলা বাহুল্য যে, পরবর্তী এর অধিক অর্থের যোগান হবে ইরাকের তেল বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে।

তিনি তাঁর বক্তব্যে ইরাকের জনগণের উদ্দেশে বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং জনগণকে প্রয়োজনীয় খাবার এবং ঔষধের প্রবিধান করবে।

বুশের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সোজা এবং সহজ যার মাধ্যমে তাঁর ইরাক তথা সাদ্দাম বিরোধের বহুদিনের লালিত ইচ্ছাকে বাহ্যিক রূপ দেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। রাষ্ট্রপতি বুশ প্রথম থেকেই এককভাবে এ হামলার দৃঢ় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। যে সময়টুকু তিনি নিয়েছেন তা প্রয়োজনীয় ছিল সামরিক প্রস্তুতির জন্য। এখানে বিশ্ব জনমত বা জাতিসংঘের ভূমিকা কখনই মুখ্য ছিলনা। সামরিক প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে বলেই তিনি বলেছেন যুদ্ধ হবে তাঁর নির্ধারিত সময়ে। এ সময়টুকু প্রয়োজন তুরস্কের উত্তর জলসীমায় অবস্থানরত প্রায় ৬০,০০০ সামরিক সদস্য এবং একটি বিমানবাহী রণতরির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা পর্যন্ত। যুদ্ধ প্রস্তুতির এ পর্যায়ে তুরস্কের অনুমোদনের সমস্যা এখনও মেটে নি। তুরস্কের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী তায়েপ রিদওয়ানের সময়ের প্রয়োজন সংসদে আস্থা ভোটগ্রহণ এবং সংসদ কর্তৃক মার্কিন বাহিনীকে তুরস্ক ভূ-খণ্ডের মধ্যদিয়ে উত্তর হতে দক্ষিণের সাথে একযোগে হামলা পরিচালনা করবার জন্য অনুমোদন প্রদানের। এ সমস্যা সমাধানের মধ্যই নিহিত রয়েছে যুদ্ধ সমাপ্তি তথা বাগদাদ দখলের সময়সীমা। অন্যদিকে উত্তরে কুর্দিদের অবস্থান নিয়েও পেন্টাগন অনিশ্চয়তায় ভুগছে। উত্তরের তেলক্ষেত্র কিরকুক আর মসুলের ভবিষ্যৎ নিয়েও রয়েছে সংশয়। কাজেই উত্তরে মার্কিন উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের প্রেক্ষিতে এ যুদ্ধে তুরস্কের অবস্থান নির্ধারণ গুরুত্ব বহন করে। তুরস্ক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলে তার বিপরীতে ইরাকের কুর্দি অঞ্চলে আঙ্কারার উপস্থিতি দাবি করবে আর তা হবে ওয়াশিংটনের জন্য উদ্বেগের বিষয়। ইরাকি কুর্দি নেতারা, বিশেষ করে তালেবানি এবং বারজানি, উভয়েই তুরস্কের উপস্থিতির সম্ভাবনা এবং এর নেতিবাচক পরিণতির কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। কাজেই ওয়াশিংটনকে তুরস্কের পথ প্রত্যাহার করতে হলে বিমানবহর ব্যবহার করে উত্তর ইরাকে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে হবে। এ কারণে ৪র্থ ইনফেনটি ডিভিশনকে ঐ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মূল পরিকল্পনা কার্যকর হবার ক্ষীণ সম্ভাবনা আর বিমানের ব্যবহারে সৈন্য সমাবেশের জন্য আরও কয়েকদিনের প্রয়োজন রয়েছে পেন্টাগনের সমর বিশারদদের। এ কারণেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ইরাকে আক্রমণ করতে হলে তা হবে ওয়াশিংটনের নির্ধারিত সময়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাগদাদ দখল এখন আর জল্পনার কল্পনার বিষয় নয়–অবশ্যম্ভাবী। তবে বাগদাদ তথা ইরাক দখল কোন উপায়ে হবে তাই এখন দেখবার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সাদ্দাম বাগদাদ ত্যাগ করলে এ দখল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হবে সহজতর অন্যথায় ত্বরিত বিজয় অর্জন সক্ষম হলেও এ সংঘাতের ভবিষ্যৎ পরিণাম নিয়ে শংকিত তাবদ বিশ্ব।

উপরে আলোচিত যে কোনো উপায়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ তথা ইরাক দখল এবং পরবর্তী প্রশাসন নিয়োজিত করুকনা কেন জর্জ বুশ যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ নতুন মাত্রায় নৈতিকতা, মানবতা, জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ ভূমিকা এবং ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান সবই অবান্তর। একক শক্তির বিশ্ব এখন প্রবল শক্তিধর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমষ্টির সন্মুখে নিরুপায়। একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারবে বিশ্ব কোন পথে ধাবিত হচ্ছে আর তাই জর্জ বুশের ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা শুধু ইরাকের জন্যই নয় বিশ্বের তথাকথিত অনেক সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে থাকবে।

দৈনিক প্রথম আলো ঃ মার্চ ২০০৩।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক নিরিখে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ ও ইরাকের প্রতিরোধ

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রায় তিন সপ্তাহ গড়িয়েছে (এ লেখা পর্যন্তঃ ০৫/০৪/২০০৩)। বৃটিশ বাহিনীর প্রথম আর্মার ডিভিশন ইরাকের দক্ষিণে বসরা-উম্মে কসর অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা চালালেও ঐ বাহিনীর বিমান এবং রণতরিও বাগদাদে নিয়ত বোমা বর্ষণে রত। অন্যদিকে মার্কিন বাহিনীর তৃতীয় পদাতিক (মেকানাইজড) ১০১ এয়ারফোর্স ডিভিশনের সাথে নজফ কারবালার ফাঁক দিয়ে ইরাকের রাজধানীর বিশ কিলোমিটার দূরে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত এগিয়ে বিমান বন্দর দখলের মধ্য দিয়ে বাগদাদে যুদ্ধের সূচনা করেছে। আরও দক্ষিণ পূর্বে ১ম মেরিন এক্সপিডিশন ফোর্স ৮২ এয়ারবোর্ন ডিভিশন নিয়ে নাসিরিয়া কুয়েত হয়ে বাগদাদের দক্ষিণ পূর্বের পথ অবরোধ করে ফেলেছে। বাগদাদের যুদ্ধের সূচনা হয়েছে তবে তা সর্বাত্মক রূপ ধারণ করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে অন্তত মার্কিন বাহিনীর ৪র্থ ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের রণাঙ্গনে আক্রমণ পর্যন্ত। অবস্থার প্রেক্ষিতে মার্কিন বাহিনীর বিশাল সরবরাহ রাস্তার সম্পূর্ণ পথে প্রয়োজন হবে সামরিক উপস্থিতি বিশেষ করে জনপদগুলোতে। পাহাড়া দিতে হবে সামরিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও পুলগুলোকে। তার উপরে রয়েছে ক্রমবর্ধমান গেরিলা এবং আত্মঘাতী হামলা। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আরও বিশাল আকারের সামরিক উপস্থিতি। এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বিশেষ করে উচ্চ কারিগরি যন্ত্রপাতি নির্ভরশীল মার্কিন বাহিনী। বিগত শতাব্দীগুলোর সামরিক ইতিহাসে এ অঞ্চলে তথা তৎকালীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে মার্কিন সামরিক অভিযান এই প্রথম, কাজেই তৎকালীন মেসোপটেমিয়া বা বর্তমান ইরাকের সামরিক ইতিহাস, এতদঅঞ্চলের জনগণের শতাব্দীর পর শতাব্দী বিস্তৃত সামরিক বীরগাঁথা, উত্থান-পতন সম্বন্ধে মার্কিন সাধারণ সৈনিকরা কতখানি পরিচিত তা নিয়ে আমার মত অনেকেরই যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

www.pathagar.com

যদিও বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণ অঞ্চলেই রয়ে গেছে তথাপি বলতে হয় যে, সমসাময়িক ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে এতদঅঞ্চলের আবহাওয়া এবং সামরিক ইতিহাসের সাথে পরিচিত। এ বাহিনী বসরাকে ঘিরে রয়েছে ঐ শহরের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটানোর মধ্য দিয়ে স্বল্প ক্ষয়-ক্ষতিতে এ ঐতিহাসিক শহর বসরা দখলের জন্য। আরব্য রজনীর সিন্দাবাদ জাহাজির এ শহরের গোড়াপত্তনই হয়েছিল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর সেনাছাউনি হিসেবে। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে ৬৫৬ সনে হযরত মা আয়েশা (রাঃ) এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর মধ্যে প্রথম যুদ্ধও এখানে হয়। এ যুদ্ধ ইসলামিক সামরিক ইতিহাসে 'উটের যুদ্ধ' (battle of the camel) হিসেবে উল্লেখিত। এর পরের ইতিহাস এ শহর ঘিরে বিভিন্ন শতাব্দীর সামরিক অভিযান আর যুদ্ধের ইতিহাস। আরও পরে ১৭ এবং ১৮ শতাব্দীতে প্রায় তিনশত বছরের মত ছিল ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর হিসেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৎকালীন বৃটিশ ভারত বাহিনী প্রথম পর্যায়ে বসরা দখল করে এবং ১৯৩০ সনে স্বাধীন ইরাক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বসরা বর্তমানের ইরাকের হাতে ছেড়ে দেয়। ইরাক স্বাধীন হবার পরেপরেই বসরার রুমালিয় এলাকায় বিরাট তেলের ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়। বর্তমানে বসরা সুইট ক্রুড (বসরার মিষ্টি অপরিশোধিত তেল) হিসেবে বিশ্বে সবচেয়ে উন্নতমানের বলে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইরাকের বর্তমান বাথ পার্টি তেল শিল্পকে জাতীয়করণ করলে প্রধানত বৃটিশ কোম্পানিগুলো এসব ক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য হয়। বর্তমানে ইরাকের দক্ষিণ অঞ্চলের তেল ক্ষেত্রগুলোসহ বসরার বন্দর উম্মে কসর এর তেলের টার্মিনাল প্রায় সত্তর বছর পর সরাসরি বৃটিশ বাহিনীর হাতে পড়েছে। বসরার পতন অবশ্যম্ভাবী এবং ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা নেয়া বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণের তেল শিল্পকে হাতছাড়া করবে না, তবে তাদের সামরিক উপস্থিতি কতখানি সুখকর হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্বে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ভাবতেও পারে নি যে, বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছতে প্রতি জনপদে তাদেরকে সামরিক দিক থেকে দুর্বল ইরাকি বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে। ১ম মেরিন ফোর্সের খ্রিস্টপূর্ব ৩ শত বছর পূর্বের জিগুরাত উর সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী শহর সামরিক দিক থেকে

www.pathagar.com

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ নাসিরিয়ায় প্রচণ্ড প্রতিরোধ ভাঙতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগেছে। এ যুদ্ধে ইরাকের তৃতীয় কোরের সামনাসামনি হতে হয়েছে বলে অনুমানেয়। উপর্যুপরি বিমান আর হেলিকপ্টার গানশিপের সামনে ইরাকি বাহিনী ১৯১৫ সনের মত বৃটিশ বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে ওসমানিয়া সৈনিকদের দ্বারা প্রতিরোধের মতই পুনরাবৃত্তি করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে নাসিরিয়ার যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীকে প্রচুর ক্ষতি সামলাতে হয়। ঐ যুদ্ধের স্মারক আজও ভারত-পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্টগুলোর কাছে রয়েছে। নাসিরিয়া দখল করে মার্কিন বাহিনী এগিয়ে গেলে সূত্রমতে নাসিরিয়ায় সরবরাহ রাস্তা পাহাড়ারত মার্কিন সৈনিকরা ইরাকি গেরিলা হামলার মুখে পড়েছে। ইরাকিরা পিছু হটলেও দখলদার বাহিনীকে ছেড়ে দিচ্ছে না।

মার্কিন মেরিন ডিভিশন নাসিরিয়া অতিক্রম করলেও অগ্রগামী দলকে সামরিক ইতিহাসের বিখ্যাত রণাঙ্গন আর কুতে প্রচন্ড যুদ্ধের পর বাগদাদের পথ ধরতে হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসখ্যাত টাইগ্রিস বা দজলা নদীর পারের এ ইরাকি শহর আল-কুতের পুল দখল নিয়ে যে প্রতিরোধের মুখে মার্কিন বাহিনী পড়েছিল তার খণ্ড চিত্র পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে পাওয়া গেলেও সামরিক ইতিহাসের পাঠকদের কাছে এ যুদ্ধের রূপ সহজে অনুমানেয়। ইরাকের পূর্বাঞ্চলের এ শহরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল ওসমানিয় সামরিক বাহিনীর হাতে। চলমান যুদ্ধের আদলেই ১৯১৫ সনে একইভাবে বৃটিশ বাহিনী দ্রুত বাগদাদ দখলের জন্য ৬০ মাইল দক্ষিণে ওসমানিয় তুরস্ক বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হলে মেজর জেনারেল চার্লস টাউনসেন্ড তার ডিভিশন নিয়ে আল-কুত শহরের দিকে পশ্চাদাপসারণ করতে গিয়ে প্রায় পাঁচমাস অবরুদ্ধ থেকে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির পরে এপ্রিল ২৯, ১৯১৬ সনে ভারতীয় মূলের সৈনিকসহ ১০০০০ (দশ হাজার) সদস্যের বৃটিশ বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যদিও পরে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সনে বৃটিশ বাহিনী এ শহর পুনরুদ্ধার করে কিন্তু এ পরাজয় বৃটিশ ইতিহাসকে আজও তাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ যুদ্ধে আল-কুত শহর ধূলায় মিশিয়ে গেলে আজও বৃটিশ বাহনীর ক্ষয়-ক্ষতি আর পরাজয়ের ক্ষত নিয়ে প্রায় ছিয়াশি বছর পর মার্কিন বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছে এ অসম যুদ্ধে। এ যুদ্ধেও মার্কিন মেরিন সেনারা বৃটিশ সদস্যদের সমাধি ডিঙ্গিয়ে বাগদাদের নিকট সন্নিবেশিত

www.pathagar.com

হয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হলেও ইরাকি প্রতিরোধ মার্কিন বাহিনীকে তাদের পূর্বসূরিদের মতই হতবাক করেছে। আল-কুতে এখন পর্যন্ত মার্কিন সেনারা যুদ্ধরত।

অপরদিকে ৩য় ইনফেনট্রি ডিভিশন সামন্তয়ার প্রতিবন্ধক পাশ কাটিয়ে পবিত্র নগরী নজফের প্রতিরোধ মোকাবেলায় আটকে পড়লে ১০১ এয়ারবর্ন ডিভিশন নজফ অঞ্চলে পৌঁছলে তুমুল সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। নজফ মুসলমানদের বিশেষ করে শিয়া মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র নগর। এখানে শায়িত আছেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)। নজফে এখনও ইরাকি প্রতিরোধ ভাঙ্গতে সক্ষম হয় নি মার্কিন বাহিনী।

নজফ হয়ে ঐতিহাসিক ফোরাত নদীর পারে ইসলাম ধর্মের অত্যন্ত স্পর্শ কাতর শহর কারবালার প্রতিরোধের ভয়াবহতা কাটাবার জন্য ৩য় ইনফেনটি ডিভিশনের অগ্রগামী দল শহরটিকে বাইপাস করে। কারবালা আর ফোরাত নদীর গ্যাপের মধ্য দিয়ে বাগদাদের উপকণ্ঠে পৌঁছলেও কারবালার মধ্য দিয়ে প্রসারিত সরবরাহ পথ এখনও নিষ্কন্টক করতে সক্ষম হয় নি মার্কিন বাহিনী। কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনী পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। এ শহরের দখল নেয়া এখনও সম্ভব হয় নি। এখানে এখনও (৫ এপ্রিল ২০০৩) শহরের মধ্যে সামনাসামনি যুদ্ধ চলছে। মাত্র দুদিন আগে এ শহরে দুজন মহিলা আত্মঘাতী হামলায় তিনজন মার্কিন সৈন্য নিহত হলে মার্কিন সমরবিশেষজ্ঞরা এ ধরনের হামলা এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ইতিপূর্বে নজফের সন্নিকটেও একই রকম হামলা রোধ করবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বেসামরিক লোকজনের সাথে যে ব্যবহার করছে সে সব দৃশ্য শুধু আরব বিশ্বের নয় সমস্ত দুনিয়ার বিবেকবান মানুষকে অস্থির করে তুলেছে। কারবালার প্রতিরোধ ভাঙ্গতে আজও (৫ এপ্রিল ২০০৩) হেলিকপ্টার যোগে অতিরিক্ত এক ব্যাটেলিয়ন মার্কিন সেনার দল নিয়ে আসা হয়েছে। কারবালায় এখন যুদ্ধ রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতির পর্যায়ে নেমে এসেছে। এখানে মার্কিন বাহিনী প্রচুর ক্ষয় ক্ষতির সন্মুখিন হলেও মাত্র একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার আর এফ-১৮ জঙ্গি বিমানের ক্ষতির কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। তবে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়োগ থেকে এ অঞ্চলের প্রতিরোধ অনুমানেয়। অগ্রগামী সৈনিক তথা রাজধানী বাগদাদ দখলে প্রয়াসরত তৃতীয় ডিভিশনের সরবরাহ পথ নিশ্চিত করতে হলে কারবালার শহীদদের স্মৃতি ধারণকারি এ শহর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় ডিভিশন এখন বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সীমানায়। বিমানবন্দর দখল নিয়ে দু'পক্ষেই চলছে দাবি আর পাল্টা দাবি। যুদ্ধের ধুম্রজাল (fog of war) আর একতরফা প্রচারের জন্য পরিষ্কার পরিস্থিতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে ১ম মেরিন ফোর্স বাগদাদের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থান নেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মার্কিন সেনারা বাগদাদকে ঘিরে ফেলতে প্রয়াস নিলেও আরও শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া এ প্রয়াস সম্ভব নয়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কিন সৈন্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। বাগদাদের উপর চাপ পড়বে আরও বেশি। অন্যদিকে মার্কিন বিমান বাহিনী প্রতিনিয়ত বোমা নিক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। চারদিকে আগুনের লেলিহান ধ্বংসযজ্ঞ আর বেসামরিক জনগণের হত্যার মধ্যদিয়ে ইরাকের রাজধানী দখলের প্রয়াসরত মার্কিন বাহিনী।

বাগদাদ দখল করতে গিয়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হবে তা অকল্পনীয়। বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই বেপরোয়া আর মরিয়া হয়ে উঠেছে মার্কিন বাহিনী। যুদ্ধরত মার্কিন সেনাদের বাগদাদ শহরের ইতিহাস আর ঐতিহ্য সম্বন্ধে কতখানি ধারণা রয়েছে তা বুঝবার উপায় নেই। বাগদাদ দখলের যুদ্ধ এই প্রথম নয়। মঙ্গোল নেতা হালাকুখানের আক্রমণে ১২৫৮ সনে এ ঐতিহাসিক নগরী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল। ঐ আক্রমণের প্রায় আট শতাব্দী পরে আরেকবার ধ্বংসের মুখে রয়েছে ব্যাবিলনীয় সভ্যভার প্রতীক আর খলিফা হারুন-উর-রশীদের শহর বাগদাদ।

এ অসম যুদ্ধের আজ প্রায় ১৮ দিনেও (৫ এপ্রিল ২০০৩) অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে ইরাকের দুর্বল বাহিনী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বসরায় যে প্রতিরোধ এখন চলছে তা অকল্পনীয়। ইরাকের জনগণ তথা সেনাবাহিনীর সম্মিলিত প্রতিরোধকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধ বিশারদ আর নেতারা প্রকাশ্যে যত খাট করে দেখাবার চেষ্টা করুকনা কেন এ প্রতিরোধ সমগ্র আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার। মাত্র দুটি আত্মঘাতী হামলা যার সাথে দুজন মহিলা জড়িত এ চেতনার ন্যূনতম বহিঃ প্রকাশ মাত্র।

ইরাকের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার আসল উদ্দেশ্য ক্রমেই ইরাকি জনগণের নিকট উন্মোচিত হচ্ছে। জন্ম দিচ্ছে ইরাকি জাতীয়তাবাদী চেতনার। এ যুদ্ধ সাদ্দামের প্রতিরোধ নয়; বরং এ প্রতিরোধ এখন সমগ্র জাতির প্রতিরোধে

www.pathagar.com

পরিণিত হয়েছে। সাদ্দাম এখন উপলক্ষমাত্র। এ হামলা এবং প্রতিরোধ সাদ্দামের অতীত মুছে দিয়ে আরব বিশ্বের এক প্রতিবাদী যোদ্ধার ব্যক্তিত্বে উদয় হয়েছে। সমকালীন ইতিহাসে আরব বিশ্বের কোনো নেতাই একটি পরাশক্তিকে এককভাবে এতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। এ কারণেই এ যুদ্ধের পরিণাম নিয়ে আরব বিশ্বের রাজপথের জনগণ চিন্তিত নয়, চিন্তিত ইঙ্গ-মার্কিন নেতারা। এ যুদ্ধে যে জাতীয় চেতনার জন্ম দিয়েছে তা ভবিষ্যতে মার্কিনিদের তথা বৃটিশ সরকারকে কোথায় নিয়ে যাবে তা এখনই বলা সম্ভব না হলেও অনুমানেয়।

দৈনিক সংবাদ ঃ এপ্রিল ০৩, ২০০৩ ।

www.pathagar.com

সাদ্দাম উত্তর ইরাকে কুর্দি জটিলতার অশুভ সংকেত

মার্চ ২০, ২০০৩, বাগদাদে ক্রুজ মিসাইল হামলার মধ্য দিয়ে সূচিত হওয়া ইরাকের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধের ১৮ দিন পার হয়েছে (এ লেখা পর্যন্ত)। প্রচুর প্রতিরোধ আর রক্ত ক্ষরণের মধ্য দিয়ে মার্কিন বাহিনীর ১ম মেরিন এক্সপিডিশন ফোর্স এবং ৩য় ইনফেন্ট্রি ডিভিশন এখন ইরাকের রাজধানী বাগদাদের দ্বারপ্রান্তে। অন্যদিকে দক্ষিণের শহর, ইরাকের দ্বিতীয় শহর বলে পরিচিত বসরা নগরীও যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন থেকেই বৃটিশ বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ। বসরাকে ঘিরে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ত্বরিত সাফল্যের যে পরিকল্পনা বা অনুমান (hypothesis) করেছিল তা এখনও ফলপ্রসূ হয় নি। এখনও কোনো শহরেই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাক আক্রমণকে সাদ্দাম বিরোধী অভিযান অথবা ইরাকের জনগণকে সাদ্দামের হাত থেকে স্বাধীন করবার যুক্তির স্বপক্ষে জনসমর্থিত হতে দেখা যায় নি। দক্ষিণের শিয়া সম্প্রদায়কে এ অভিযানের যৌক্তিকতা কোনোভাবেই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বোঝাতে পারে নি। এর বিপরীতে দক্ষিণের প্রবল বিরোধিতা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে শুধু বাঁধাই দেয় নি; বরং ইরাকের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তুলছে। তবুও এ জাতীয়তাবাদ এ অসমযুদ্ধের পরিণতি রোধ করতে পারবে না। বাগদাদ কতদিন প্রতিরোধ করতে পারবে তা বলা সহজসাধ্য নয়।

দক্ষিণে যখন মার্কিন বাহিনীর সাফল্য এখনও নিরঙ্কুশ বলা যায় না তেমনি উত্তর ইরাকের মার্কিন বাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের সহযোগিতায় ইরাকি কুর্দিদের বাগদাদের বিরুদ্ধে অভিযানকে সহজবোধ্য বলা যায় না। পশ্চিমা মিডিয়ার বদৌলতে বিশ্বের জনগণের মনযোগ যখন দক্ষিণ রণাঙ্গনের দিকে নিবদ্ধ তখন উত্তরে তৈরি হতে চলেছে অত্যন্ত জটিল কোন্দলপূর্ণ পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে মার্কিন সহায়তায় কুর্দি পি ইউ কে (PUK : patrotic union of kurdistan) এবং কে ডি পি (KDP : kurdistan democratic party)

www.pathagar.com

এর বাগদাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কারণে। কুর্দিদের এ বৈরী দুটি দল ইঙ্গ-মার্কিন মধ্যস্থতায় একত্রে সংগ্রামে রাজি হলেও এ দু'দলের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। যদিও দু'দলই উত্তর ইরাকের কুর্দিদের জন্য একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা চাইছে তবুও একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ দূর করতে পারছে না। তবে মার্কিন মধ্যস্থতায় একত্র হয়ে বাগদাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রাজি হয়ে ছোটখাট অভিযানে জড়িয়ে পড়ছে।

তুরস্কের বিরোধিতার কারণে যখন মার্কিন বাহিনীর ৬০,০০০ সৈন্য বাগদাদের বিরুদ্ধে উত্তর রণাঙ্গনের সূচনা করতে পারল না তখন বিকল্প হিসেবে কুর্দিদের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বস্তুত ১৯৯১ সনের উপসাগরীয় যুদ্ধ আর ইরাকের সামরিক শক্তির বিপর্যয়ের পর থেকেই ওয়াশিংটন দক্ষিণের বসরা সহ শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল এবং উত্তরে ইরাকি কুর্দিদের বাগদাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করে। সাদ্দাম দক্ষিণের বিদ্রোহ দমন করতে পারলেও উত্তরে পাহাড়ি অঞ্চলের যুগযুগ ধরে স্বাধীনতাকামী কুর্দিদের নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। একদিকে উত্তর ইরাকে কুর্দিরা যুক্তরাষ্ট্রের গোপন তৎপরতার সহযোগিতায় নিজেদের সুসংগঠিত করে যখন বাগদাদের আওতার বাইরে নিজেদের একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলছিল তখন অন্যদিকে তুরস্ক দক্ষিণ পূর্বে পি কে কে(কুর্দি ওয়াকার্স পার্টি) বিদ্রোহ দমনে প্রচণ্ড সেনা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে কুর্দিদের সংগঠিত করবার দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান মার্কিন সরকার কর্তৃক দখলীকৃত ইরাকের কথিত 'ভাইস রয়' লে জে জে গার্নার। এতদঅঞ্চলে কুর্দিদের স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনো নতুন বিষয় নয় তবে ১৯৯১ এর পূর্বে ইরাক সরকার কুর্দিদের উপর কর্তৃত্ব কখনই শিথিল করে নি যেমনটি করে নি তেহরান, দামেস্ক অথবা আঙ্কারা।

ঐতিহাসিক কারণে ষোড়শ শতাব্দীর দিকে আইয়ুবীয় সাম্রাজ্য হারানোর পর থেকে কুর্দিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নিয়োজিত। এ অ-আরব গোষ্ঠি, যারা বিখ্যাত যোদ্ধা এবং জেরুজালেম বিজয়ী সালাউদ্দিন আইয়ুবীর গোষ্ঠি বলে পরিচিত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানিয়াদের বিরুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর সহায়তা করেছিল। এতদঅঞ্চলে কুর্দিরা নিজেদের স্বতন্ত্র বাসভূমির জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কর্নেল টিউ লরেন্স (লরেন্স অব এরেবিয়া বলে পরিচিত) এর নেতৃত্বে আরব বিদ্রোহেও যোগ দিয়েছিল। যুদ্ধের পরে জুন ২৪, ১৯২৩ সনের লওসান চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চল বিভক্তিকরণ পাকাপোক্ত করা হলে কুর্দিরা নিজেদেরকে

www.pathagar.com

প্রধানত চারটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিখণ্ডিত পায়। ঐ সময়ের মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইড্রু উইলসনের নিকট আবেদন করেও কুর্দিরা কোনো উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া পায় নি। পশ্চিমা বিশ্বে এ বিরোধিতা অনেক ইতিহাস বিশ্লেষকরা মনে করেন ১১৮৭ সনে সালাউদ্দিনের নিকট ফ্র্যাংকদের পরাজয়ের ইতিহাসের সাথে জড়িত।

ঐতিহাসিক আঙ্গিকে অতীত যতই তিক্ততায় পূর্ণ থাকুক না কেন বর্তমানে বাগদাদের বিরুদ্ধে উত্তর রণাঙ্গনে মার্কিন সৈন্য সমাবেশ না ঘটাতে পেরে গত ১২ বছরে গড়ে তোলা কুর্দি যোদ্ধাদের নিয়ে স্পেশাল ফোর্স এ অভাব পূরণ করছে। তবে এ সম্মিলিত উদ্যোগও নিষ্কণ্টক নয়। এ সহযোগিতার বিনিময়ে কুর্দি এলায়েন্স ন্যূনতমপক্ষে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল দাবি করছে আর সে সাথে উত্তর ইরাকে সবচেয়ে বৃহৎ তেল ক্ষেত্রের শহর কিরকুক (ঐতিহাসিকভাবে কুর্দি শহর) কুর্দিস্থানের রাজধানী হিসেবে দাবি করছে। এ দাবি শুধু তুরস্কেই নয়; বরং ইরান এবং সিরিয়াকেও চিহ্নিত করছে। এ কারণেই ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খারজাই এপ্রিল ৭, ২০০৩ এ তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুলের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কুর্দিস্তান এবং অপ্রচ্ছন্ন মার্কিন উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে প্রকাশ। তুরস্ক ন্যাটো জোটভুক্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট মিত্র দেশ হলেও ইরাকে মার্কিন উপস্থিতির বিষয়ে উদ্বিগ্ন। আঙ্কারা ইরাকের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা চেয়ে কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতা অথবা কিরকুকের দাবি কোনোটাই গ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছে। তুরস্ক কুর্দিদের এ ধরনের যেকোনো উদ্যোগের সশস্ত্র বিরোধিতা করবে বলেও জানিয়েছে। অন্যদিকে ইরান এতদঅঞ্চলে মার্কিন উপস্থিতি চাইছে না সে সাথে সিরিয়াও একই মত পোষণ করছে। স্মরণযোগ্য যে, ওয়াশিংটন ইরান এবং সিরিয়া উভয়কেই ইরাকের বিষয়ে নাক না গলাবার পরামর্শ দিয়ে হুঁশিয়ার করেছে।

কুর্দিদের নিয়ে যেমন বিপদে রয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ তেমনি এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মার্কিন প্রশাসন দৃশ্যত বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে। এ অস্বচ্ছতার কারণে ইরাকি কুর্দিস্তানে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের উপস্থিতির পরপরই এ বিষয়টি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। কুর্দিরা প্রথমেই মার্কিন বাহিনীর সহযোগিতায় প্রায় ৬০০০ যোদ্ধাদের নিয়ে ইরান সীমান্তের সন্নিকটে ইসলামিক কট্টরপন্থী বলে বিবেচিত কুর্দি এবং বাগদাদে সাদ্দামের সেকুলার বিরোধী বলে পরিচিত আনসার আল ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বেশকিছু বছর ধরেই প্রায় ৬০০-৮০০ সদস্যের ইরানি সমর্থক বলে কথিত এ দল সেকুলার বলে

www.pathagar.com

বিবেচিত কুর্দিদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। উল্লেখ্য, এ সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে ইরাকে হামলার পূর্বে ওয়াশিংটন আনসারের সূত্র ধরে সাদ্দামের সাথে ওসামা-বিন-লাদেনের সম্পর্ক প্রমাণের চেষ্টা করেছিল। বস্তুতপক্ষে বিষয়টি তার উল্টো। এ অনুযোগ শুধু বাগদাদেই নয় বরং নরওয়ের বাসিন্দা আনসার আল-ইসলামের নেতা মোল্লা কেরেকার অস্বীকার করে তার এবং তার দলের সাদ্দাম সরকারের বিরোধিতার কথা বলেন। আনসারের বিরুদ্ধে মার্কিন সহযোগিতায় কুর্দিদের আক্রমণকে ওয়াশিংটন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বললেও বস্তুতপক্ষে দুটি উদ্দেশ্য হাসিল করেছিল। প্রথমতঃ কুর্দিদের ভবিষ্যৎ ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবার জন্য সংগঠিত করা, দ্বিতীয়তঃ মার্কিন বাহিনী কর্তৃক কুর্দিদের আনসার আতঙ্ক থেকে নিস্কৃতি দেয়া। আনসার সংগঠন ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করবে তা সময় সাপেক্ষ বিষয়। মার্কিন হামলার প্রতিবাদে ঐ দিনই এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় তিনজন সহ একজন সাংবাদিক নিহত হয়। এ বোমা হামলার পেছনে আনসারদের হাত রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

কুর্দিদের আনসার-আল-ইসলামের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য যেসব ক্রুজ মিসাইল দাগা হয় তার অনেকগুলো পাহাড়ি শহর কোমালাকে বিধ্বস্ত করে। কোমালার এ আক্রমণ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ করে পি ইউ কে (PUK) এর সমর্থনকারী এবং অনসার বিরোধী আর একটি উগ্রপন্থী দল যেটি কে আই কে (KIK : komala islami kurdistan) বলে পরিচিত। যদিও এ দলকে নিজেদের সমর্থনে রাখতে উত্তর ইরাকের পি ইউ কে প্রশাসন প্রতি মাসে ২৫০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়ে আসছে তথাপি এদের এ সংগঠনের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তিত কুর্দি নেতৃবৃন্দ। কোমালার উপরে মার্কিন আক্রমণ, সমগ্র গ্রাম ধ্বংস আর প্রায় ৪৬ জনের প্রাণহানিতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে কে আই কে'র নেতা শেখ মহসিন। তাঁর এক বক্তব্যে মার্কিন বাহিনীর নিকট এ হামলার কারণ জানতে চাইলেও কোনো সদুত্তর পান নি। কোমালা নিয়ে মার্কিনিদের বিভ্রান্তিকর তথ্যই এ হামলার জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি ২০০৩ কলিন পাওয়েল নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের সময়ে উত্তরে অবস্থিত গোপন রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদনের যে স্থানের কথা বলে ছবি দেখান সেটি ছিল কোমালাদের গ্রাম খোরমাল। আসলে ছবিটি ছিল আনসারদের গ্রাম সারগাত। ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে খোরমালের নিরিহ গ্রামবাসীদের। এ হামলার জের ধরে পি ইউ কের সাথে কে আই কে'র সম্পর্কের যাতে অবনতি না

www.pathagar.com

হয় সে জন্য কোমালাদের অন্যত্র সরে যাবার জন্য স্পেশাল বাহিনী প্রায় ৬০০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদান দেয়। ওয়াশিংটনের গোপন সূত্রের তথ্যানুযায়ী মার্কিন বাহিনী কোমালাদের নিবিড় নিরিখের জন্যই অন্যত্র সরিয়েছে। কারণ সূত্রে প্রকাশ কে আই কে'র মাধ্যমে ইরান পি ইউ কে'র যোগাযোগ রেখে চলছিল।

আনসার এবং কোমালা সদস্য ছাড়াও মার্কিন বিমান হামলা হয়েছে তেহরান বিরোধী ইরানি কুর্দি গোষ্ঠি পিপলস্ মুজাহিদিন অরগানাইজেশনের (MKO) বিরুদ্ধেও। ঐ হামলায় তেহরান বিরোধী এ সংগঠন এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। অনেকেই মনে করেছেন ওয়াশিংটন তেহরানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেও তেহরান ইরাকের উত্তরে মার্কিন প্রয়াসকে মৌন সমর্থন দিচ্ছে। অবশ্য তুরস্কে খারজাইয়ের সাম্প্রতিক সফরের পর্দার আড়ালের আলোচনা এখনও প্রকাশ পায় নি।

উপরোল্লিখিত পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে যে বিষয়টি প্রতীয়মান সেটি হলো সাদ্দাম উত্তর ইরাকের তিনটি জোনে বিভাজনের পর থেকে উত্তরের কুর্দি অঞ্চলের অবস্থান নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উৎপত্তির সম্ভাবনা। এরই মধ্যে দু'দিন পূর্বে মার্কিন ১৭৩ এয়ারবর্ন ব্রিগেডের আরও ১০০০ সৈন্য কুর্দি অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য কুর্দিদের নিয়ে কিরকুক আর মসুলে ইরাকিদের বিরুদ্ধে হামলা এবং গুরুত্বপূর্ণ শহর দুটির দখল। এ দুটি শহর কুর্দি সাহায্যে মার্কিন স্পেশাল ফোর্স যদি অবশেষে দখল করে এবং আঙ্কারার চাপে ভবিষ্যৎ কুর্দি স্ব-শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত না করে তা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে কুর্দি স্বাধীকারের প্রয়াস আঙ্কারা কোনোভাবেই গ্রহণ করবে না। বিশেষ করে কিরকুকের তেল ক্ষেত্রে কুর্দিদের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হলে। অন্যদিকে কুর্দি দলদ্বয়, পি ইউ কে এবং কে ডি পি পরিষ্কারভাবে বলেছে এ অঞ্চলে তুরস্কের যেকোনো সামরিক দুঃসাহসিকতাকে প্রতিহত করতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় সাদ্দাম উত্তর, উত্তর ইরাকের পরিস্থিতি ওয়াশিংটন কতখানি বাগে রাখতে পারবে তা লক্ষণীয় বিষয়। হয়ত যুদ্ধের মধ্যে আর একটি যুদ্ধের সূচনা হতে পারে।

প্রথম আলো ঃ ৯ এপ্রিল, ২০০৩।

www.pathagar.com

বাগদাদের পতন, সাদ্দামের শাসন এবং কিছু কথা

ইরাকের উপরে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের যে পরিণতি হবার কথা ছিল তাই হয়েছে। ইরাক এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যতটুকু প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল ততটুকুই করেছে। ইরাক দুটি পরাশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হবার পর প্রচলিত যুদ্ধের প্রথায় যেভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে সেটাকে পশ্চিমা সমর বিশারদরা যত খাট করে দেখাবার চেষ্টাই করুকনা কেন বস্তুতপক্ষে এ প্রতিরোধ একটা অসম প্রতিরোধ ছিল তা তারা স্বীকার করবেন। আরব উপদ্বীপের দেশগুলো স্বাধীন হবার পর থেকে এ পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে কোনো যুদ্ধে কোনো আরব রাষ্ট্রই এ ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। এ অসম সংঘাতের শেষ ফল নিয়ে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিলনা যেমনটা প্রায় ৬ মাস আগে থেকেই কোনো সন্দেহ ছিলনা এ আগ্রাসনের সম্ভাবনা নিয়ে। যুদ্ধপূর্ব পরিস্থিতি আমার প্রতিটি বিশ্লেষণেই এর পরিণতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। ইরাকে প্রচলিত যুদ্ধের পর্ব শেষ হয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই তবে এ অঞ্চলে যে একটি লম্বা সময়ের জন্য অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে তাতেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাগদাদ দখলের মধ্য দিয়ে নতুন সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়েছে যার মধ্যদিয়ে ইরাকের প্রায় সত্তর বছরের স্বাধীন ইতিহাসের রক্তমাখা অধ্যায়ে আরও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পাতা যুক্ত হবে মাত্র।

ইরাকের এ লম্বা সময়ের ইতিহাস অতীতের মতই ছিল সংঘাত আর ক্ষমতার রক্তাক্ত পালা বদলের কাহিনী। সাদ্দাম হোসেনের অভ্যুত্থান রক্তপাতহীন হলেও বিগত পঁচিশ বছরের শাসন রক্তপাতহীন ছিলনা। সাদ্দামের ক্ষমতা দখলের পেছনেও ছিল পশ্চিমা শক্তি। বাথ পার্টির মধ্যপন্থীদের এ অভ্যুত্থান অনেকের মতেই ছিল বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর মদদপুষ্ট।

সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতা দখল রক্তপাতহীন হলেও পরে পার্টির ভেতরের শুদ্ধি অভিযান করতে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। নিজের ক্ষমতাকে পোক্ত করতে

www.pathagar.com

গিয়ে ইরাকের রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত চতুরতার সাথে পশ্চিমাবিশ্ব এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তথা বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইলেও ভৌগোলিক কৌশলের কারণে সে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি তারই জন্মভূমি তিকরিতে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম ইতিহাসের শক্তিধর যোদ্ধা সালাউদ্দিন আইয়ুবীর মত আরববিশ্বের নেতা হিসেবে বিকশিত হবার অদম্য ইচ্ছা পোষণ করতেন। সূত্র মতে, সাদ্দামের অবসর সময়ের সবচেয়ে প্রিয় ছিল সালাউদ্দিনের জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের বিষয়ের উপরে নির্মিত ছায়াছবি দর্শনের মধ্যদিয়ে। তিনি সালাউদ্দিনের মত জেরুজালেম মুক্ত করবার চিন্তা করলেও ঐ বীর যোদ্ধার মত সর্বজনবিদিত নেতায় পরিণত হতে পারেন নি। বাগদাদে তথা সমগ্র ইরাকে সাদ্দামের হাজার হাজার মূর্তিগুলোর আদল অথবা তরবারি জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত থাকলেও বস্তুতপক্ষে তেমন কিছুই করতে পারেন নি।

সাদ্দামের শাসনের বাইশবছরই কেটেছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর বিভিন্ন সমস্যার মধ্যদিয়ে যার মধ্যে একটি সার্বভৌম দেশ কুয়েত দখল এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যদিয়ে। এসব ঘটনা ইরাকের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সাদ্দাম বারবার পশ্চিমা তৈরি ফাঁদে নিজেই ধরা দিয়েছিলেন এ কারণেই আরব বিশ্বের পশ্চিমা ঘেঁষা দেশগুলো এবং খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বৃটেনের প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে অ-আরব ইরানের শিয়া মুসলমানদের ধর্মীয় অভ্যুত্থানের প্রভাবকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে প্রায় ৮ বছর যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে মারাত্মক ক্ষতি হয় ইরাকের তেলশিল্প সে সাথে অর্থনীতি এবং তুলনামূলকভাবে আরব বিশ্বের একটি আধুনিক সামরিক বাহিনীর। ঐ যুদ্ধের সমাপ্তির দিকে ইরানের উস্কে দেয়া কুর্দি বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যবহার করেন পশ্চিমাবিশ্ব হতে প্রাপ্ত রাসায়নিক অস্ত্র। এ বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগ ছিল অত্যন্ত অমানবেতর ঘটনা। ইরাক-ইরান যুদ্ধের ক্ষত শুকাবার পূর্বেই অর্থনৈতিক কারণেই কুয়েত দখল করলে সৌদি আরবের মত দেশ শংকিত হয়ে ওঠে। পরের ঘটনাগুলো সাম্প্রতিক ইতিহাস মাত্র। অনেক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নানাবিধ প্ররোচনার মুখে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতেই সাদ্দাম কুয়েত দখল করবার সাহস সঞ্চয় করেন (Pay Back : America's Long War in the Meddle East : John K. Cooley)। জাতিসংঘের আওতায় কুয়েত মুক্ত করবার পর ইরাকের সামরিক শক্তির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়। ঘটানো হয় দক্ষিণে শিয়া

www.pathagar.com

অভ্যুত্থান আর উত্তরে কুর্দিদের পুনঃ অভ্যুত্থানের। আর এ সব অভ্যুত্থান যে যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় হয় তা এখন আর পর্দার আড়ালের কথা নয়। এসব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সচরাচর যা হয় তাই হয়েছে। দক্ষিণে শিয়াদের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর প্রয়োগ ইরাকের সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ইরাকের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। উত্তরে কুর্দিদের দমনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র শক্ত ব্যবস্থা নিলে উত্তরাঞ্চল সাদ্দামের হাতের মুঠোর বাইরে চলে যায়। স্থাপিত হয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের যার প্রচ্ছন্ন ছবি এখন উদ্ভাসিত হচ্ছে মাত্র। উত্তরে আরেকটি জটিল আকার ধারণ করছে যা ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি রাষ্ট্রকে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

বিগত বিশ বছরের উপরে উপর্যুপরি বিপর্যয়, যুদ্ধ আর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকের জনগণের উপর নেমে আসে দুর্ভোগ যার জন্য সাদ্দাম সরাসরি দায়ী না হলেও এ ধরনের কোনো নেতাই দায়মুক্ত হতে পারেন না। ঐ অবরোধের কারণে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলেও আধুনিক প্রযুক্তি আর অর্থের অভাবে ইরাকের সামরিক শক্তি প্রাক-ইরান যুদ্ধ অথবা প্রাক-কুয়েত দখলের আগের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি; বরং বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর নৈতিক মনোবল জর্জরিত হতে থাকে দিনের পর দিন। কুয়েত যুদ্ধের লজ্জাজনক পরিণতির নৈতিক অবমাননা থেকে বের হতে পারে নি ইরাকি বাহিনী। সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় নৌবাহিনী আর আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইরাকের বিমানবাহিনী সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তবুও পশ্চিমাবিশ্বে ইরাকের সামরিক শক্তির একটি কল্পিত চিত্ররূপ তুলে ধরা হয় যার তুলনা এখন করা হচ্ছে ফেনটম বাহিনী (Fantom Force-কল্পিত অস্তিত্ব) হিসেবে। অর্থনৈতিক অবরোধ, জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির কারণে ইরাকের সামরিক বাহিনীর সরঞ্জাম কোনো বড়শক্তি মোকাবেলার উপযোগী ছিলনা। এর প্রতিফলন আমরা ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন আর তার প্রতিরোধের সময়েই প্রত্যক্ষ করেছি। সামান্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইরাকের পুরাতন ট্যাংক (সাজোয়া বহর) সোভিয়েত সময়ের প্রস্তুত টি ৭২ যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নত এম-১এ-১ এব্রাম ট্যাংকের সামনে দাঁড়াতেই পারে নি। (T-72) ওই ট্যাংকের গোলার দূরত্ব যেখানে ১২০০ মিটার সেখানে মার্কিন ট্যাংকের গোলার দূরত্ব ২০০০ মিটার। একইভাবে প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রগুলো বিশ্বের সবচেয়ে সংরক্ষিত বলে পরিচিত বৃটিশ চ্যালেঞ্জার ট্যাংকের

www.pathagar.com

কোনো ক্ষতি করতেই সক্ষম হয় নি। তেমনি অবস্থা ছিল বিমান বিধ্বংসী প্রচলিত কামান এবং মিসাইলের। বিমান বিধ্বংসী প্রতিরোধ ছিল অত্যন্ত সেকেলে।

ইরাকের সামরিক শক্তিকে একটি প্রতিপক্ষ সাজানো ছিল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর প্রচলিত জয়কে নিজস্ব জনগণের সামনে মহিমাময় করে তোলা। যাহোক, মধ্যপ্রাচ্যের বিজয়ের উপরে অনেক বিশেষজ্ঞের মত আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় আমিও মনে করি যে, মধ্যপ্রাচ্যে সরব উপস্থিতি এবং এতদঅঞ্চলের সুদূরপ্রসারি প্রভাব স্থায়ী করবার প্রয়াসে ইরাকের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতিবিদরা। ১৯৯১ সনের পরে একতরফাভাবে 'নো ফ্লাই জোন' তৈরির পর থেকেই এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট থাকবার কথা নয়। এ ব্যবস্থার সুযোগ পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিটি মার্কিন প্রশাসনই নিয়েছে। ক্লিনটনের সময়ে ১৯৯৮ সনে দুদিন ধরে 'অপারেশন ডেজার্ট ফক্স' (Operation Desert Fox) এর আওতায় বাগদাদে ব্যাপক বোমা বর্ষণ চলে। নো ফ্লাই জোন সংরক্ষণের নামে অবশিষ্ট বিমান বিধ্বংসী মিসাইল এবং প্রচলিত কামান ধ্বংস করণ।

এতসবের পরেও ইরাকি সামরিক বাহিনী ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে শূন্য মাঠে ওয়াক ওভার দেয় নি; বরং যতটুকু প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তা ভবিষ্যতে আরও প্রতীয়মান হবে। সংখ্যানুপাতিক হারে ইরাকের সামরিক বাহিনীর বৃহত্তর জনবল এখনও রক্ষিত তবে এদের অবস্থান অনিশ্চিত।

যেমনটা আমি আমার পূর্বের লেখাগুলোতেও বলেছি যে, যত সীমিত আকারেই হোক, যে প্রতিবন্ধকতার মুখে ইরাকে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল তা সাদ্দামের প্রতি আনুগত্যের কারণেই শুধু নয়, এ প্রচলিত প্রতিরোধ ছিল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এ জাতীয়তাবাদ শুধু ইরাকের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে আরব বিশ্বে তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে (দ্বিমত থাকা স্বাভাবিক)। এ আগ্রাসনকে আরব বিশ্বের জনগণকে শাসক শ্রেণী থেকে বহুদূরে নিয়ে গেছে আর তাই দেরিতে হলেও বেশিরভাগ আরব রাষ্ট্রের কম্পিত রাষ্ট্র শাসকরা সুর পাল্টাতে শুরু করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ সুপরিকল্পিত মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের পরিকল্পনায় শংকিত হয়ে পড়েছেন। তবে একটু বেশি দেরি হয়েছে বলে মনে হয়।

এ আগ্রাসনের পরিণতি ছিল অবধারিত। যে কোনো কারণেই হোক এ

www.pathagar.com

আগ্রাসন সাদ্দামকে ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়কের স্থান হতে প্রতিবাদী নায়কের পর্যায়ে নিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৯০ সনে যেদিন সাদ্দাম ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে বলেছিল 'আমি ইসরায়েলের অর্ধেক জ্বালিয়ে দেব' সেদিন থেকেই তিনি এবং ইরাক হয়ে ওঠে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য শক্তি। ইরাকের পতনের পর স্বভাবতই ইসরায়েল সম্ভাব্য ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে।

বাগদাদ পতনের দিনেই মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (Secretary of Defence) রামসফিল্ড বলেছেন যে, সাদ্দাম উত্তর ইরাক শুধু ইরাকিদের জন্যই শান্তি বয়ে আনবে না, পরিবর্তিত হবে এতদঅঞ্চলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা। তার এ উক্তির তাৎক্ষণিকভাবে সার্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি তবে এ উক্তির তাৎপর্যই মধ্যপ্রাচ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের নকশার পুনঃবিন্যাস করেছিল তেমনিভাবে একবিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি অতীতের ভুল শুধরাবে হয় প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোরক্ষভাবে। এর পেছনে কাজ করবে মধ্যপ্রাচ্য তথা মধ্যএশিয়ার সম্পদের উপরে নিয়ন্ত্রণ আর এ নিয়ন্ত্রণে ইসরায়েলের পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করণ।

বাগদাদ এখন মার্কিন সেনার অধীনে এবং প্রশাসনও তৈরি হচ্ছে পেন্টাগনের তত্ত্বাবধানে। গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা যে পেন্টাগন তথা সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভশীল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুক্তরাষ্ট্র এখন জেনারেলদের দ্বারা গণতন্ত্র রপ্তানির নতুন ব্যবস্থায় হাত দিয়েছে। দুঃখ হয় ইরাকের জনগণের জন্য আর সাদ্দামের মত রাষ্ট্রনায়কদের জন্য। সাদ্দাম হয়ত মরে বেঁচে যাবেন তবে রেখে যাবেন কিছু শিক্ষণীয় বিষয় বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে জন্য।

প্রথম আলো ঃ এপ্রিল ১৬, ২০০৩।

www.pathagar.com

ইঙ্গ-মার্কিন রণকৌশল-ইরাকের প্রতিরোধঃ একটি সামরিক সমীক্ষা

সমসাময়িক সামরিক অভিযানের ইতিহাসের চমকপ্রদ অধ্যায়ের মত শুরু হয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইরাকি অভিযান 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডমস'। এ অভিযানের প্রকাশিত উদ্দেশ্য ইরাকের জনগণকে সাদ্দাম হোসেনের একনায়কত্ব থেকে মুক্ত করে সে দেশকে প্রকৃত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। এটি একটি মহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হিসেবে জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে বুশ প্রশাসন সামরিক অভিযান প্রায় ১০ দিন পূর্বে শুরু করেছিলেন (এ লেখা পর্যন্ত)। অন্যদিকে বুশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রায় এক বছর পূর্ব হতেই এ ধরনের একটি অভিযানের নিমিত্তে মার্কিন বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবার জন্য ঢেলে সাজানো শুরু করেছিলেন। নতুন আঙ্গিকে যোগ করা হলো 'গতি ক্ষিপ্রতা', আর সংক্ষিপ্ত অভিযানের মাধ্যমে জয় সুনিশ্চিত করা। এ সব অভিযানের মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এ পরাশক্তির অপ্রতিরোধযোগ্য প্রযুক্তিতে বলিয়ান বিমান বাহিনী। সূক্ষ্ম লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানার মত মিসাইল নিক্ষেপণের উপযোগী রণতরী আর বিমান বহর। আর এ বিমান বহরে প্রধান ভূমিকায় রাখা হয়েছে বি-১; বি-২, বি-৫২ বোমারু বিমানগুলো। সংযোজিত করা হলো বি-২ স্টেল্থ বোমারু বিমান (স্টেল্থ বিমান রাডারে ধরা পড়ে না)। আর ফাইটার বিমান বহরের সাথে যুক্ত করা হলো এফ-১১৭ এর মত স্টেল্থ বিমান। অগ্রগামী সাজোয়া বহরকে সর্বত বিমান সহযোগিতার জন্য আক্রমণকারী হেলিকপ্টার (Attack Helicopter: Apache) আর এ-১০ এর মত জঙ্গি বিমান। এ সবই ক্রমান্বয়ে ইরাকে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফোর্স মর্ডানাইজেশনের আরও একটি বড় সংযোগ হলো বিভিন্ন ধরনের ক্রেশপন্সবত্র এবং বোমার সংস্করণ অথবা নতুন উদ্ভাবন। বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রথমবারের মত ব্যবহৃত ক্রুজ মিসাইল বলে পরিচিত টমাহকগুলোকে জিপিএস

www.pathagar.com

(GPS : Global Positioning System) সংযোজন করে আরও কার্যকরি করা হয়। এগুলো এখন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপরে ব্যবহার করা যায়। এ নতুন প্রযুক্তির টমাহক বর্তমানে ইরাকি যুদ্ধে প্রথমবারের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এ মিসাইলটি রণতরি এবং বিমান উভয় মাধ্যমের দ্বারা ক্ষেপণ করা যায়। এ পর্যন্ত (২৯/০৩/০৩) ইরাকে ১০০০ টমাহক মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে। (কৌতূহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি মিসাইলের মূল্য ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এ মিসাইল এবং বোমা সম্ভারে আরও রয়েছে ১৫০০ পাউন্ড ওজনের 'ডেইজি কার্টার', যা ভিয়েতনামের পর আফগানিস্তানে ব্যবহৃত হয়েছিল, জেডঅ্যাম (JDAM) এবং প্রথমবারের মত ব্যবহৃত 'থারমোবেরিক ওয়েপন' (Thermobaric Weapon) ব্যবহার করা হয় গুহায় লুকিয়ে থাকা শত্রুদের জন্য। এটি বিস্ফারিত হওয়ার সাথে সাথে ভেতরের অক্সিজেন টেনে বের করে অক্সিজেন শূন্য করে যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। আরও রয়েছে জিবিইউ-২৮ (GBU-28) বাঙ্কার বাস্টার এর মত বোমা। এ বোমাটি মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বাগদাদে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনি আরও বহু ধরনের মিসাইল আর বোমার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে শত্রুপক্ষকে বোমার আঘাতে প্রতিরোধের ক্ষমতা খর্ব করে মনোবলকে গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে।

সেনাবাহিনীতে গতি সঞ্চারের জন্য এম-১এ১ এব্রাম ট্যাংক আর এ ট্যাংক বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদাতিক সৈনিকদের (ইনফেনট্রি) জন্য এম-২এ-৩ ব্রেডলি ফাইটিং ভেইকল। নতুন সংযোজিত হয়েছে এম ১০৯ এ-৬ প্যালাদিন হাউইটজার আর এম ২৭০ মাল্টিপল রকেট লঞ্চ সিস্টেম। শত্রুপক্ষের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্য প্যাট্রিয়ট মিসাইল সিস্টেমেরও সন্নিবেশ করা হয়। এক কথায় সামরিক অভিযানকে দ্রুতগতিতে নিষ্পত্তি করবার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্রের সমাবেশ করে ফোর্স মর্ডানাইজেশন সম্পন্ন করা হয়।

যুদ্ধের সূচনা না হওয়া পর্যন্ত ফোর্স মর্ডানাইজেশন সম্পন্ন হলেও ইরাকে ব্যবহারিক নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। কিছু কিছু অস্ত্র আফগানিস্তানে পরীক্ষা করা হয়েছিল মাত্র। ফোর্স মর্ডানাইজেশনের পরপরই প্রায় বছরখানেক পূর্বে ইরাকে যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্বে মার্কিন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি ডোনাল্ড রামসফিল্ডের তত্ত্বাবধানে প্রণোদিত হলো এক রণকৌশল। এ কৌশলের নাম দেয়া হলো 'শক এন্ড অ' (Shock and Awe)। এ 'শক এন্ড অ' অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম এর মূল রণকৌশল আর এ রণকৌশলের প্রধান লক্ষ্যবস্তু (Centre of Gravity) সাদ্দামের

www.pathagar.com

পতন আর বাগদাদ দখল। এ 'শক এন্ড অ' (বাংলায় হবে প্রচণ্ড আক্রমণ আর ভীতি) এর তত্ত্বে ছিল বিমানবাহিনী তথা মিসাইল আক্রমণ দ্বারা বাগদাদে ইরাকের রাজনৈতিক আর সামরিক নেতৃত্বের ধ্বংস আর যুগপৎ স্থলপথে আক্রমণ দ্বারা ভীতি সঞ্চার করে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধকে অতি সহজে গুঁড়িয়ে দেয়া। এ রণকৌশল নিয়েই শুরু হয় ইঙ্গ-মার্কিন অভিযান। সামরিক ইতিহাসে এবং তত্ত্বে 'শক এন্ড অ' নতুন বিষয় নয়। এর প্রথম প্রবক্তা ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর পূর্বের চীনা সমরতত্ত্ববিদ সান জু (Sun Tzu) এবং বিষদভাবে বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ করেন নেপোলিয়নের সময়ের বিশ্ববিখ্যাত সমরতত্ত্ববিদ কার্ল ভন ক্লজোউটজ (Carl Von Clausewitz)।

রণকৌশল 'শক এন্ড অ' এবং মুখ্য দ্রুত প্রধান লক্ষ্যবস্তু বাগদাদ দখল প্রণোদিত হয় দুটি অনুমানের (Hypothesis) উপর ভিত্তি করে। প্রথমতঃ প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে গণবিচ্ছিন্ন এবং তথাকথিত জন ধিকৃত সাদ্দাম সহ বাথ পার্টির উৎখাত এবং উৎখাত সমর্থনে ইরাকের জনগণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা। দ্বিতীয়তঃ প্রচণ্ড আঘাতের চাপে অত্যন্ত দুর্বল এবং মনোবলহীন ইরাকি সামরিক শক্তির আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণের ধারণা জন্মায় বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধে হাজার হাজার ইরাকি বাহিনীর আত্মসমর্পণের অভিজ্ঞতা থেকে। এ অনুমানের উপর ভিত্তি করে 'শক এন্ড অ' এর আওতায় গত এক বছরের উপরে মহড়া এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিম্ন পর্যায়ের সৈনিকদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। যদিও রাজনীতিবিদরা সামরিক বিশেষজ্ঞদের 'শক এন্ড অ' রণকৌশলকে গ্রহণ করাতে সক্ষম হন তথাপি পেন্টাগন অভিযান ত্বরান্বিত করবার জন্য উত্তর দক্ষিণ হতে বাগদাদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে তুরস্কের অসহযোগিতার কারণে উত্তর দিক হতে চাপ সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তবুও ওয়াশিংটনের সমরবিদ তথা রাজনীতিবিদরা ক্রমবর্ধমান যুদ্ধবিরোধী বিশ্ব জনমত আর মরু অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়া শুরু হবার পূর্বেই অভিযান সম্পন্ন করবার জন্য দক্ষিণ দিক হতে আক্রমণ শুরু করে। এ আক্রমণ শুরু হয় মার্চ ২০, ২০০৩ বাগদাদ সময় ফজরের নামাজের পরে পরেই। যদিও প্রথম ৪৮ ঘন্টা ক্রুজ মিসাইলের প্রাথমিক হামলার পর মার্কিন বাহিনীর দ্রুত অগ্রযাত্রার সময়ের মধ্যে ব্যাপক বোমা বর্ষণ শুরু হয় নি।

অভিযান শুরু করবার পূর্বেই মার্কিন সমরবিদদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল দক্ষিণের শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল, যা কারবালা পর্যন্ত বিস্তৃত সহজেই হস্তগত

www.pathagar.com

হবে এবং এতদঅঞ্চলের শিয়া ইরাকিরা সতস্ফূর্তভাবে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে স্বাগত জানাবে। এসব ধারণার বশবর্তী হয়ে উম্মে কসর হয়ে অগ্রযাত্রাকারী দুটি দল, ৩য় ইনফেন্ট্রি ডিভিশন এবং ১ম আর্মার ডিভিশন বসরা ছাড়িয়ে বসরা-নাসারিয়া-কারবালা-বাগদাদ মহাসড়ক বরাবর বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যায়। পথিমধ্যে বসরা অঞ্চলে ইরাকের তৃতীয় কোরের প্রতিরোধের মুখে বৃটিশ আর্মার ডিভিশনের ৭ম ব্রিগেড বসরা অঞ্চলেই রয়ে যায়। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অনুমানের মধ্যে বসরায় গণঅভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে প্রায় নিশ্চিত ধরা হয়েছিল। বাগদাদে ত্বরিত পৌঁছার উদ্দেশ্যে এ অভিযানকারি বাহিনী কোনো শহর বা জনপদ কেন্দ্রিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় নি। তবে যে বসরাকে ঘিরে বিশ্বজনমত যুদ্ধের পক্ষে টানার পরিকল্পনা ছিল তা এখনও সম্ভব হয় নি বরং বসরার প্রতিরোধ বাগদাদ যুদ্ধের ভয়াবহতার ইঙ্গিত বহন করছে। বসরার এ প্রতিরোধ বিশ্ববাসীকেই নয়; বরং খোদ মার্কিন রাজনৈতিক এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা পাল্টে দেবার জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিপাকে পড়েছেন ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক বিশারদরা।

অপরদিকে ৩য় ইনফেন্ট্রি ডিভিশন, ৮২ তম এয়ারবর্ন ডিভিশন দ্রুতগতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাসিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছলে ইরাকিদের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার সন্মুখিন হয়ে হকচকিত হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে নাসিরিয়ায় ইরাকি বাহিনী আর ১ম মেরিন ফোর্সের সাথে ইউফ্রেতিস নদী পার হওয়া নিয়ে। তৃতীয় ডিভিশন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নজফ আর কারবালায়। উভয় পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মুখে স্তিমিত হয়ে পড়ে দ্রুত অগ্রযাত্রা। মার্কিন বাহিনীর অগ্রযাত্রায় গতি সঞ্চারের সকল প্রচেষ্টা দশদিন (২৯/০৩/০৩) আটকিয়ে রাখে ইরাকের তথাকথিত সামরিক তথা আধাসামরিক বাহিনী। প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে সাধারণ ইরাকিরা। ত্বরিত অগ্রযাত্রার কারণে কারবালা নাসিরিয়া হতে কুয়েত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় প্রধান সরবরাহ পথ (MSR: main supply route)। মার্কিন বাহিনীকে হকচকিত করে গেরিলা পদ্ধতিতে ফিদাইন কর্তৃক ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পড়ে সরবরাহ পথ। এ কারণেই পুনঃবিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে 'শক এন্ড অ' রণকৌশল। প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজনীতিবিদদের যুদ্ধ তত্ত্ব। প্রতীয়মান হয়ে উঠছে সামরিক বিশেষজ্ঞ আর রাজনীতিবিদদের মত পার্থক্য। অন্যদিকে ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের সামরিক পরিকল্পনাকারী আর মাঠ পর্যায়ের সামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে তফাৎ।

www.pathagar.com

যদিও এখনও মার্কিন বাহিনীর হাতে রয়েছে ১০১ এয়ার বর্ন ডিভিশন তারপরেও প্রশ্ন উঠছে একটি বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে রণকৌশল প্রণয়নের যেখানে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে অনীহা করা হয়েছে। ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয় নি ইরাকের আধুনিক প্রযুক্তি আর সরঞ্জাম বিবর্জিত বাহিনীর প্রতিরোধ এবং পাল্টা আক্রমণ ক্ষমতা। ধর্তব্যের বাইরে রাখা হয়েছিল ইরাকি নেতৃত্বের প্রতিরোধ আর পাল্টা আক্রমণের ক্ষমতাকে। বসরা দখল করা সম্ভব হয় নি যা হবার কথা ছিল ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিজয় কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে। সংযুক্ত করা হয়েছিল সাংবাদিকদের, ৩০ মিলিয়ন প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল সমগ্র ইরাকের উপরে। এক কথায় ইরাকের রণকৌশলের নিকট পর্যুদস্ত হয়েছে 'শক এন্ড অ'। প্রয়োজন পড়েছে আরও ১,৫০,০০০ সামরিক সদস্যের এ যুদ্ধে যোগদানের।

অপরদিকে আট বছরের ইরাক-ইরান যুদ্ধ, কুয়েত দখল, উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যাপক পরাজয়ের পর ১২ বছরের জাতিসংঘের অবরোধে থাকা ইরাক জর্জরিত। ইরাকের ৩,৫০,০০০ সদস্যের সেনা বাহিনীর হাতে মার্কিন প্রযুক্তি মোকাবেলা করার মত প্রযুক্তি সম্পন্ন অস্ত্রের অভাব আর সে সাথে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ৩৫০টি যুদ্ধ বিমান। এসবই ইরাকের প্রতিকূলে। ইরাকের ট্যাংক বাহিনীর সংখ্যা ২৬০০ হলেও বেশিরভাগ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের টি-৫৫,৫৭ আর৭২ মডেলের যা মার্কিন প্রযুক্তির সামনে নিম্নমানের। তার উপরে রক্ষণাবেক্ষণের সংকটের কারণে অর্ধেকের বেশি অচল। এ নিয়েই ইরাকের স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ড; রিপাবলিকান গার্ড আর নিয়মিত সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে চলেছে বিমান বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ইরাকের প্রায় ৩০০ বিমানের অধিকাংশ অচল। বাকি সোভিয়েত নির্মিত মিগ সিরিজ তথা হাতে গোণা সিরিজ-৩ মার্কিন প্রযুক্তির কাছে পর্যুদস্ত। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ইরাকের সমরবিদরা যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তার জন্য প্রস্তুত ছিলনা প্রতিপক্ষ। ইরাকের সামরিক বাহিনী তথা রিপাবলিকান গার্ড বাগদাদের অভ্যন্তরে এবং বাইরে খণ্ড খণ্ড দলে ব্যুহ্য রচনা করে রেখেছে। একই সাথে সম্পদগুলোতে প্রচণ্ড প্রতিরোধের মাধ্যমে যখন অগ্রযাত্রায় বাধা দিচ্ছে ঐ একই সাথে দীর্ঘ সরবরাহ পথে গেরিলা হামলায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে। এসব চাপের মুখে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী গেরিলা যুদ্ধ প্রতিহত করবার কৌশল গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। এ কৌশলে সময়ের প্রয়োজন অত্যধিক। বিতর্কিত হচ্ছে পেন্টাগনের সমর কৌশল।

www.pathagar.com

দশদিনের মাথায় এতো শক্তি প্রয়োগের পরেও ইরাকের প্রতিরোধ ভাঙ্গতে পারে নি। বসরা দখল সম্ভব হয় নি। বাগদাদ নিয়ে শংকিত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী। বাগদাদে হবে স্নায়ু আর মনোবলের যুদ্ধ, দখলের চেষ্টায় রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হবার আশঙ্কায় শংকিত মার্কিন সমর বিশারদরা। বাগদাদ হয়তো দখল হবে তবে তার জন্য যে মূল্য দিতে হবে তা ধারণাও করে নি 'শক এন্ড অ' তত্ত্বের প্রণেতারা। ইরাকের প্রতিরোধ যে জনবিচ্ছিন্ন নয়, জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একথা স্বীকার করছে না ওয়াশিংটন আর লন্ডনের রাজনীতিবিদরা। ইরাকের স্বাধীনতাকামি জাতীয়তাবাদ যেভাবে এ পর্যন্ত অস্ত্রায়ণ প্রতিহত করেছে তা সমর ইতিহাসে একটি পঠনীয় অধ্যায়ে পরিণত হবে তৃতীয় বিশ্বের সামরিক শক্তিতে দুর্বল জাতীয়তাবাদি সমরবিদদের নিকট। অবশেষে বাগদাদ দখল হতে পারে কিন্তু এ যুদ্ধ নাড়া দিয়েছে ইরাকি তথা আরব জাতীয়তাবাদকে। এ প্রতিরোধ সাদ্দামের নয়-ইরাকে ইরাকের জনগণের।

প্রথম আলো ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০০৩ ।

www.pathagar.com

ইরাকের পরিস্থিতির সমীক্ষা

প্রথমে শাসক পরিবর্তন পরে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র অসম্প্রসারণ (WMD) বা নিরস্ত্রীকরণ, বিভিন্ন নামে বা উদ্দেশ্যের অজুহাত দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রায় একবছর পূর্বে ইরাকে বাথ পার্টি তথা সাদ্দাম বিরোধের সূচনা করে অবশেষে সাদ্দাম হটাবার জন্য বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা বৃহস্পতিবার, মার্চ ২০, ২০০৩ ক্রুজ মিসাইল এবং প্রিসিশন গাইডেড মিসাইল দিয়ে বাগদাদে কথিত সাদ্দামের বাংকারে হামলা চালাবার পনের মিনিট পর বাংলাদেশ সময় সকাল ৯.১৫ মিনিটে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, ইরাকের জনগণকে এক অত্যাচারীর হাত থেকে স্বাধীনতা দেবার জন্য তিনি সূচনা করেছেন।

জর্জ বুশ ইরাকের পটপরিবর্তন আর ইরাকিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বললেও ইরাকের বিপুল তেল সম্পদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে খোলাসা করে কিছু বলেন নি বা বলতে চাচ্ছেন না।

এ পুস্তকের সমাপ্তি এমন সময়ে টানতে হলো যখন বাগদাদে মিসাইল হামলা চলছে। প্রাথমিক খবরে বলা হয়েছিল সাদ্দাম সহ ইরাকি বাথ পার্টির বেশ কিছু নেতা নিহত হয়েছেন। এ খবর যখন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছিল তার এক ঘন্টা পরেই সাদ্দাম ইরাকি টেলিভিশনে বক্তব্য রাখেন। আজ যুদ্ধের প্রথমদিন। (বৃহস্পতিবার ২০, ২০০৩) ইরাকের তেলক্ষেত্র আক্রমণে বিশাল তেলক্ষেত্র সহ বসরা দখল করতে প্রস্তুত। যুদ্ধের সূচনা। বসরা অঞ্চলের অপরিশোধিত তেল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত।

ইরাকে বর্তমানে তেল মজুদ রয়েছে ১১২ বিলিয়ন ব্যারেল আর সম্ভাব্য রিজার্ভে রয়েছে ২২০ বিলিয়ন ব্যারেল। এর যোগফল পৃথিবীর তাবদ তেল উৎপাদনের ১০ শতাংশ। পুস্তকের আগের অধ্যায়গুলোতে যেমনটা বলেছি ইরাকের ক্ষেত্রগুলো থেকে তেল উত্তোলনের খরচ হয় ব্যারেল প্রতি ১ মার্কিন ডলার যার বিপরীতে বৃটেনের উত্তর সাগর বা নর্থ সিতে ৪ এবং সৌদি আরবে

www.pathagar.com

২.৫ মার্কিন ডলার। ইরাকের তেলে রয়েছে কম সালফার আর তাই এর শোধনও করা যায় অপেক্ষাকৃত কম খরচে। ইরাকের প্রতিদিনে উত্তোলনের ক্ষমতা রয়েছে পাঁচ মিলিয়ন ব্যারেল। তেলক্ষেত্রগুলো সংস্কার এবং আরও বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব। বিগত বার বছরে সংস্কার তথা বিনিয়োগের অভাবে পূর্ণ উত্তোলন সম্ভব হয় নি। কাজেই পূর্ণ উত্তোলন শুরু হলে বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য বর্তমান বাজারদরের অর্ধেকে নেমে আসবে। তা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানের নিম্নমুখি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবার সুবর্ণ সুযোগ। তা ছাড়া রয়েছে বিশাল বিনিয়োগ আর বিরাষ্ট্রীয়করণ করে ইঙ্গ-মার্কিন কোম্পানিগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথিত ইরাক পুনঃগঠন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অর্থও যে তেল বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে আসবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিগত কয়েক বছরে সাদ্দাম সরকার ইরাকের তেল ক্ষেত্রগুলো সংস্কারের জন্য জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার আওতার মধ্যেই এবং প্রায় ৪১৭টি নতুন কূপ খননের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। এতে রাশিয়া, চীন এবং ইরাক ছাড়াও রুমানিয়ার অংশগ্রহণের কথা ছিল। এ প্রকল্প ছিল ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। ইরাক ইতিমধ্যেই কিছু চুক্তিও করেছিল। এর মধ্যে ছিল ফ্রান্সের (টোটাল ফিনা ইএলএফ (Total Fina Elf), রাশিয়ার লুকওয়েল (Lukoil), জারুবেজনেফট (Zarubezneft); এবং চীনের চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি (China Natinal Patrolium Company)। উল্লেখ্য, একমাত্র রুমানিয়া ছাড়া আর প্রতিটি দেশই মার্কিন হামলা তথা পটপরিবর্তনের বিরোধিতা করে আসছিল। সাদ্দাম ইরাক উত্তর এসব দেশের এ সবচুক্তি বলবত থাকবে কিনা তা দেখবার বিষয়। আরও উল্লেখ্য, যে অবরোধ এবং সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানই এসব চুক্তিতে প্রতিযোগিতা করতে পারে নি। অন্যদিকে বৃটিশ সেল (Shell) এর নগণ্য একটি চুক্তি ছাড়া বৃটিশ কোম্পানিগুলোও স্থান পায় নি।

আর এসব কারণেই ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীন চাইছিল ইরাক সংকটকে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা কারণ একথা পরিষ্কার যে, বাগদাদে বল প্রয়োগে পটপরিবর্তন শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র আর বৃটেনের কোম্পানিগুলোকে লাভবান করবে। আর তাই হতে চলেছে।

ইরাক তথা মধ্যপ্রাচ্যের তেল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের জন্য অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সিংহভাগ তেলের সাথেই জড়িত। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয় প্রায় সব শিল্পোন্নত পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ উৎপাদনের পঞ্চাশভাগের ভোক্তা এর

www.pathagar.com

মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একাই এর দুই পশ্চমাংশ ব্যবহার করে।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জ্বালানি সংস্থার এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ করেছে যে, ২০২০ সনের শেষে বিশ্বের চাহিদা বর্তমানের তুলনায় ৩৭ থেকে ৯০ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে আর শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা ফি বছর বাড়বে দুই থেকে তিন বিলিয়ন ব্যারেল।[১]

কাজেই বিশ্বজুড়ে এ যুদ্ধ বিরোধীরা যখন বলে No War For Oil (তেলের জন্য যুদ্ধ নয়) যে কথা যুক্তরাষ্ট্রের বুশ সরকার প্রকাশ করতে না চাইলেও ভালভাবেই জানে যে, বিশ্বের জনগোষ্ঠিকে রক্তচক্ষু দিয়ে বোঝানো সহজ নয় যে, এযুদ্ধ ইরাকিদের স্বাধীন করবার জন্য।

ইঙ্গ-মার্কিন হামলা প্রতিহত করবার মত ক্ষমতা হয়ত সাদ্দামের হবেনা। ইরাক পদদলিত হবে। তেলই হবে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য অভিশাপ কিন্তু এ সংঘাত এখানেই সমাপ্ত হবে বলে মনে হয়না। যেমন হয় নি বিগত শতাব্দীর উপনিবেশ বিরোধী যুদ্ধ। ইরাকের যুদ্ধ এখানেই শেষ নয়। তেলের নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধের সূচনা মাত্র।

১। The Observer (UK) Sunday February 2. 2003.

www.pathagar.com

শেষের কথা

ইরাকে ৪০ বছরের বাথ পার্টির শাসনকাল এবং ২০ বছরের শাসক সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করতে মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বৃহস্পতিবার ২০ মার্চ, ২০০৩ এ। এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হলো ইরাক দখলের পর এ দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটিশ কূটনীতিতে মেসোপটেমিয়াকে ইরাক আর কুয়েতে ভাগ করে কুর্দিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ইরাক নামক রাষ্ট্র গঠন করেছিল। ইরাকের দক্ষিণে আরবী ভাষাভাষি শিয়াদের পারস্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে জুড়ে দিয়েছিল ইরাকের সাথে। সুন্নিদের সাথে রাখবার এবং ওসমানিয়া সাম্রাজ্য ভেঙ্গে 'স্বাধীনতা' প্রদানের প্রয়াসে এবং সুন্নিদের দলে রাখার জন্য ইরাকে সুন্নি শাসনের সূচনা থেকেই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল যা আজও চলছে আর সুযোগ নিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরায়েলের গুপ্ত সংগঠনগুলো। ১৯৫৮ সন পর্যন্ত ইরাকের তেল বৃটিশ কনসোরসিয়ামের হাতে ছিল। আবার সে বৃটিশ তথা যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর প্রবেশ। ভবিষ্যতে ইরাকের তেল কার হাতে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

ইরাক নামক বর্তমান ভূখন্ডের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে জল্পনা কল্পনা রয়েছে। তবে যেহেতু উত্তরে কুর্দি এলাকায় এবং দক্ষিণে শিয়া এলাকায় রয়েছে বড় বড় তেলের ক্ষেত্রগুলো এবং দক্ষিণে বন্দর নগরীগুলো সে ক্ষেত্রে এ দু অঞ্চলের অধিক স্বায়ত্তশাসন বিরাষ্ট্রীয়কৃত ইরাকি তেল সহজে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কাজেই ইরাক তিনটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বিভাজিতই হবার সম্ভাবনা বেশি।

কুর্দি অঞ্চল নিয়ে তুরস্ক বিবাদে জড়িয়ে পড়লে তা সামাল দেয়া ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পক্ষে দুঃষ্কর হয়ে পড়বে। স্মরণযোগ্য যে, কুর্দি নেতা সালাউদ্দিন

www.pathagar.com

তৎকালী ইংল্যান্ডের তথা ইউরোপীয় ফ্র্যাংকদের নিকট থেকে 'জেরুজালেম' জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। আজও আরবরা জেরুজালেমকে শুধু পবিত্র শহরই নয় আরব শহর বলে দাবি করে আসছে এবং ইসরায়েলের বিরোধিতা করে আসছে। কুর্দি অঞ্চল জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দেবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কোন পক্ষ অবলম্বন করবে তা দেখবার বিষয়।

তেলের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ইসরায়েলের তেলের চাহিদা সরাসরি ইরাকি তেল দিয়ে মিটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। স্মরণযোগ্য, ইরাক-তুরস্ক পাইপলাইনের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে যার ত্বরিত সমাপ্তি অনুমানেয়। ইতিমধ্যে ইসরায়েলের হাইফা কিরকুক পাইপ লাইনের সংস্কার চলছে।

সাদ্দামের অপসারণ আর ইরাকের সামরিক শক্তি হ্রাস ইসরায়েলকে ইরাক ভীতি থেকে মুক্ত করবে। শুধু তাই নয়, সিরিয়া সমর্থিত হামাস আর ইরান সমর্থিত ইসরায়েল বিরোধী হিজবুল্লাহ্ জাতীয় চরমপন্থী গোষ্ঠিগুলোকে সমূলে বিনাশ করতে বাগদাদে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক উপস্থিতি সহায়ক হবে। ইসরায়েল এতদ অঞ্চলের সবচেয়ে অ-প্রতিরোধ্য শক্তিতে রূপান্তারিত হবে। প্যালেস্টিনিয়ান সমস্যার সমাধান ইসরায়েলের ছকেই হবে। এ সমস্যা সমাধানে একটি রোড ম্যাপ দেয়া হয়ে গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল বিরোধী তথা কথিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাতে পিছপা হবেনা তা যদি সিরিয়া অথবা ইরানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেও করতে হয়। ইরাকের তেলের নিয়ন্ত্রণ এবং ওপেকের (OPEC) নিয়ন্ত্রণও সহজতর করবে। নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করতে প্রয়োজন হবে সিরিয়া আর ইরানের উপরে প্রভাব বিস্তার।

যদিও ইরাকের এ যুদ্ধকে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির যুদ্ধ নাম দিতে চেয়েছে কিন্তু আদতে তা হয় নি। ইরাকের যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির নতুন সামরিকায়নের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। জর্জ ওয়াকার বুশ নিজেই বলেছেন এ যুদ্ধ অর্ধেক সমাপ্ত হবেনা। যুক্তরাষ্ট্র এখন সশরীরে মধ্যপ্রাচ্যে উপস্থিত কিন্তু এ উপস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনায় সহায়ক হয়ে বিশ্বের অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করবে, না অস্থিরতাকে বাড়াবে তা হয়ত আগামী বছরগুলোতেই প্রতীয়মান হবে। তবে ইতিহাস সাক্ষী, যে কোনো ঔপনিবেশবাদই স্থায়ী শান্তি আনতে সক্ষম হয় নি।

পারিবারিক গ্রন্থাগার
আয়েশা বিনতে মুজাহিদ
www.pathagar.com

পরিশিষ্ট – ক

কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল ঃ সমীক্ষা গ্রাফ

টেবিল ঃ ১ ঃ কাস্পিয়ান অঞ্চলে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ/সম্ভাব্য মজুদ

দেশ	মজুদ তেল *	সম্ভাব্য তেল **	মোট তেল আনুমানিক	মজুদ গ্যাস	সম্ভাব্য গ্যাস **	মোট গ্যাস আনুমানিক
আজারবাইজান	৩.৬-১২.৫ বিলিয়ন ব্যারেল	৩২ বিলিয়ন ব্যারেল	৩৬-৪৫ বিলিয়ন ব্যারেল	১১ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট	৩৫ টিসিএফ	৪৬ টিসিএফ
ইরান ***	০.১ বিলিয়ন ব্যারেল (বিবিএল)	১৫ বিলিয়ন ব্যারেল	১৫ বিলিয়ন ব্যারেল	-	১১ টিসিএফ	১১ টিসিএফ
কাজাকিস্তান	১০.০-১৭.৬ বিবিএল	৯২ বিবিএল	১০২-১১০ বিবিএল	৬৫-৭০ টিসিএফ	৮৮ টিসিএফ	১৫৩-১৫৮ টিসিএফ
রাশিয়া ***	২.৭ বিবিএল	১৪ বিবিএল	১৭ বিবিএল	সংবাদ অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত
তুর্কমেনিস্তান	০.৬ বিবিএল	৮০ বিবিএল	৮১ বিবিএল	১০১ টিসিএফ	১৫৯ টিসিএফ	২৬০ টিসিএফ
মোট ঃ	১৭-২৯.১ বিবিএল	২৩৩ বিবিএল	২৫১-২৬৮ বিবিএল	১৭৭-১৮২ টিসিএফ	২৯৩ টিসিএফ	৪৭০-৪৭৫ টিসিএফ

সূত্র ঃ এনার্জি এনফরমেশন এডমিনিস্ট্রেশন ঃ যুক্তরাষ্ট্র।

সমীক্ষা ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

* শুধুমাত্র কাস্পিয়ান হ্রদ সংলগ্ন অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

** অস্তারাখান, দাগেস্তান এবং উত্তর ককেসাস কাস্পিয়ান হ্রদ সংলগ্ন ক্ষেত্র।

*** কাস্পিয়া সীমান্ত সংলগ্ন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট – খ

লে তেলের উৎপাদন এবং রপ্ত

হাজার ব্যারেল)

সম্ভাব্য উৎপাদন (২০১০)	মোট রপ্তানি (১৯৯০)	রপ্তানি (২০০০)
১,২০০	৭৭	১৫৫
২,০০০	১০৯	৪৫৭
০	০	০
৩০০	০	৭
২০০	৬৯	৮৩
৩,৭০০	২৫৫	৭০২

কেশাসীয় অঞ্চল মাত্র।

রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট – গ

কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও রপ্তানি

(দিনপ্রতি বিলিয়ন ঘনফুট)

দেশ	উৎপাদন ১৯৯০	উৎপাদন ২০০০	সম্ভাব্য উৎপাদন ২০১০	মোট রপ্তানি ১৯৯০	রপ্তানি ২০০০	সম্ভাব্য রপ্তানি ২০১০
আজারবাইজান	৩৫০	২১২	১,১০০	-২৭২	০	৫০০
কাজাকিস্তান	২৫১	১৭০	১,১০০	-২৫৭	-২২০	৩৫০
ইরান *	০	০	০	০	০	০
রাশিয়া **	২১৯	৩০	পাওয়া যায় নি	পাওয়া যায় নি	পাওয়া যায় নি	০
তুর্কমেনিস্তান	৩,১০০	১,৬৬০	৩,৯০০	২,৫৩৯	১,২০০	৩,৩০০
মোট ঃ	৩,৯২০	২,০৭২	৬,১০০	২,০১০	৯৮০	৪,১৫০

* শুধুমাত্র কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল।

** আস্তারাখান, দাগেস্তান এবং উত্তর ককেসাস অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র ঃ এনার্জি ইনফরমেশন এডমিনিস্ট্রেশন ঃ যুক্তরাষ্ট্র।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট – ঘ

কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলের তেল রপ্তানির রুট এবং এর বিকল্প (সম্ভাব্য)

নাম/অবস্থান	রুট	অশোধিত তেলের পরিমাণ পরিবহন ক্ষমতা	দৈর্ঘ্য	অর্থলগ্নি/ব্যয়	বর্তমান অবস্থা
কাজাকস্তান- সামারা পাঃ লাঃ	কাজাকস্তান- সামারা (রাশিয়া) রাশিয়ার	৩১০,০০০ বি/বি বিবি/দিনপ্রতি	বর্তমানে উন্নীত ৪৩২ মাইল	আনুমানিক ৬৩৭.৫ বি. মা. ডলার	বর্তমান পালাকে উন্নীত করা হয়েছে
বাকু চেইহান (রপ্তানির প্রধান পা লা)	বাকু (আজার) ভায়া তিবলিসি (জর্জিয়া) চেইহান (তুর্কি) ভূমধ্য সাগরীয় বন্দর চেইহান পর্যন্ত	পরিকল্পনাধীন ১ মি.বিবি প্রতিদিন	আনুমানিক ১,০৩৮ মাইল	আনুমানিক ২.৪-২.৯ বি মা.ড.	প্রকল্প ২০০১ থেকে হাতে নেয়া হয়েছে। ২০০৪ সনে শেষ করবার সম্ভাবনা রয়েছে
বাকু-সুপসা পা. লা. (পশ্চিমাপথ)	বাকু হতে সুপসা (জর্জিয়া) কৃষ্ণ সাগরীয় বন্দর সুপসা পর্যন্ত	বর্তমানে ১০০,০০০ বিবি দি.প্র. সম্ভাব্য বৃদ্ধি ৩০০,০০০-৬০০,০০০ বিবি/ দিনপ্রতি	৫১৫ মাইল	পরিবর্তিত পরিকল্পনার পূর্বে ৬০০ মিলিয়ন মা.ড.	২০০০ সন থেকে এ রাস্তায় প্রায় ৯০,০০০ বিবি/দি.প্রতি রপ্তানি হয়েছে।
বাকু-নভোরো-সোসিস্ক পা. লা. উত্তরের রাস্তা	বাকু হতে চেইহান হতে নভোরো-সোসিস্ক (রাশিয়া) কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত	নির্মাণাধীন ১০০,০০০ বিবি দি.প্র. যা উন্নীত হতে পারে ৩০০,০০০ বি.বি. দিনপ্রতি	৮৬৮ মাইল যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ৯০ মাইল চেচনিয়ার মধ্য দিয়ে	৬০০ মিলিয়ন মা.ড. ব্যয় হবে ৩০০,০০০ বিবি ক্ষমতায় উন্নীত করবার জন্য	রপ্তানি শুরু হয় ১৯৯৭ সনে ২০০০ পর্যন্ত গড় রপ্তানি ১০,০০০ বি.বি দিনপ্রতি
বাকু নভোরো-সোসিস্ক পা. লা (চেচনিয়া বাই-পাস সংযুক্ত হবে মাখাচাকালার সাথে	বাকু ভায়া দাগে-স্তান হতে তিখো-রেস্তক (রাশিয়া) এরং নভোরো-সোসিস্ক পর্যন্ত (কৃষ্ণ সাগরতটে)	বর্তমানে ১২০,০০০ বিবি দি.প্র রেলে এবং পা.লা. ১৬০,০০০ বিবি পরিকল্পিত ২০০৫ সনে ৩৬০,০০০ বিবি দিনপ্রতি	২০৪ মাইল	১৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	২০০০ এর এপ্রিলে সমাপ্ত

ষ্টব্য ঃ অর্থ - বিবি বিলিয়ন ব্যারেল মা.ড. মাকিন ডলার
দি.প্র. দিনপ্রতি বি. বিলিয়ন
পা. লা. পাইপলাইন মি. মিলিয়ন

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট – ঘ

কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলের তেল রপ্তানির রুট এবং এর বিকল্প (সম্ভাব্য)

নাম/অবস্থান	রুট	অশোধিত তেলের পরিমাণ পরিবহন ক্ষমতা	দৈর্ঘ্য	অর্থলগ্নি/ব্যয়	বর্তমান অবস্থা
কাস্পিয়ান পা.লা. কনসোরসিয়াম	তেনগিজ তেলক্ষেত্র (কাজাকিস্তান) হতে নভোরো-সোসিস্ক কৃষ্ণ সাগর	বর্তমান ক্ষমতা ৫৬৫,০০০ বি.বি দি.প্র.পরিকল্পিত ১.৩৪ মি. বি. বি. তট দি.প্র. (২০১৫)	৯৯০ মাইল	২.৫ বি. মা.ড. প্রথম পর্যায়ে ৪.২ বি. মা.ড. পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন পর্যন্ত	প্রথম রপ্তানি নভোরো-সোসিস্ক পর্যন্ত ২০০১ সেপ্ট. ৪,০০,০০০ বি প্র. দি.২০০২ সনের মধ্যে।
কাজাকিস্তান-চীন পাইপলাইন	আক্তিবিনস্ক (কাজাকিস্তান) হতে সিনজিয়াং (চীন) পর্যন্ত	পরিকল্পিত ৪০০,০০০ হতে ৮০০,০০০ বি. বি. দিনপ্রতি	১৮০০ মাইল	৩.০-৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৯৭ তে কিন্তু স্থগিত হয় ১৯৯৯ তে কারণ কাজাকিস্তান চুক্তিমত প্রয়োজনীয় তেল আগামী ১০ বছরে রপ্তানি করতে অপারগ

দ্রষ্টব্য ঃ অর্থ - বিবি বিলিয়ন ব্যারেল মা.ড. মার্কিন ডলার
দি.প্র. দিনপ্রতি বি. বিলিয়ন
পা. লা. পাইপলাইন মি. মিলিয়ন

www.pathagar.com

Bibliography

Ahmed Rashid	*Taliban:The Story of the Afgan* Warlords' Pan Books
Ahmed Rashid	*Jahid Rise of Militant Islam in Central Asia* Yale University Press.
Bruke Penniar	South / Central Asia : Turkmen : Afgan, Pakistani Leaders Seek Revival of Pipe-line Project : May 30, 2002.
Brig. M. Yousuf & Mark Adkins	: *The Bear Trap* J hans Publishers.
Brig. M. Sakhawat Hossain (Rtd.)	Antarjatik Shantrasher Itikotha : Afghanistan Hote America, Palak Publishers.
John. K. Cooley	*Payback : American Long War in Middle East* Pluto Press, London.
John K. Cooley	*Unholy Wars*, Pluto Press London.
IATR-TASS-Interfax	May 27, 2002
US Energy Department	*The Caspian See Region* october, 1997,

Periodicals, magazines refered in each paragraph.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার

ভাগবীনা বিনাড়ে পক্ষাদ্বিপ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন এন ডি সি, পি এস সি (অব.) ১৯৪৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সনে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় দু'বছর পাকিস্তানের বন্দি শিবিরে কাটিয়ে ১৯৭৩ সনে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭৫ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডে স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৯-৮১ সনে ঢাকায় সেনাসদরে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ডাইরেক্টরেটে নিয়োজিত হন। পরে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে দুটি ইনফেনট্রি ব্রিগেড ও একটি আর্টিলারি ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন।

লেখক বাংলাদেশের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে দ্বিতীয় বারের মত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিখ্যাত ইউ এস এ কমান্ড এন্ড স্টাফ জেনারেল কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। তিনি পাকিস্তানের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে ইসলামাবাদ ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজে মাস্টারস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী সিনিয়র অফিসার হিসেবে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই কোর্স সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাময়ীকিতে লেখকের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ জার্নালেও লেখকের 'রিসার্চ পেপার' ছাপা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও নিয়মিত তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে।

সম্প্রতি ইরাক যুদ্ধের সময়ে দেশের অন্যতম বেসরকারি টিভি চ্যানেল আই-তে সমর বিশ্লেষক হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণ যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি বাংলাদেশের ডিফেন্স কলেজ, স্টাফ কলেজ এবং ওয়ার কোর্সে অতিথি বক্তা হিসেবে সমর বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। লেখকের 'বাংলাদেশ ঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১' এই তথ্য বহুল ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সম্বলিত বইটি পাঠক সমাজে বহুল সমাদৃত হয়েছে।

লেখক বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, সৌদি আরব, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, গণচীন, জাপান, নেপাল এবং ভূটান। লেখক প্রায় দু'বছরের উপরে সরকার নিযুক্ত সোনালী ব্যাংকের পরিচালক মন্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন।